মাইকেল মধুসূদনের

মেঘনাদবধ কাব্য



মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত

মেঘনাদবধ কাব্য

(সটীক পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ)

অধ্যাপক এ. এল. ব্যানার্জি, এম. এ.
সম্পাদিত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

অষ্টম সংস্করণ
১৯৬২

প্রচ্ছদপট ঃ
শিল্পী নরেন্দ্রনাথ দত্ত

মূল্য ঃ তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর ঃ শ্রীউপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, এম্‌. এ. কম্‌., বি. এল্‌.
আই. এন. এ. প্রেস
১৭৩ নং রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

মাইকেল মধুসূদনকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রথম দ্বারমোচনকারী। কবির সম্বন্ধে কবির এই উক্তি সর্বাংশে সত্য। এক মহৎ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণে মধুসূদনের অভ্যুদয়। তিনিই শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম কবি ও তিনিই সাহিত্যে প্রথম যুগান্তর আনিয়াছিলেন। যেমন ঘটনাবহুল নাটকীয় জীবন তাঁহার, তেমনি শোকাবহ সমাপ্তি সেই জীবনের। কবিকীর্তি তাঁহাকে সহজেই মহত্ত্বের স্বর্গে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তিনি যে একজন অনন্য-সাধারণ বঙ্গসন্তান, সে শুধু এই কবিকীর্তির জন্য নহে, তাহার সহিত মিশিয়া আছে তাঁহার কর্ম-বাত্যা-বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিজীবন। বাঙালীর পক্ষে তাই মধুসূদনকে বিস্মৃত হওয়া কঠিন. সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব অপরিমেয়। পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটাইয়া তাঁহার দৈবী প্রতিভা এক আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। বাংলা-কাব্যসাহিত্যের তিনি এক নূতন পথিকৃৎ। কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া মধুসূদনের কবিত্বের ঝঙ্কার আজও বাণীর দেউলে নিত্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে; আজও গৌড়জন মধুচক্রের সুধাপানে আনন্দে বিভোর।

আমরা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র একটি সটীক পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বাহির করিলাম। সাহিত্যের আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদিত এই সংস্করণটির বৈশিষ্ট্য পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ছাত্রগণও যে ইহার দ্বারা উপকৃত হইবেন তাহাও বলা বাহুল্য। পুস্তকখানির সম্পাদনায় সুসাহিত্যিক শ্রীমণি বাগচি আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ইতি—

শ্রাবণ
১৩৫৯

প্রকাশক

অষ্টম সংস্করণের নিবেদন

অষ্টম সংস্করণের সম্পাদনায় এই গ্রন্থখানিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্যের পাঠশুদ্ধি-বিধান ও কবি-মানস-সম্পর্কে প্রচলিত মতামতের পাশাপাশি সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিতে যাচাই-করা নূতন অভিমতের প্রতিষ্ঠা। আলোচনার বহরও বহুলাংশে বর্ধিত করা হইয়াছে। এই নূতন সংস্করণের সম্পাদনায় সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক **শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য** আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ইতি—

শ্রাবণ
১৩৬৯

প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

কাব্য-পাঠ

"এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল, নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন। * * * স্মরণীয় বাঙালীর অভাব নাই। কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন-নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কাল প্রসন্ন,—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। * * * তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুসূদন'।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

কবি-প্রশস্তি

[নির্বাচিত কয়েকটি ছত্র]

বাল্মীকি হোমর সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রীধারী,
অকাল-কোকিল মরুতল-তরু
অ-নীর দেশের বারি।

* * *

আকর্ণ পূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুহৃৎরঞ্জন ভাণ,
মধুচক্র সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ।
আনন্দ-লহরী ভাষার নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহে ভাসিত বদন-মণ্ডল
পঙ্কজ বান্ধব-কুলে।
বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয়,
গৌড়-সন্ততি-সার,
প্রিয়ম্বদ সখা প্রণয়ের তরু
কামিনীকণ্ঠের হার।

* * *

হবে কি সেদিন এ গৌড় মাঝে
পূরিবে তোমার আশা?
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে,
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা!

* * *

সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি-সম্বর্ধনা

[মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে বহু অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনায় উনবিংশ শতকের কলিকাতার বিদ্বৎসমাজ যখন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় মধুসূদনকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধনা করা হইয়াছিল। মেঘনাদবধ, ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মধুসূদন দত্তকে সম্বর্ধিত করিবার আয়োজন করেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয় মধুসূদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১ তারিখে কালীপ্রসন্ন নিজগৃহে এই সম্বর্ধনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। সম্বর্ধনা-সভায় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট বিদগ্ধমণ্ডলীর সম্মুখে সভার পক্ষ হইতে কবিকে নিম্নলিখিত মানপত্রখানি উপহার দেওয়া হইয়াছিল।]

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য।......আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্রবার ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবে তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না।

আজ আমরা যেমন আপনকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবী বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সভ্যবর্গাণাম



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন-কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়, মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে!—

ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির-দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী-লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।

বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ;—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভু সম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে !
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে,—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময় ; বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী ?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে!
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে ;
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর !
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুতঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে !—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্ ! কত ক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?"
"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি ?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে ! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে ! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম

ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত ! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে !—
আর কি কহিব, দেব ? পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি ! হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে ?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে ? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে ; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ; "সাবাসি, দূত ! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে ? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী ! চল, সবে,—
চল যাই দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"

উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী !—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে ;
কমল-আলয় সরঃ, উৎস রজচ্ছটা ;
তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষু-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে,
জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন।

দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিম্বা আকাশ মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে !
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক ! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনূ,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা ! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে, কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তস্রোতে !
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;

ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।
পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষীদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীর-কুল-সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্য্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম
প্রশস্ত; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।

অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি ; পাত্র মিত্র, সভাসদ-আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে !
হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে । হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী ।
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে । শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে ।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী ; পাত্র মিত্র, সভাসদ্ যত
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে ।
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
"একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী । কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে ?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে !
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি ! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তূলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে । বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে ।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা আহা, স্মরি পুত্রবরে ।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত

ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রুনীরে ?”
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—“দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !”
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গিদলে লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। “এত দিনে” (কহিলা ভূপতি)
“বীরশূন্য লঙ্কা মম ! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি !
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি !”
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পুরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক-শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি ; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হেষিল উল্লাসে
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে ;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝন্ ঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে !
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে ;—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে ! যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে প্রবাল-আসনে
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে

আরাব ; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে ;—"কি কারণে, কহ, লো স্বজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে ! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি ? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে।
হাসিয়া কহিলা দেব ;—'অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা' ;—তখনি, স্বজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে ;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ ; "সত্য, লো স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে
বসেন কমলময়ী কেশব বাসনা
লঙ্কাপুরে। ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বাসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে !
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল আসনে ;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে ?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা ; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা।
"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে,
গতি তব ? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,

প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে?
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি;
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—"হায় লো স্বজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে!
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবানিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী!"
সুধিলা মুরলা;—"কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল-দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগরতরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
সুরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ-হেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমলনয়না;—
"হায় সখী, বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
মহারথিকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,

ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল পতি,
প্রক্ষ্বেড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি!
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি! সমর মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে,
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
   সুধিলা মুরলা দূতী; "কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে?"
   উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী;—
"প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
   প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে!
   উতরি জলধিকূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ষ্মী দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
   কত ক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে!
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে
রত্নরাজী, তূণে শর মণিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর
আয়ত-লোচনে শর। নবীন যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী;
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ,

উথলিছে চারি দিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে!
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা,—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি!"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ? আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"
সাজিল রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী; "কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে,

রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।"
উঠিল পবন-পথে ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িল মৈনাক-শৈল অম্বর উজলি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি!
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি;—
বাজিছে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ;
হেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।
নাদিলা কর্ব্বূরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা; "হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি বৎস; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"
কহিলা রাক্ষসপতি;—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; "নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি।
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী!
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!

আকাশ-দুহিতা ওগো, শুন প্রতিধ্বনি ;
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস ;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অভিষেকো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী ; কূজনি' পাখী পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রাদেবী ; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।

উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে ; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ!
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন ; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ ; চন্দন কেহ বা ;
সুগন্ধ-মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিব-নিবাসী সহ ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।

সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা ; "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"

উত্তর করিলা ইন্দ্র ; "হে বারীন্দ্র-সুতে,

বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি তুমি
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি; কোন্ পুণ্য ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?"
কহিলেন পুনঃ রমা, "বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহুযত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এতদিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে!
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি!
কহিলেন স্বরীশ্বর; "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দম্ভোলি,
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি-বরে
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।"
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী,—
"যাও তবে সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার; কহিও অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে!
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে।

সোনার প্রতিমা যথা বিমল সলিলে
ডুবে তলে, জলরাশি উজলি স্বতেজে!
আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে; "চলহ দেবি, মোর সঙ্গে তুমি!
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি
বিকচ-কমল-গুণে শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিলা ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি! বাহিরি বেগে শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয় অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত;
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে!
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে!
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ!
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ-ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে; ঢুলাইছে চামর বিজয়া;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব?
দেখ হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে!
পূজিলা শক্তির পদে মহাভক্তি-ভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা;—"কহ, দেব, কুশল বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-নিক্ষেপী;—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে? কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে।
অবিদিত নহে মাতঃ, তাঁর পরাক্রম।
রক্ষ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী।
কহিলেন হরিপ্রিয়া,—কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী। তবপদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে!
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন্ রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে!
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে,
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!"
উত্তরিলা কাত্যায়নী;—"শৈব-কুলোত্তম
নৈকষেয়; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি, তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি।"

কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা ;—
"পরম-অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী ! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে।
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল
অমূল্য ; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস ? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট ! হায়, মা স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে।
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর, দয়াময়ি ?"
নীরবিলা স্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর-সুস্বরে ;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয় ? অশোক-বনে বসি দিবানিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে। কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি !
মরি, মা, শরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে !"
হাসিয়া কহিলা উমা ;—"রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু ! তুমি হে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ কুল ; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে ?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত ; তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে ?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম।"
কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন ;—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃকুল, রাখ
ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা ;
হ্রাসো বসুধার ভার ; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী ; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি।
টলিল কনকাসন ! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা ; "লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে অকালে ?"
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী ; "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে, সুসিন্দুরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।

অভয়-প্রদান তারে কর গো, অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ ; তার তারে বিপদে, তারিণি !”
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ;—
“দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে ! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর !) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।”
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম-আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা ; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত
কুসুম-রতন-রাজি ; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী ; ত্রিলোক মোহিল !
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন !
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে ! কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগিব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা !
প্রবেশি স্বর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা, “কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে ?”
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়-
বায়ু-তরঙ্গিণী-রূপে, বহিলা নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে ! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ুপথে, কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী ঊষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে !
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা ;—
“যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র ; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি ?” উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী ;—“ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা !”
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত ; আনিলা
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী ;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা ; রসানে মার্জ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল !
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে ;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে,—
“ডাক তব প্রাণনাথে।” অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে !)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,

স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!
কহিলা শৈলেশসুতা ; "চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে ; বাছা, চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে ;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে ?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্ব-ভার ত্যজি
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান ; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে ; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে ? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ;
কেহ না আইল ; ভস্ম হইনু সত্বরে !—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে ;—
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী ;—
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ ! আমার বরে চিরজয়ী তুমি!
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে !"
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা ; অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে ;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগৎ, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে।
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর !" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদনশশী ! কিম্বা অগ্নি-শিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মণ্ডলে !
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা ! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—

কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী !
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্‌, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জল-কান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে !
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে সম্বর-অরি ?
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে,
হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে !
শিহরিলা শূলপাণি। লড়িল মস্তকে
জটাজূট, তরুরাজি যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে !
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।
মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি ; "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা ; "এ দাসীরে, ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !" আদরে ঈশান,
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে !) কুসুমেষু, বসি কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী !
লজ্জা-বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইল দেব বিভাবসু !
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব ; "জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে ;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বর যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,

মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্ম্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে!
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুখাইল অশ্রুবিন্দু যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে; "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন!
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে?
বামদেব নামে, নাথ, সদা, কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে,
মোর কিরে প্রাণেশ্বর!" সুমধুর হাসে
উত্তরিলা পঞ্চশর; "ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কত ক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথিবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা;—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি!"
আশীষি সুধিলা দেবী;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?"
উত্তরিলা দেবপতি—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে;—
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে, কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণি-পূর্ণ নাগ-লোক যথা!

ওই দেখ ধনুঃ, দেব!" কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী,
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি,
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে!
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে?"
"শুন দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি।
ফুল-কুল-সখী উষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!"

মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।

বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি
যাও চলি! পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-পুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ু-কুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা;
দম্ভোলি-গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।"

প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।

তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা, "প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে; লহ মেঘদলে;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে; গিরি (দেখিলা) লড়িছে
অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল। কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি!
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল

ক্ষণপ্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে ; মহাঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়তড়তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে ! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি,
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে !
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ, ধনুঃ,
চর্ম্ম, বর্ম্ম, শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী ? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে,
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে
রঘুবর জিজ্ঞাসিলা, "হে ত্রিদিববাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্ দেশে সাজে
এ হেন মহিমা, রূপে ? – কেন হেথা আজি,
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব হায় !" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ;
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্রে ! গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি।
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!"
কহিলা রঘুনন্দন ; "আনন্দ-সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে!
অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা, এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"
হাসিয়া কহিলা দূত ; "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা,—দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি,
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা ; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!"
প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিলা জলধি ;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রুআঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুঁছিয়া আঁচলে!
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারি দিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে!
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;—
"ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা,—"কেমনে কহিব
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি!
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তারে আঁটিবে
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে।
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে; গাইছে ভ্রমরী;
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে?
কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে,
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশা-কালে.
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা!
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে!
এ পারণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে!
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি!

আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে ?”

অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী ; “এই ত তুলিনু
ফুল-রাশি ; চিকণিয়া গাঁথিনু, স্বজনি,
ফুলমালা ; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে !
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি ।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে ।”

কহিল বাসন্তী সখী ; “কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি ? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে !
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা ।”

রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী !
“কি কহিলি, বাসন্তি ? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুল-বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে ;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?”

এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি,
রোষাবেশে প্রবেশিলা স্বর্ণ-মন্দিরে ।

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে ;—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে ! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী !
মন্দুরায় হেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝন্‌ঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী ।
বারী মাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে ! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি ;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোরকোলাহলে ।

নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে । চড়িলা ঘোড়া একশত চেড়ী ।
অশ্ব-পার্শ্বে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি ।
নাচিল শীর্ষক-চূড়া ; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে ।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল । হেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি !
বাজিল সমর-বাদ্য ; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে ।

রোষে লাজভয় ত্যজি সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা । কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা ! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে ।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক তুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে !

ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্ত্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা !) হৈমময় কোষে
শোভে খরসান অসি ; দীর্ঘ শূল করে ;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ !—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ বীর-মদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা !

গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে ; "লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে ?
যাইব তাঁহার পাশে ; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে ;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম ;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে !
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি ;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে !
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে ?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে ;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে ; নাগ-পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে !
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি,
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে !"

নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধু-কালে !

যথা বায়ু-সখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।

কত ক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্ব্বত গহ্বরে সিংহ ; বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত !

পবন-নন্দন হনূ ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা ;—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে ?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে !
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে ;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"

নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী !)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে ;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর সীতানাথে,

বর্ব্বর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিনু ছাড়ি ; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি !
কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তার ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী !
কোন্ যোধ সাধ্য, মূঢ়, রোধিতে তাঁহারে ?”
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনূ, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি !
বিস্ময় মানিয়া হনূ, ভাবে মনে মনে ;—
“অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে ;—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে !
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !”
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;
“বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয় সিন্ধুরে,
হে সুন্দরী, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনূমান্ আমি
রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ;
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।”
উত্তর করিলা সতী,—হায় রে, সে বাণী
ধ্বনিল হনূর কানে বীণাবাণী যথা
মধুমাখা !—“রঘুবর পতি-বৈরী মম ;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে ;
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।”
নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুত্মতী তরি,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী !
আগে আগে চলে হনূ পথ দেখাইয়া
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে ! হাসিলা ভামিনী

মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময় নাচে কুতূহলে;
ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগ-মাঝে
পীবর! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে!
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে!
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি;
কর-পুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি।
দেব-দত্ত অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পীঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধপদানে;
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটী।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ; চর্ম্মবর কেহ,
সুবর্ণ-মণ্ডিত যথা দিবা অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ; তূণীর কেহ বা;
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব;
"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে!
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে?"
সহসা নাদিল ঠাট; জয় রাম ধ্বনি
উঠিল আকাশ দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী;—
"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা?"
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
"ভৈরবীরূপিণী বামা", কহিলা নৃমণি,
"দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা ধাম; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে
এ দুর্ব্বল বলে, কহ এ বিপত্তি-কালে?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!"
হেন কালে হনূ সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে!)
কহিলা; "প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—নৃ-মুণ্ড-মালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া, বীর দাশরথি
সুধিলা; কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী; "বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি,
রঘুনাথ! আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে,
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে,
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,

ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত !
যথারুচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে !”
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোমাইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে !
উত্তরিলা রঘুপতি ; “শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃ-পতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা ; কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে !
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে ;
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ করি !”
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে ;
“দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।”
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ ; “দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি ! দেখ, দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?” কহিলা রাঘব ;—
“দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি !
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে !
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।”
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে ! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্‌ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,
ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী !
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা ;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী ;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায়ে দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দল !
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড মালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে
হৈমময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্কণে !
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা !
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি

ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী,
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে;
ধীরে ধীরে, বৈরীদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি;
আস্ফালিলা শূলে কেহ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী!

লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব;
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয়? কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে!
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্নোত্তম।
না পারি বুঝিতে কিছু; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে।
চিত্ররথ-রথি-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে? কহ, বুধ, কার এ ছলনা?"

উত্তরিলা বিভীষণ; "নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল হস্তী! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরন্ত দংশক!
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"

কহিলেন রঘুপতি; "সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথিশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে!
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে;
কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।—
ভেবে দেখ মনে শূর, কাল সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে;
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"

কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোমাইয়া
ভ্রাতৃপদে; "কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে?

অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয়লাভে?
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?"
উত্তরিলা বিভীষণ; "সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি!
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
রণ প্রিয়া! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে!
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে;
"কৃপা করি, রক্ষোবর লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে;
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে—
কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী;
কোথা বা সুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে।"
"যে আজ্ঞা," বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
উর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে; সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে; গরজিলা ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা!
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষ্বেড়ন করে;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত! হেষিল অশ্বাবলী।
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল;
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে!
অগ্নিময় আকাশ পুরিল কোলাহলে,
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয় গিরি অগ্নি-স্রোতোরাশি
নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া।—
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী;
"কাহারে হানিস অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে?
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল-বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে!
বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া
পৌর জন; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে; যন্ত্র-ধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা
অগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী; হেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ; ঝন্‌ঝনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা

উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে!
অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে ;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদ-তলে তবে ; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে!" হাসি, কহিলা ললনা ;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে!
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে ; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী ; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি
অলকে মণির আভা কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিলা আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী।
গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্ত্তকী ;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে
যথা ; ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে,
গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে ; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা,—অটল সংগ্রামে!
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মূরতি ;
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নি-রাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারি দ্বারে বীর-ব্যূহ জাগে ; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে, "লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া,
বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে!
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে। বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে!
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে

গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে !"
উত্তরে বিজয়া সখী ; "সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লোকে ?
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী ; কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি ?
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে ;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা ; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ !
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ, কাত্যায়নি ?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?"
ক্ষণ কাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী ;
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে ; হরিব তেজঃ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে ;
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে ! পতি সহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি ;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে ;
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম ; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা,
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে সমাগমো নাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে !
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর ! শ্রীভর্ত্তৃহরি ; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস— সুমধুর-ভাষী ;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি,
মনোহর ; কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার !—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।

ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে !
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে ;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে !—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে ; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু ; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে ;" আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে ?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে ! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী !
না পশে সুধাংশু অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে !
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ তলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে !
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর-স্বরে ; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দূর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ন যথা !
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা।

"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জলিল, উজলি
দশ দিশ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী ;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে!
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে?"
কহিলা সরমা ;—"দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী.
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ প্রসাদে।
সরসী আরসি মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অমূল্য রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!

হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা!) ; "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে!
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে?
"পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী!—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নিরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে

সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্ব জন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি!
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"
    কহিলা রাঘব-প্রিয়া; "এইরূপে, সখি,
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী-বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে!
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা! ধিক্ তারে! নারী-কুল-কালি।
চাহিল মারিয়া মোরে বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে! ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে! আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে!
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
    "কতক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি,
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে!) কহিল কান্ত; 'উঠ, প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা!
    যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে!
    কতক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি; "ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হায়, জ্ঞানহীন আমি!" উত্তর করিলা
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা;—
"কি দোষ তোমার, সখি? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি!)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী!
    "সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে?
মরি আমি!' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী!

চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি ;—
'যাও বীর ; বায়ু-গতি পশ এ কাননে ;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ? কাঁদিয়া উঠিল
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ ! যাও ত্বরা করি—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !'
"কহিলা সৌমিত্রি ; 'দেবি, কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ?
কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে ?'—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ ;—'মরি আমি ! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই ?—কোথায় জানকি ?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, স্বজনি !
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে ;—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে,
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুর্ম্মতি !
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে ?' ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম ! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা !
যাই আমি ! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে দোষ মম ;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে ?
বাড়িতে লাগিল বেলা ; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে ?
"কহিল মায়াবী ; 'ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি !) ক্ষুধার্ত্ত অতিথে।'
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু, 'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে ; অতি-
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিল দুর্ম্মতি—
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা ; নহে কহ, যাই অন্য স্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি ? রঘু বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে ?
দেহ ভিক্ষা ; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায় লো স্বজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে,—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে ; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাস্বর তব আমায় তখনি ;
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে ; দূর গুল্ম-পাশে

চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে!
'রক্ষ, নাথ' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা!
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?
"দূরে গেল জটাজূট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী-বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!
"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা! স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁফর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"

নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,—
"এখনও তৃষাতুর এ দাসী, মৈথিলি;
দেহ সুধা দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!
"হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূত-পদে,
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেণ প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চ স্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
"চলিল কনক-রথ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ! স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া?—
"কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে!
দেখিনু, মেলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি

গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ! 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্ম্মতি?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক্ তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?'
"এতেক কহিয়া, সখি, গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র!
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে!
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে,
সে রণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন!
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে
দাসীরে! উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু,
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে!
আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা? এস শীঘ্র করি!
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট; হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি!'
"বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি;
কাঁপিল বসুধা; দেশ পুরিল আরাবে!
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।—
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী;—
বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে!
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে!
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে।'
"দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন! হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো স্বজনি,
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে!
সভয়ে মুদিনু আঁখি! কহিলা হাসিয়া
মা আমার, 'কারে ভয় করিস্, জানকি?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে,
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী,

বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে!
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া,
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙিল নিবিড় বন; শুখাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে;
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।
"উতরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা; শৃঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক।
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
'জয় রঘুপতি, জয়!" ধ্বনিল সকলে!
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি।
আছিল সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক; কহিল সে 'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি,
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী!
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিলা সরমা,
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব?
দুজনে আমরা সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী,—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি!
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে!
কিন্তু কহি, শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন;—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে,
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে?
বহিল শোণিত-নদী! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি, মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম; পালে পালে শৃগাল; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।
"দেখিনু কর্ব্বূর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায় বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলি-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রক্ষিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে?
ধাইল রাক্ষস-দল; বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে; নারী-দল দিল হুলাহুলি!
বিরাট্-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে?)
কাটিল তাহার শিরঃ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর। জয় রাম ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই! কাঁদিল রাবণ!
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে!
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে

ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,
'রক্ষ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা আমার!
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে!' হাসিয়া কহিলা
বসুধা, 'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি!
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া।'

"দেখিনু, সরমা সখি, সুর-বালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে!
কেহ কহে, 'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে!' কেহ কহে, 'উঠ,
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে!'

"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি;
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে
দাসীর? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কাঙ্গালিনী সীতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি!'

"উত্তরিলা সুরবালা; 'শুন লো মৈথিলি!
সমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা!'

"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে।
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী!
পাগলিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে!—জাগিনু অমনি!—
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে!
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে?"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি! কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃ-কুল--রাজ-লক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা; "পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি!
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে!
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী;
সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে! এখন কহ কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী!"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে;—
"মিলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!

কহিল রাঘব-রিপু; 'ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম! জগত-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন!
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে?'

" 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ';—কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে—
'সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া?
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে!'

"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা!
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু স্বজনি,

বীরবরে ; 'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘরে পেয়ে
আমায় হরিছে পাপী ; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'

"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব ; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়। বহিছে কল্লোলে
অতল, অকূল জল, অবিরাম-গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে ;
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।

"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি কুঞ্জ-বিহারিণী!
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরী!
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা?
রাজার নন্দনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে!"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি ; কাঁদিলা সরমা।

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা ; দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা! বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা! সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি! বীর আর কে আছে এ পুরে
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে,
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব! ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে!
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!
ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী!" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী ; "সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি?"

নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা ;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে!"

কহিলা মৈথিলী ; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে ; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি ;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা ; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অশোকবনং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র ; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে ;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে ;
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে?
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা, উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন!
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা!
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে,
আর কারে ভয় তাঁর? এ ঘোর নিশীথে,
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্য-দল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?"
উত্তরিলা অসুরারি ; "ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি!"
"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত" ; কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তারকারি ; তব ভাগ্য-বলে,
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি ; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দেবেন আপনি ;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?"
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু ; "সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি ; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে ;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন ;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে ;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর ; দেখি ইরম্মদে ;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী ;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে
মহেষ্বাস ; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম প্রহরণে!" বিষাদে নিশ্বাসি

নীরবিলা সুরনাথ ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত !)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে ; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী ;
হেনকালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে ; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে !
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে ?"
উত্তরিলা মায়াময়ী ; "যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে ; মনোরথ তোমার পূরিব ;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে ;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে !
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে ?
মরিবে রাবণি রণে ; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে
রঘু-মিত্র ! পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু ! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে ?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন ;—
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে !
যার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া জাল পাতি,
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয় ;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ব্বুরে।"
"উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি!" কহিলেন মায়া, "পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে!" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয় ! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ ; খুলিলা কাঁচলি ;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে !

স্বর্গের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া
মহাদেবী ; স্বনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার । বাহিরিয়া বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে ;—

"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি !
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে ;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।"

চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী ; নীল নভঃ-স্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী ; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে, অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।"

চমকি উঠিয়া বলী চাহিল চৌদিকে !
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল ! "হে জননি", কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি ? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি ;
পূরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার ! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয় ! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ ?" মুছি অশ্রু-ধারা,
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা

কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে ;—
"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি।
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন ; 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময় ; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে
যশস্বি ! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি ?"

জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী ;—
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি ? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"

উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ; "আছে সে কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে ; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল ! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি !
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে !

আর কি কহিব আমি ? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব !”
　“রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃ-কুলোত্তম,
এ দাস” ; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, “যদ্যপি
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে !
কে রোধিবে গতি মোর ?” সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর, “কত যে সয়েছ
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায় ! কিন্তু কি করি ? কেমনে লঙ্ঘিব
দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে,—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী ! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে !”
　প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর-বল-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর ; “কে তুমি ? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি ! নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ !” উত্তরিলা হাসি
রামানুজ, “রক্ষোবংশ-ধ্বংস, বীরমণি !
রাঘবের দাস আমি।” আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে ঊর্ম্মিলা-বিলাসী
　কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি ! দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি ! জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন !
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ; শাল-বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে ! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী ; “দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড় ! ছাড় পথ ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে ; নহে দেহ রণ দাসে !
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি ;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ, বিলম্ব না সহে !
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে ;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব !”
　যথা শুনি বজ্র-নাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে !
“বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে ?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর !” ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
　ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি।
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে। আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি।
জয় রাম নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে ! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে।
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে !

কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্মুহুঃ। বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে!
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে; আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি,
থামিল তুমুল ঝড় দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত; তারাদল শোভিল গগনে!
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিলা;
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি;
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্বণে!
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্তে বিমোহিয়া!
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ, স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি স্বর্ণপদ্ম যথা!
কেহ তুলে পুষ্পরাশি; অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক; ঝকঝকে হৈম তার তাহে,
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে ক্বণিছে রশনা!
মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভূজঙ্গ-ভূষণ শূলী? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা, খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে!
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল; "স্বাগত, ওহে রঘু-চূড়া-মণি!
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী!
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুখায় সুধারস অধর সরসে;
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে
আমা সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে
গুণমণি! রোগ, শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন!" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি,
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে!
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর-যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে!
নর-কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি

তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন!
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী! —
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে?—
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।

কত ক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
স্বর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ;
পীঠতলে ফুলরাশি; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটে বারি; ধূপ ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুম-বাসের সহ। পশিয়া সলিলে
শূরেন্দ্র, করিয়া স্নান; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।

প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে
যথাবিধি। "হে বরদে" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, "দেহ বর দাসে!
নাশি রক্ষঃ-শূরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি!" গরজিল দূরে
মেঘ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা! দুলিল যে ঘোর ভূকম্পনে
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে!

সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে?
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক! হাসিল সতী; পলাইল তমঃ
দ্রুতে; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি!
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।

কহিলেন মহামায়া; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রিদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল নিক্কণে!
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা সুস্বনে।

"শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে!
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি,
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!"
নীরবিলা সরস্বতী; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন !
উঠ, চিরানন্দ মোর ! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তে ; তুমি রবিচ্ছবি ;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার ! নয়ন-তারা ! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম !" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে !
আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে ;—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্ব্বরী ;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে !
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি-সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে ; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী !
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে !
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত ; ধাইল অলি পরিমল-আশে ;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য ; নমিল রক্ষক ;
জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে !
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী। বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে ! ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড-সম
করে ; অশ্বারূঢ়া কেহ ; কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি !
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী ; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু ; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে ;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি !" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিল শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী)
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে !
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে ?
কার বা এ হেন মাতা ?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।

গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে ;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে,
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!"

বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!

শরদিন্দু পুত্র ; বধূ শারদ-কৌমুদী
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রু-বারি-ধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল!

কহিলা বীরেন্দ্র ; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে!
শিশু ভাই বীরবাহু ; বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে
নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে!" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে ;—

"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার। দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী ;
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর ; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে!
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি!"

হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী ;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নি-ময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম ; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?"

মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী,—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত!
নাগ পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে!
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি ; আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা বীর-কুঞ্জর ; "পূর্ব্ব-কথা স্মরি,

এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে!
নগর-তোরণে অরি ; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা,
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে,
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী! পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?"
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী ; "যাইবি রে যদি ;—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই!" কাঁদিয়া মহিষী
কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;
"থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি ; জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ!
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথীবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিরত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে।
সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে! "হায়, নাথ", কহিলা সুন্দরী,
"ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে ;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ। শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা ; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে!"
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা! শতদল দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?
উত্তরিলা বীরোত্তম, "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি!
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী!
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।"
যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান ; হায় রে তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,

ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে !
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন ; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে !
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে ?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী ।

কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে ;
"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি ? সরু মাঝা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি ? তুইও তেঁই সদা বনবাসী ।
নাশিস্ বারণে তুই ; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি ।"

এতেক কহিয়া সতী কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি ;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি ! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে ।
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে !
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে !
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে !
আর কি কহিবে দাসী ? অন্তর্য্যামী তুমি !
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে ?"

বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে
কাঁপিল সভয়ে ইন্দ্র । তা দেখি, সহসা
বায়ু বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায় ! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
শূন্যালয়ে, কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে ।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে উদ্যোগো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে ।

কতক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী । পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে

চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব, মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে!
পশিল কাননে দাস; আইল গর্জ্জিয়া
সিংহ; বিমুখিনু তাহে; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড়; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি, দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; পিধানে যথা অসি আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!"
উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব নর ভস্ম যার বিষে,—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে!
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।"
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী;—
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,

এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?"
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র ;—"যা কহিলা সত্য, রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী ;—'হায়! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বূররাজ!—' উঠিনু জাগিয়া ;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী!
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;—মরি!
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা,
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!"
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দ্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু, স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে!
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা ;—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে?
সঁপিনু এ ধন তোরে! রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'

"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি!
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ; বায়ুপুত্র হনূ,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম;
অগ্নিরাশি নল, নীল; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য; তুমি মহারথী;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলজ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা।"

সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে;
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।" দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরবে দেশ পূরিছে চৌদিকে!
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে;
গরজিলা অজাগর—বিজয়ী সংগ্রামে।

কহিলা রাবণানুজ,—স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে!
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে;—
নির্ব্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!"

প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-
সদৃশ। পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময়; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্কর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ দুলিল
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!

শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে!
বাহিরিলা বীরবর; বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে!
বরষিলা পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে!

আকাশের পানে চাহি কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিল রঘুবর; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে! ভুল না, দেবি, এ তব কিঙ্করে!
ধর্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু

আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে!
দুর্দ্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দ্দিনি, মর্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে!"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে ; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি, আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে ; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা ;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল্য রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!"
আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি রঘুকুলমণি ;
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে।"
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে, দোঁহে।
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—
"কি কারণে, মহাদেবী, গতি, এবে তব
এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে, তেজঃ তব আজি ;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানল সম তেজঃ তব তেজস্বিনি
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি! তার, বরদানে,
ধর্ম্মপথ-গামী রামে মাধবরমণি!"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা ;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি। সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রা-নন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে!"
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—

সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট; শুষিলা মেদিনী
বারি। রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর জালে!
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা; হারাইলে, মরি!
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি!
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা;
কল্লোলিলা জলপতি; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি!
প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব? হায়! রক্ষোরথী যত
মায়ার-ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে!
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য; অজেয় সংগ্রামে।
কালানল সম বিভা উঠিছে আকাশে!
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেড়নধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ়; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি সম;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা সুরপুরে!—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে?

নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিল,—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—"যা কহিলে সত্য, শূরমণি!
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,—
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি,
রথিবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে!"
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসি কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যজি ফুলশয্যা; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল; গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্গর; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাঁতি; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে!
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
ঊষা যথা! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া ধাইছে ভারী;—ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে,—"চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে; চল সভাতলে।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদানে ধূপ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি,

গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা-কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে কলুষনাশিনী
তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র ; নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে!
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝনঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ-অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কী লীলা তব,
প্রভাময়? পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম, দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই ; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,

ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?"
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর! কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে!
বহিল রুধির-ধারা ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এত ক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলিশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ; বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?
কে বা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথিপ্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ! ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?”

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;—
“নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি ! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি ! পরদোষে কে চাহে মজিতে ?”

রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—“ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।”

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী !
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে !
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা

রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা, সম্মুখে কেশরী !
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে !
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে !

ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র ; থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরাবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে ।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে !
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে !
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে !

অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে !
দাবাগ্নি সদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি !
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে ।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে ?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি ?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃ-পাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে ।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ ? লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়,—আর্দ্রিল মহীরে ।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে ।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি মহাবল রহিলা ভূতলে ।

কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে ;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায় ? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?
সুরবালা-গ্লানিরূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী ? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলের ? উঠ, বৎস ! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার ! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে
হে কর্ব্বূরকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী
জগতনয়নানন্দ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;
গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে ;
সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম !
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !"

এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি !
কি ফল এ বৃথা খেদে ? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার ! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর।" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর ! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে !
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে !
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।

প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর ! গতজীব মেঘনাদ বলী
শক্রজিৎ !" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব ; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে।"

মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে !
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,

মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে!
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী! কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয়!" কটক চৌদিকে,—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ স্বর্গঃ।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী ;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে! রতনময় কঙ্কণ লইলা
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা ;—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ! সম্ভাষি বিস্ময়ে
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে সতী
কহিলা,—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত ;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি!"
নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী
বাসন্তী, "বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া,
আর্ত্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কহিব
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে।
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজয়ী
কান্ত তব সীমন্তিনি?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—

বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।

বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব ; হত রথিপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে!
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে!
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে ;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।"
উত্তরিলা ক্যাত্যায়নী, "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী ;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ; থাকে যেন মনে!
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে?"
হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে!
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস। পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি ; ভর, রুদ্রতেজে,
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে ; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে! উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।
পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্র! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে।
ব্যথিত অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি।
কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উতরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুময় আঁখি,
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, "কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম? মানব রাম, নও ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ,
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজরবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-

সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা
ছদ্মবেশী ; "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি ?
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বূরপতি,
কর দাসে !" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী,
"কি ভয় তোমার, দূত ? কহ ত্বরা করি—
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে।"
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী
কহিলা,—"হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি
কর্ব্বূর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী!"
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায় ! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে ; কেহ বা আনিল
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে—
"কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে ? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী ;—"ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি
বীরেন্দ্রে ! প্রফুল্ল, হায় কিংশুক যেমনি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে,
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌর জনগণে!"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমি, কহিলা শৈব ; "এত দিনে প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার ? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময় ? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীবপদে।"
সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে ! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে !"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে !
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস ; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে !
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ ; ধূম্রবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে ; বাহিরিল হেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস ; রথিবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে !
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমাবলী
অশ্বপতি ; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে !

আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।
গজরাজতেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়; ভেরী, তুরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ; কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে!
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি;
অধীর ভূধরব্রজ—ভীমার গর্জ্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে!
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে,—"দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে;
উজলিছে নভস্তল ভয়ঙ্করী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন! শুন, কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব!" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ রক্ষঃ, মিত্রচূড়ামণি;—
"কি আর কহিব, দেব? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে!
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ; স্বর্ণবর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ! রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে।
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে সাজিছে স্বরথী
লঙ্কেশ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে?"
সুস্বরে কহিলা প্রভু;—"যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে!"
শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে।
আইলা নিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি;
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনূ; জাম্বুবান বলী;
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ; রাক্ষসত্রাস; আর নেতা যত।
সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু;—"পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী; সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা! তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে; সাজ ত্বরা করি;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে! একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে; বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু; শূলিশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে!
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,

রঘুবন্ধু, রঘুবধূ, বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে! স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি!"
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে!
বারিদপ্রতিমস্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব;—"মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে!
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে;—
ধনমানদাতা তুমি, কৃতজ্ঞতা-পাশে
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে!
আর কি কহিব, শূর? মম সঙ্গিদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে!" গর্জ্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত,
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে!
সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে!—
পূরিল কনক-লঙ্কা গভীর নির্ঘোষে!
কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী উঠিলা সত্বরে।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,
জীবকুল-কুলক্ষণ! বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য। শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—
শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ; গাইছে সুতানে
কিন্নর; সুবর্ণাসনে দেবদেবীদলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী,
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে।
পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে!
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র,—"দেহ পদধূলি,
জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।
কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি,
তুমি, কি অভাব তার?" হাসি উত্তরিলা
রত্নাকররত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,—
"ভূতলে পতিত এবে, দৈতকুলরিপু,
রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে
লঙ্কেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে।
সাধিল তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি;
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে!
আর কি কহিব, শক্র? অবিদিত নহে
রক্ষঃকুলপরাক্রম! দেখ চিন্তা করি,
কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে!"
উত্তরিলা দেবপতি,—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেষ্বাস রক্ষঃকুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়াময়ি।
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে!"
বাসবীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে; শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি

সেনানী, বিচিত্র রথে, চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে ;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী ;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি
নয়ন ! চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা ; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম ; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে !

সুধিলা মাধবপ্রিয়া ;—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল ? ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে ?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী ;—
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে ?—
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি ; এ বিপুল-সৃষ্টি যাবে রসাতলে !"

আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে ; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে !

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি ;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল ! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুল কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি ?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর-শিরে ;
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে !"

ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে ! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;—
"দৈব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে ! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার ! বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি ;
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কিন্তু দেব-নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা ! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে
বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুখাইল

জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে!
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে?
আর না পাইব তারে? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি!
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে,
বিশ্বজয়ী; স্মরি তারে চল রণস্থলে;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বূরকুলে,
কর্ব্বূরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী!"

নীরবিলা মহেষ্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে!
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে!
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে!
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি!—

মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিল
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে;
"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,—
হে রমেশ, তরাইলা, বহু মূর্ত্তি ধরি;—
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে; বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি, (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী) বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে!
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকারছলে,
বামন! বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে।
আর কি কহিব, নাথ! পদাশ্রিতা দাসী,
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"

হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি,
"কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ
বসুধে? আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে?"
উত্তরিলা কাঁদি মহী;—"কি না তুমি জান,
সর্ব্বজ্ঞ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী!
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে!
দেবাকৃতি রথিপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে;
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে;
করিলা প্রতিজ্ঞা, ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে;—অবিলম্বে; হায় আরম্ভিবে
কাল রণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নব রোষে। কেমনে সহিব

এ ঘোর যাতনা নাথ, কহ তা আমারে ?"

চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে।
দেখিলা রাক্ষসদল বাহিরিছে দলে
অসঙ্খ্য প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি!
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে! টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা। বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য; উর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে!
পলাইছে যোগিকুল যোগ যাগ ছাড়ি;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী
ভয়াকুলা; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি। ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে;—
"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে,
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।
না হেরি উপায় কিছু; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি।" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা;—"হায় প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী; সতত রত নিধনসাধনে!
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, শৌরি, সদা দংশাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে! দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ? বাঁচাও দাসীরে,
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে।"

উত্তরিলা হাসি বিভু, "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে; সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"

মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু,—"উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্ দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"

বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ, মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।

যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য; দেববৃন্দ পশিলা সমরে
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে।
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে!

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি,—
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি!
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি। তেঁই আজি চরণ-পরশে

পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী!"
উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে,—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি!
উঠি দেবরথে রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী। নিজ কর্ম্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি, কে রক্ষিবে তারে?
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ড লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর অর্পিবে তোমারে,
দেবকুল! কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে?"

বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরথী;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী; রণভূমি পূরিল ভৈরবে!

আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে
আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
রথীশ্বর; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে। চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে! অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,
বাজিরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্ব্বনাশী) হনূ সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর! শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজপ্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে। উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে
টলিলা কনক লঙ্কা; গর্জ্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলি

বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিলা,
ধায় অগ্রে ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে!
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।

সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী,—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী
দেখ চেয়ে! ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিৎ!" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;—
"চালাও, হে সূত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি!
পালাইল রঘুসৈন্য, পালায় যেমনি
মদকল করিরাজে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,

সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরিদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি!"

কহিলা পার্ব্বতীপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!"

সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ্‌লো, সখি, চাহি লঙ্কা পানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়! আকাশে দেখ্‌, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ;—যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার্ কুমারে, সই! বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।

বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।

ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বূরপতি গর্ব্বে সুরনাথে;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে!
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি!

হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে!
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়; নারিলা
লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী!
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে

ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি, "না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে!
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রক্ষবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনূ, গর্জ্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।
অধীর হইলা হনূ, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে। পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেণ কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনূ।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ,—রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথিকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব,—"অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ? পরদারলোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট! রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে!
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল
শিখর;—সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে! বিষমবিাতে ব্যথিত সুমতি,
পালাইলা, পালাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে); দেবদল, তেজোহীন এবে,
পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে

পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি! বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে!
দেবদত্তধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্ম্মিলা,
ভাব দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল্য জগতে।"

গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!"

বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে!
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা,—"বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরী!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!"

স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উঠিল গর্জ্জিয়া,
উজ্জলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণরিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ-গিরিসম পড়িলা সুমতি।

গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইল ধরিতে শবে! উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ! হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িল সৌমিত্রি শূরে। কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,—
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে! ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষ্মণের দেহে!"

হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর!" মনোরথ গতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র; "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে?"

স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী; তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,

রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দিবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সঙ্গীতে!
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম
সপ্তমঃ স্বর্গঃ।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে,
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব; তারাদলে আইলা রজনী;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে! ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে! নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য;—বিভীষণ বিভীষণরণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনূ, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ণ সবে প্রভুর বিষাদে!
চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চৌরে উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে!

তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বূরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলিদল ! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই নয়ন উন্মীলি !

"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে !
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি,
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও করুণাময় ভিখারী রাঘবে !"

এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে কোলে করি প্রিয়তমানুজে ;
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।

নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে ; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে
অশ্রুবারি, শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যূষে ! সুধিলা প্রভু, "কি হেতু, সুন্দরি
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা আমারে ?"
কি না তুমি জান, দেব ?" উত্তরিলা দেবী
গৌরী ;—"লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে !
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে ? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায় ; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র ; তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে ?
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে !
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে !"

নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে।
হাসি উত্তরিলা শম্ভু, "এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি ?
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতান্ত নগরে
মায়া সহ ; সশরীরে, আমার প্রসাদে,
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার ; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে !

দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি।
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল ; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।”

কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায় ; মৃদুস্বরে কহিলা পার্ব্বতী ;—
“যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি!
কাঁদিছে মৈথিলীপতি সৌমিত্রির শোকে
আকুল ; সম্বোধি তারে সুমধুর ভাষে,
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দশরথ পিতা
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে! ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তম্ভ সম
তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।” প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে সমুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা চলিলা রূপসী
লঙ্কা পানে ; কত ক্ষণে উতরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে।

রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,—
“মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি,
বাঁচিবে প্রাণের ভাই ; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে ; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ ; নির্ভয়ে, সুরথি ;
পশ তাহে ; যাব আমি পথ দেখাইয়া
তবাগ্রে! সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।”

সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থ। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুষি দেব পিতৃলোক আদি
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলি পুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিলা রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে?

চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।

কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত!
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে ; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে!
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা! ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে।

সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে!
স্বধিলা বৈদেহীনাথ,—"কহ, কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে ?"
উত্তরিলা মায়াদেবী,—"কামরূপী সেতু,
সীতানাথ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূমাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা!
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে;
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্বদ্বারে; পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন!
চল মোর সাথে তুমি; হেরিব সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর "কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে!" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে;—
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে!"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লোহময় পুরী দ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি!
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে,—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চিরদুঃখ-ভোগে;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে!"
অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু-শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার! সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি! নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা!
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে!
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাসি কাসি দিবানিশি; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া! বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি;
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহে লহরী

শুভ্রজলরয়রূপে ! তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রহিছে প্রবলে
ক্ষীণ-অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে! অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা।
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত ; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী ! কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা ; কভু বা কাঁদে ; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে ; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ; গিলে বিষ ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি! কভু, ধিক্! হাব ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা! মল, মূত্র, না বিচারি কিছু
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে!
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে !
আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে ?
    দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে,)
রণে। রথমুখে বসে ক্রোধ সূত বেশে !
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে। দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি ;
ঊর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে !
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্বা, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর! রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে
কহিলেন মায়াদেবী—“এই যে দেখিছ
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি,
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতান্তনগরে,
সীতাকান্ত ; দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।
দক্ষিণ দুয়ার এই ; চৌরাশি নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।”
পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত ; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে !
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল, মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি ; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে !
    কত ক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি ! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে ! “হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু ? হা দারুণ, কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ?
কোথা তুমি, দিনমণি ? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু ? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব ? কোথা সুত, দারা,
আত্মবর্গ ? কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি ?”
    এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,—
“বৃথা কেন, মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা ? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে !
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু ?

সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !”

নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে ;
কাটে কৃমি ; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে ! আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী !

কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,—
“রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময় ! পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা ; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে ;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে !
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে,
জলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর, অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জলে নিত্য ! চল, রথি, চল, দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে ! ওই শুন, বলি,
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি ! মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি !
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে
চিরবন্দী !” করপুটে কহিলা নৃপতি,
“ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে ! মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে ? অসহায় নর ; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে ?” উত্তরিলা মায়া,—
“নাহি বিষ, মহেষাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধ যারে ! তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে ?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা ;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেন তারে !
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে !”

কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ, নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিনী।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগিহাস্য যথা।

লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
“কে তুমি, শরীরি ? কহ, কি গুণে আইলা
এ স্থলে ? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি ?
কহ কথা ; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা-বরিষণে ! যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে !”

উত্তরিলা রক্ষোরিপু, “রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল ; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী ;
রাম নাম ধরে দাস ; হায়, বনবাসী,
ভাগ্য-দোষে ! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।”

উত্তরিল প্রেত এক, “জানি আমি তোমা,
শূরেন্দ্র ; তোমার শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটীবনে আমি !” দেখিলা নৃমণি
চমকি মারিচ রক্ষে—দেহহীন এবে !

জিজ্ঞাসিল রামচন্দ্র, "কি পাপে আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে?"
"এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ!" উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী,
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম!" আইল দূষণ
সহ খর, (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে,) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা! সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পলাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড়! কহিলা শূরেশে
মায়া, "এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত দেখাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে!" দেখিলা বৈদেহী
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
উর্দ্ধশ্বাস! মায়া সহ চলিলা বিষাদে
দয়া-সিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।

কত ক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
সিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
আকাশে! কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ কেশাবলী,
কহিছে, "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মনঃ ধর্ম্ম, কর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবনমদে!" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায়, হীরামুক্তা ফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে!" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দ্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিলা, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে!
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?"

চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি-সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।

সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা! এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়?" অমনি বাজিল
পতিধ্বনি, "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়!" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।

আবার কহিলা মায়া,—"পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু," দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে!
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে!
দেবরাজ-কম্বু সম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবাদেশ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি

আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দ মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিল মৃদু হাসি; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী,
কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব!
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি?
বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে!
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে!
বিস্ময়ে দেখিলা রাম করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত পদাঘাতে।
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত
লৌহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাষে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে;—
"জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ; কামের দাসী, রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা;—দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা দুই দলে
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি!
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মর-ভূমে নরকাগ্রে; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয় বয়েসে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে!"—
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি,
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"
হাসিয়া কহিল মায়া, "অসীম এ পুরী
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ! পূর্ব্বদ্বারে সুখে

পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল ; স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অতুল এ পুরী
সে ভাগে ; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা!
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা!
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা! উত্তর দুয়ারে
চল, ব'ল, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে!
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার ; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পুরি কোলাহলে
চৌদিক্। দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালিবৃন্দে ঊর্ম্মিদলে যেন!
দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল ; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি ; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি ; করে কেলি তাহে
ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে!
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা ; হলাহল জ্বলে কোন স্থলে ;
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে,
ভীষণদশন কীট ; আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে!
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
সমীর ; জুড়ায় কান শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব, জনরব সহ ;—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি! চারি দিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ ;—সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম! কহিলা সুস্বরে
মায়া, "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের! কানন-পথে চল ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ
উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কত ক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুল শালবন যথা
বিশাল ; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে, কোথায় গরজে

গজেন্দ্র! খেলিছে চর্ম্মী অসি চর্ম্ম ধরি ;
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি ;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে! মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল ; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ! নাচিছে অপ্সরা ;
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি।

কহিলা রাঘবে মায়া,—"সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে ; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলিশম্ভুনিভ-পরাক্রমে ;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী ;
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে ;—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ-উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃ-প্রেমনীরে পুনঃ।"—সুধিলা সুমতি
রাঘব, "কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ শূরে?"

উত্তরিলা কুহকিনী, "অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি।
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে ;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্যা হইলা।

সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে
তেজস্বী ; কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ করে শূল, গজপতিগতি।

অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,
সুধিলা,—"কি হেতু হেথা সশরীরে আজি
রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;
কিন্তু দূর কর ভয় ; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে। কহিলা হাসিয়া
বালি, "চল মোর সাথে, দাশরথি রথি!
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু, রথী, পিতৃসখা তব!
পরম পীরিতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতে বিপদে ;
অসীম গৌরব তেঁই! চল ত্বরা করি।"
জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, "কহ কৃপা করি,
হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা
সকলে?" "খনির গর্ভে," উত্তরিলা বালি,
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব ; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে ;—
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।

রম্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে দেখিলা নৃমণি,

জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী ;
দ্বিরদ-রদ,নির্ম্মিত, বিবিধ-রতনে
খচিত আসনাসীন ! উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি । পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি
উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে ।
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত ! আদরে বীর কহিলা রাঘবে,—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র ! ধন্য তুমি ! ধরিলা তোমারে
শুভ ক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী !
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব !
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে । কহ, বৎস, শুনি,
রণ বার্ত্তা ! পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে ; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে ।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি,
অনুজ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে,
শিবের আদেশে আজি ! কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি ?"
কহিলা জটায়ু বলী, "পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে ।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে ;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি !"
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা ; দেবাকৃতি বহু
রথী ; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে ;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি
দশ দিশ ! দ্রুতগতি চলিলা দুজনে !
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে ।
কহিলা জটায়ু বলী, "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী ! সশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি
নিজস্থানে প্রাণিদল ।" গেল চলি সবে
আশীর্ব্বাদি । মহানন্দে চলিলা দুজনে ।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী ! বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি !
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে ।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি ; তাহে সরঃ, খচিত কমলে !
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে ।
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে, "পশ্চিম দ্বারে দেখ, রঘুমণি !
হিরণ্ময় ; এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী । দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘশিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী ! পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব । বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ,—ইক্ষাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে ।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ মহাবাহু!"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতীর পদতলে ; সুধিলা আশীষি
দিলীপ, "কে তুমি ? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি ?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম !" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা, "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি

কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা! কোন্ সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি!
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জলিলা নরদেবরূপে?"
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,
"ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্‌বিজয়ী; অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননী-পুত্র, লক্ষ্মণ-কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে! কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে!"
উত্তরিলা রাজ-ঋষি, "রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে!
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয়ে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।"
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী নদী তীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে; সুবর্ণ-শাখা, মরকত-পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতিপ্রদায়ী।
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা, "আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? পাইনু কি আজি
তোরে, হারাধন মোর? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে!
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই! তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা মম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, "অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে! কে তারে রক্ষিবে
এ বিপদে? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি! না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে! না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ!" কাঁদিলা নৃমণি

পিতৃপদে ; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ,—"জানি আমি, কি কারণে তুমি
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতিপুত্র হনূ আশুগতিগতি ;
প্রের তারে ; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম।
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে ; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে! রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে ;—
কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব!
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে!
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে ;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।

"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে!
দেববলে বলী তুমি যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে ; প্রের ত্বরা বীর হনূমানে ;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে ;—
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে!"

আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে।
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম ;—বৃথা!
নারিলা স্পর্শিতে পদ! কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে ;—
"নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ
প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"

প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি ;
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলী
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী ;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে প্রেতপুরী নাম
অষ্টমঃ স্বর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী ; জয় রাম নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম ! বিস্ময়ে স্থরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি,—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে ?
কহ শীঘ্র ! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি ? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল !
অবিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম ; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে ; বাঁচিল যে দুই বার মরি
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে ?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর কি ঘটিল এবে ?"

কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে !—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র ? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি,
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ দানে, প্রভু, বাঁচাইলা পুনঃ
লক্ষ্মণে ; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে ;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে !"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা স্থরথী
লঙ্কেশ,—"বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?"
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি ! মরিল সংগ্রামে
শূলিশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর ! প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব ভবতলে ?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় স্থরথী
রাঘব ;—কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল রঘুপতি !—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি !
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;
পর-মনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।"
বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গিদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল

ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।
    শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-কুল-মণি,
আনন্দ-সাগরে মগ্ন ; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে
নব-রস ; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায় ; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল ! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে,—
দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী !
    কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ ত্বরা ;
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গিদল সহ ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।"
    আদেশিলা রঘুবর, "আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে ।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে ?"
    প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ) "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি
পুত্রের সংক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি !—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা ! ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি ;
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;—
পর-মনোরথ আজি পূরাও সুরথি।"
    উত্তরিলা রঘুনাথ,—'পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব ; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে !
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয় ? যে তরুরাজ জলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে !
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর ! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক ! এতেক কহি নীরবিলা বলী।
    নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি,—
"নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে !
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি !
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে ?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নরদলপতি তুমি রাঘব ! কুক্ষণে—
ক্ষম ! আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে !—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহে দোঁহে রিপুভাবে !
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে ?
যে বিধি হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র রিপু ;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে ?"
    প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত ! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতাবৃন্দে ; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে !
    যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি

বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলি,—
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে
এ দুদিন পুরবাসী? শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে; দেখিনু আকাশে,
অগ্নিশিখাসম শর; দিবা-অবসানে,
জয় নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে,
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিক্বণে!
কে জিনিল? কে হারিল? কহ ত্বরা করি,
সরমে! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ। না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে?
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে।
বিকটা, ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা। আর চেড়ী রোধিল তাহারে;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি!
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে!"

কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে;—
"তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিত! তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী! কাঁদে মন্দোদরী;
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে,—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে!"

উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,—"সুবচনী তুমি
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে!
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী।
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে?
কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি।"—কহিলা সরমা
সুবচনী,—"কর্ব্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি! সপ্ত দিবানিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে,—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা!—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি! হর-কোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে?"

কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতি দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে;—
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ বনবাসী!
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি

লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে?
মরিবে দানববালা অতুল এ ভবে
সৌন্দর্য্যে! বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল!"—"দোষ তব",—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়নজল—"কহ কি, রূপসি?
কে ছিঁড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি
রাঘবমানসপদ্ম এ রাক্ষসদেশে?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি!
আর কি কহিবে দাসী?" কাঁদিলা সরমা
শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে,
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।

খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পুরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজিরাজী সহ গজ; রথিবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে!
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!

বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে;—কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে!
উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে!
হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা!
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্ব্বভেদী? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে; কোলাহল উঠিছে গগনে!
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে,—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে!
সারসন মণিময়; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম!
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী;
পেশল-উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী!

বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে!—কাঁদে ঘোর কোলাহলে

রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র; সুকবচ; সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট; আর বীরভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীর মুখে।

সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী!
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সুচামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর-কররাশি তোর বিম্বাধরে
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা,
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে!
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ; দেয়হুলাহুলি!
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!

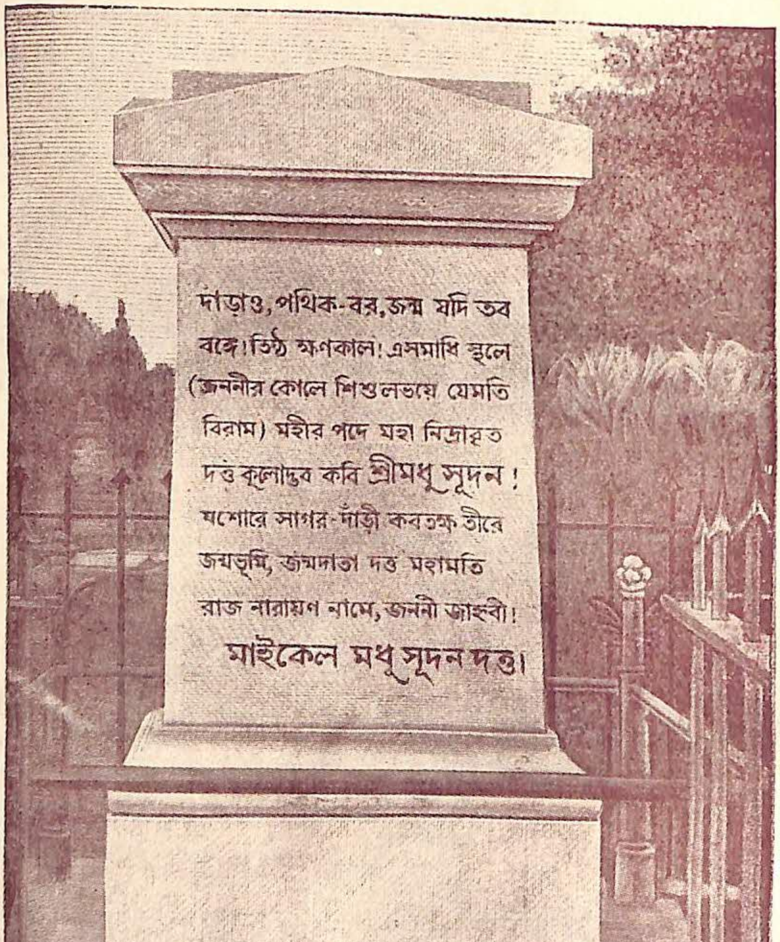
বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ;—বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;—
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল, বনিতা,
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে!
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে!
কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে! সাবধানে যাও, হে সুরথি!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে!
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষস,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে!"

দশ শত রথী সাথে চলিলা স্থরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল ;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা ;
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী ;
মৃগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত ; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি ;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে ; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।
উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে!
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী ;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে!
মুহূর্ত্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী,
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে ;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে!
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বূর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে!

সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে,
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"
অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে!
লড়িল মস্তকে জটা; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে!
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে!
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে;—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে;
নহে দোষী রঘুরথী! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায়!" চরণযুগ ধরিলা জননী।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে।"
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী;—
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে!
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে!
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি,
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে।
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে!
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিলা মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে॥

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে সংক্রিয়া নাম
নবমঃ সর্গঃ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।


দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগর-দাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজ নারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সমাধি

দ্বিতীয় খণ্ড

আলোচনী

"নবযুগের প্রাণবান্ সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্‌বোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলে না। আপন শক্তির 'পরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলাভাষার 'পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন; বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।...শাস্ত্রিক প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্তে ঝড়ের পিঠে—প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে।"

—রবীন্দ্রনাথ

আলোচনা

১। মাইকেলের যুগ

কোনো কবিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার যুগকে বুঝিতে হয়, কবির জীবনকেও বুঝিয়া লইতে হয়। শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদনকে বুঝিতে হইলে তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই যুগের পরিচয়, বিশেষ করিয়া সেই যুগের সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় শুধু আবশ্যক নহে, অপরিহার্য। কারণ, সাহিত্যের ইতিহাসে যখনই কোনো প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তখনই আমরা দেখিতে পাই, সেই যুগের প্রভাব তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং সেই যুগও তাহার দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবিত হইয়াছে। ইহাই নিয়ম।

রামমোহনের মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮২৪ সালে মাইকেলের আবির্ভাব। বাংলার ইতিহাসে তখন যুগসন্ধিক্ষণ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের যাঁহারা যুগপুরুষ—দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, ভূদেব প্রভৃতি—তাঁহারা সকলেই দুই এক বৎসরের ব্যবধানে তখন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্মে তখন বিপ্লব দেখা দিয়াছে। কলিকাতা তখন ছিল অখ্যাত অসংস্কৃত পল্লী। সেখানে বিদেশী বাণিজ্যের হাট বসিল; গ্রামের শ্যামল আবেষ্টন সরাইয়া দিয়া শহরের উদ্ধত রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে সেই শহর আধুনিক কালকে আসন পাতিয়া দিল; বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রপরিচালনের পথ বাহিয়া বাংলাদেশে এক নূতন সভ্যতা আসিল এবং ইহারই প্রতিক্রিয়ায় বাংলার চিত্তলোকে নূতন বেগ সঞ্চারিত হইল।

একদিকে পণ্য এবং রাষ্ট্র-বিস্তারে পাশ্চাত্ত্য-মানুষ এবং তাহার অনুবর্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, অন্যদিকে পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিককালের প্রধান বাহন পাশ্চাত্ত্য-সংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ। পাশ্চাত্ত্য-সংস্কৃতিকে আমরা যে তখন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম তাহার স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির উদারতা, চিত্তলোকে ইহার সর্বত্রগামিতা—নানা ধারায় ইহার অবাধ প্রবাহ, ইহার মধ্যে নিত্য-উদ্যমশীল বিকাশ-ধর্ম নিয়ত উন্মুখ—সকল প্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা হইতে মানুষের মনকে মুক্ত করিবার জন্য ইহার প্রয়াস। এই সংস্কৃতি আপন বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, বিশ্ব ও মানবলোকের বিচিত্র বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সকল কিছুই পরীক্ষা করিয়াছে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম-স্থূল যত কিছু রহস্যকে অবারিত বিশ্লেষণ করিয়াছে, করিয়াছে।

এই সংস্কৃতির প্রথম স্পর্শেই বাংলাদেশ সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা লইয়া বাঙালী যথার্থই গৌরব করিতে পারে। প্রথম আরম্ভে ইংরেজি শিক্ষাকে ছাত্ররূপেই বাঙালী যুবক গ্রহণ করে। প্রথম ইংরেজি শিক্ষার ফলে দেশের মধ্যে একদিকে যেমন সচেতনভাবের জাগরণ লক্ষ্য-গোচর হয়, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি বিরাগ একশ্রেণীর মধ্যে প্রকট হইয়া উঠে। তাই পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা ধার-করা সাজসজ্জার ন্যায় তাহাদিগকে অস্থির করিয়া রাখিল, বাহির হইতে পাওয়া

জিনিসের অহংকার নিয়ত উদ্যত হইয়া রহিল। তখন ইংরেজি সাহিত্যের ঐশ্বর্যভোগের অধিকার ছিল দুর্লভ এবং অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তাধীন; সেই কারণেই এই সংকীর্ণশ্রেণীগত ইংরেজি-শিক্ষিতের দল নবলব্ধ শিক্ষাকে অতিরিক্ত আড়ম্বরের সঙ্গেই ব্যবহার করিতেন। কথায়-বার্তায়, পত্রব্যবহারে, সাহিত্য-রচনায় ইংরেজি ভাষার বাহিরে পদক্ষেপ তখনকার নব্যশিক্ষিতদের পক্ষে ছিল অকৌলীন্যের পরিচায়ক। বাংলাভাষা তখন সংস্কৃত-পণ্ডিত ও নব্যশিক্ষিত দুই দলের কাছেই অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। এই ভাষার দারিদ্র্যে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিতেন। "এই ভাষাকে তাঁরা এমন একটি অগভীর শীর্ণ নদীর মতো মনে করতেন যার হাঁটুজলে পাড়াগাঁয়ে মানুষের প্রতিদিনের সামান্য ঘোরো কাজ চলে মাত্র, কিন্তু দেশবিদেশের পণ্যবাহী জাহাজ চলতে পারে না"—(রবীন্দ্রনাথ)।

মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব হয় বাংলার জাতীয় জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে। সে যুগে পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজের রীতিনীতির প্রভাব বাংলার সমাজ ও সাহিত্য-ক্ষেত্রকে আলোড়িত করিয়া তুলে, পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য এবং পাশ্চাত্ত্য-সমাজের আদর্শের সহিত সংঘর্ষে প্রাচ্যের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও সাহিত্যে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। সেই বিপ্লবের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের একটা সামঞ্জস্য-সাধনের জন্য রামমোহনের পরবর্তী যুগমানবগণ তখন বদ্ধপরিকর। সে যুগে দেশের কুপ্রথাসমূহের মূলোচ্ছেদ হইতেছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব দেশের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সমস্ত দিকেই পরিবর্তন পূর্ণ বেগে চলিয়াছে। নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর পুরাতন রুচি ও প্রবণতার পরিবর্তন হইয়াছে, বাঙালীর মধ্যে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা ও অভাব-বোধের আবির্ভাবে বাঙালী নূতন উৎসাহে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ঠিক এই যুগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সমবেত প্রাণপাত প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যসাহিত্য শক্তিশালী ও সকল প্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য কবিগণের অনুসৃত আদর্শ অথবা পাশ্চাত্ত্য কাব্যের সৌন্দর্য বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত করাইবার মতো কোনো প্রতিভাশালী কবির তখনো আবির্ভাব হয় নাই। নূতন সাহিত্যরস-সম্ভোগের সহজ শক্তি লইয়া তখনো নূতন কোনো প্রতিভার অরুণোদয় ঘটে নাই।

তখনো বাংলা সাহিত্যের পদ্যবিভাগে গুপ্তযুগ—অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব তখনো বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অপ্রতিহত। কিন্তু বিশুদ্ধ রুচির অভাবে, যমক-অনুপ্রাসের প্রাচুর্য এবং অর্থহীন শব্দবিন্যাস-প্রিয়তার জন্য গুপ্ত কবির কবিতা সেই যুগের ইংরেজিশিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টিসাধন করিতে পারে নাই। সেদিনের বাঙালী যুবকমাত্রেই পাশ্চাত্ত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্ত্য-কাব্যরসপিপাসু হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের অসাধারণ প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সাধ্য ছিল না যে, তিনি তাঁহার কবিতার দ্বারা বাংলার নব্য-পাঠক-সম্প্রদায়ের কাব্য-রসপিপাসা মিটাইবেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইউরোপের 'রেনেসাঁস-এর মতো যে একটি ব্যাপার ঘটিয়া-ছিল, তাহার স্বরূপটি না বুঝিতে পারিলে মাইকেল যুগের বৈশিষ্ট্য ঠিকমত ধরিতে পারা যাইবে না। বাংলার এই যে রেনেসাঁস বা নবজন্ম—উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয়—বাংলার একালের সাহিত্য

তাহারই ভিত্তিভূমিতে গঠিত হইয়া ধন্য। এই রেনেসাঁসের মূলে যে বহু বিচিত্র প্রভাব কাজ করিয়াছিল সেগুলির মধ্যে দুইটিকে বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরা যাইতে পারে; একটি—বাঙালীর নূতনত্বের পূজারী প্রকৃতি; অপরটি—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের ইউরোপীয় নব-মানবতাবাদ। বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ। বাঙালীর প্রকৃতির মধ্যেই পলিমাটির ধর্ম রহিয়াছে। তাই নব-মানবতাবাদী ইউরোপের বিপুল আকর্ষণ এই যুগে শিক্ষিত বাঙালী সহজেই অনুভব করিয়াছিল। এই সময় বাংলায় যে নবজাগরণ দেখা দিল মুখ্যতঃ তাহার তিনটি ধারা। প্রথমটিকে বলা যায় রামমোহনী ধারা (নব্যবাংলার গুরুই রামমোহন রায়); দ্বিতীয়টি হিন্দু-কলেজীয় ধারা—যুক্তিবাদী ও ভারতপ্রেমিক হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ইহার প্রবর্তক; তৃতীয়টি নব-হিন্দুত্বের ধারা—ইহার প্রথম ও প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন রামকৃষ্ণ। বাংলার এই নবজাগরণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভে সূচিত হইলেও বাংলা সাহিত্যে ইহার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটে সেই সূচনার অনেকদিন, প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে। রূপ ও রসের দিক্ দিয়া যে সাহিত্য বিশেষভাবে আধুনিক-লক্ষণাক্রান্ত—তাহার উদ্ভব হইল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায়—হিন্দু-কলেজীয় ধারায়। এই নবসাহিত্যের স্রষ্টা বাংলার পরমপ্রিয় আর একান্ত ভাগ্যতাড়িত মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

অসাধারণ প্রতিভা লইয়া মাইকেল মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতিদত্ত শক্তি, প্রতিভা এবং অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার এই নবীন কবি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করিলেন, গাম্ভীর্য ও ভাববৈচিত্র্যে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। মধুসূদনই সর্বপ্রথম দেখান যে, বাংলাভাষায় কেবল বাঁশীর মৃদুমধুর গুঞ্জরণ অথবা বেণু-বীণানিক্বণ ধ্বনিত হয় না, প্রতিভাশীল লেখকের হস্তে ইহার ভিতর দিয়া ভেরীর সুগম্ভীর রবও প্রকাশিত হইতে পারে। মধুসূদনই ইহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, বাংলাভাষা নির্জীব নহে, ইহা সজীব ভাবধারার বাহন হইতে পারে,—দৃঢ়তায় ও স্থিতিস্থাপকতায় ইহা অন্য যে-কোনও উন্নতিশীল ভাষার সমকক্ষ। মধুসূদনই বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আধুনিক যুগের উন্মেষে বাংলা গদ্যের শক্তি আবিষ্কার করেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র; আর মধুসূদন আবিষ্কার করেন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি।

এই যে আবিষ্কার, ইহার মূলে ছিল পশ্চিম হইতে সদ্য-আগত এক শক্তিশালী শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাত—যাহা নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের চেতনায় যুগান্তর আনিয়া দেয়। এই যুগ সাহসের যুগ, বন্ধন ছিন্ন করার যুগ, সংস্কারমুক্ত হওয়ার যুগ। তাই এই যুগের কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া মধুসূদন এই যুগের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইয়া উঠেন এবং যুগের ধর্ম তাঁহাকে যেমন আকৃষ্ট করে তেমনি তাঁহার প্রতিভার উপর প্রভাবও বিস্তার করে। প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই—বাঙালী মধুসূদনকে ইংরেজি-শিক্ষা খৃষ্টান করিলেও একেবারে ইংরেজ বানাইতে পারে নাই। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতাকে রামমোহন যেমন আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, মধুসূদনও তেমনি উহাকে আত্মসাৎ করিয়া বাংলা কাব্যে যুগান্তর ঘটাইলেন। "পাশ্চাত্ত্য হোমর-মিলটন-রচিত মহাকাব্য-সঞ্চারী মন ছিল তাঁহার। তাহার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার

ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকিতে পারেন নাই। আষাঢ়ের আকাশে সজল-নীল মেঘপুঞ্জ হইতে গর্জন নামিল, গিরিগুহা হইতে তাহার অনুকরণে প্রতিধ্বনি উঠিল মাত্র, কিন্তু আনন্দচঞ্চল ময়ূর আকাশে মাথা তুলিয়া সাড়া দিল আপন কেকাধ্বনিতেই। মধুসূদন সংগীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করিবার জন্য আপন ভাষাকেই বক্ষে টানিয়া লইলেন—ইংরেজি ভাষাকে নহে। যে-যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিলেন না, তাহাতেই তিনি গম্ভীর স্বরের নানা তার চড়াইয়া তাহাকে রুদ্রবীণা করিয়া তুলিলেন। এই যন্ত্র একেবারে নূতন, একমাত্র মধুসূদনেরই আপন-গড়া।"

যুগধর্ম এই যন্ত্রনির্মাণে মধুসূদনকে যে সাহায্য করিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। পুরাতন কালের অনুপ্রাসকণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালী প্রভৃতি গানকে বিশুদ্ধ জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দিয়া অনেকে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি প্রতিকূল কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, মানুষের চিত্ত স্থাণু নহে; অন্তরে বাহিরে চারিদিক্ হইতেই নানা প্রভাব তাহার উপর নিয়ত কার্য করিতেছে, তাহার অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং অবস্থার পরিবর্তন নিরন্তর ঘটিতেছে—ক্রম-বিবর্তনের ধারাপথে ইহা ঘটিতে বাধ্য। মানুষের চিত্ত যদি জড়বৎ অসাড় না হয় তাহা হইলে তাহার আত্মপ্রকাশে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটিবেই, জাতীয় আদর্শ নাম দিয়া কোনো-একটি প্রাচীন আদর্শবন্ধনে নিজেকে নিশ্চল করিয়া রাখা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইতেই পারে না। তাই সাহিত্যে বাঙালীর মনকে বহুকালের আচারসংকীর্ণতা হইতে মুক্তি দিয়া মধুসূদন শুধু তাঁহার প্রতিভার অসামান্যতাই প্রমাণ করেন নাই—সমগ্র বাঙালী জাতির চিৎশক্তির সজীবতা যাচাই করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে মাইকেল-প্রতিভার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে তাঁহার যুগ বা পারি-পার্শ্বিককে ভর্তি করিয়া বিবেচনা করা প্রয়োজন। পলাশীর যুদ্ধের ৬৬ বৎসর পরে মাইকেলের জন্ম। এই দীর্ঘ কালে ইংরেজের রাজত্ব এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙালীর মনে একটা গুরুতর পরিবর্তন আসিয়াছে। দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। এই নূতন শিক্ষার ফলে বাঙালীর মনে যাহাতে তাহার প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিরাগ জন্মে, মেকলে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুপরি ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য, তাহার শক্তি ও সভ্যতা বাংলার সমাজ-জীবনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল। বাংলাদেশে তখন যে মানসিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার সকল অংশ যে ইংরেজের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি, তাহা নহে। দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় সভ্যতার সংঘাত ইহার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। ইউরোপীয় সভ্যতাকে তখন বাঙালী দেখিয়াছে শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীকরূপে। সুতরাং এই সভ্যতার মোহ অতিক্রম করা কঠিন ছিল।

বাংলার সমাজ-জীবনে এই সাংস্কৃতিক সংঘাতের ফল হইয়াছিল সাংঘাতিক। মধুসূদনের জীবন-চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন: "হিন্দু কলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র বাংলায় বিশুদ্ধরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাংলাভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে বা থাকিতে পারে তাহা তাঁহাদিগের মনে উদিত হইত না। সাধারণ দোকানদার ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ আছে; এইমাত্র তাঁহারা জানিতেন। গুপ্ত কবির 'প্রভাকর' তখন বঙ্গসমাজের এক অংশে জ্যোতিঃ দান করিতেছিল বটে, কিন্তু নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের

নিকট তাহার বড় সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মধ্যে যাঁহারাই অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত তাঁহারাই তাহার সমাদর করিতেন। বাংলাভাষায় কথাবার্তা বলা এবং বাংলায় পরস্পরকে পত্র লেখা অগৌরবের বলিয়া তাঁহাদের ধারণা জন্মিল। ডিরোজিয়োর শিক্ষায় ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় আচার ও স্বদেশীয় সাহিত্য উভয়ই সমভাবে নির্বাসিত করিতে প্রস্তুত হইলেন।"

মধুসূদন এই নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সময় হইতেই বাংলায় সম্পূর্ণ নূতন ও চাকচিক্যময় একটি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়া গিয়াছে,—ইহাই হইল তখনকার ভদ্রলোক শ্রেণী। মধুসূদন এই শ্রেণীর লোক। স্বভাবতই এই শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর উপর প্রগতিশীল বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব আসিয়া পড়িল। মধুসূদনের ছাত্রজীবনে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি এই শ্রেণীর বিমুখতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিল। রামমোহন বাঙালীর ঘরের জানালা খুলিয়া দিলেন। সেই খোলা-জানালার পথে দূর-দূরান্তের যে আলো আসিতে লাগিল তাহাতে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিল।

মধুসূদনের কবিজীবনের সূচনায় এই দৃষ্টিবিভ্রম আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। যুগধর্মের প্রভাবে কিছুকাল তিনি এই স্বপ্নে বিভোর ছিলেন যে, ইংরেজি কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইবেন, এই স্বপ্নের প্রেরণায়ই তিনি খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার এই ধর্মান্তরগ্রহণে তাঁহার স্বজাতীয়দের অনেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই ধর্মান্তরগ্রহণ তাঁহার নিজের জন্য যতবড় দুঃখের কারণ হউক, তাঁহার জাতির জন্য, বাংলাভাষার জন্য প্রকৃতই এক মহা লাভের ব্যাপার হইয়াছে। এই সূত্রেই খৃষ্টান পাদরীদের সাহায্যে গ্রীক, লাতিন, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুরু হয় কবির বলিষ্ঠ পদচারণা—তাঁহার নব-সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয় এই সব বিদেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় পরিচয়ের ফলে। খৃষ্টান হইলেও দেশের ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির উপর তিনি কোনোদিনই তাঁহার আস্থা হারান নাই। তাঁহার স্বাজাত্যবোধ ছিল যেমন সুগভীর, তেমনই যুগধর্মের প্রভাবে উহারই পাশাপাশি সুনিবিড় হইয়া গড়িয়া উঠে বিশ্বমানবজীবনের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা। রামমোহেনের নিকট হইতে আমরা যদি পাইয়া থাকি বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের নির্দেশ, তাহা হইলে একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, মধুসূদনের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি বিশ্বব্যাপক হৃদয়ধর্মের স্বাদ।

"নবযুগের প্রাণবান্ সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাতে উদ্‌বোধিত হল, অমনি, মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলাভাষার পায়ে-চলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করলেন না।" যুগের প্রভাব তখন তাঁহার মধ্যে এমনভাবে কার্যকরী হইয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে যে ক্ষণিকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘুচিয়া গিয়া আদর্শের সন্ধান তিনি পাইলেন। স্বদেশের সংস্কৃতি ও স্বীয় প্রতিভার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই মধুসূদন বাংলাভাষার উপরে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত চিত্তে "বাংলাভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতায় দীক্ষা দিলেন যাহা তাহার পূর্বানুবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করিয়া তুলিবার জন্য সংস্কৃতভাণ্ডার হইতে মধুসূদন নিঃসংকোচে যে-সব শব্দ আহরণ করিয়াছিলেন, তাহাও নূতন; বাংলা পয়ারের সনাতন সমদ্বিভক্ত আল ভাঙিয়া দিয়া তাহার উপর

অমিত্রাক্ষরের যে-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাও নূতন, আর মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য রচনায় যে-রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও বাংলাভাষায় নূতন।" বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে যুগের জন্ম দিয়াছিল তাহার অন্তরের কথাটাই ছিল নবীনের জয়গান। পুরাতনের পত্রপুট বিদীর্ণ করিয়া এই যে নবীনের অভ্যুদয়—মধুসূদনের প্রতিভা এই অভ্যুদয়কে সমস্ত মন দিয়া বুদ্ধি দিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। যুগের ধর্ম এবং যুগের প্রভাব মধুসূদনের মধ্যে সার্থক হইয়াছিল এই অর্থে যে, ইউরোপীয় সাহিত্যের সৌন্দর্যের স্বরূপ তিনি সাধকের মত সমাহিতচিত্তে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভাববিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। এইজন্যই সাহিত্যের আকাশে অরুণালোকের স্বাক্ষরে মাইকেল-প্রতিভা প্রভাতের জ্যোতির্ময়ী প্রত্যাশাকে অকুণ্ঠভাবেই ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

২। কবি জীবনী

"কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা কবির কীর্তি তাহা ত' আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই বুঝি। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে; এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

কপোতাক্ষ নদের তীরস্থ যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের (মতান্তরে ১৮২৩) ২৫শে জানুয়ারী শনিবারে এক সঙ্গতিপন্ন কায়স্থ-পরিবারে কবিবর মাইকেল মধুসূদনের জন্ম হয়। তিনি শ্রীমধুসূদন হইয়াই জন্মিয়াছিলেন, মাইকেল হইয়া নহে! ইঁহার পিতার নাম ছিল রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রের দুইটি বিশিষ্ট গুণ পরিস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করে—প্রথমতঃ, অধ্যয়নস্পৃহা ও দ্বিতীয়তঃ, কাব্যপ্রীতি। লেখাপড়ায় ইনি কখনো পরাঙ্মুখ ছিলেন না, অনলসভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। কি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায়, কি যৌবনে হিন্দু কলেজে অথবা বিশপস্ কলেজে অধ্যয়নকালে, কখনো পড়াশুনায় কাহারও পিছনে পড়িয়া থাকিবেন, মধুসূদন ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহা ভিন্ন, অতি শৈশবেই তিনি তাঁহার মায়ের নিকট হইতে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিতেন; আর উহা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। এই রামায়ণ-মহাভারত মধুসূদনের কবিজীবনের ভিত্তিস্বরূপ ছিল, তাই যাবজ্জীবন ইহারা ছিল তাঁহার আদরের বস্তু। বলা বাহুল্য, উত্তরকালে এই দুই অমূল্য গ্রন্থই তাঁহার প্রকৃতিদত্ত অসামান্য কবিত্বশক্তি-বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। বালকবয়সে আগমনী ও বিজয়ার গান শুনিয়াও মধুসূদনের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাল্যকালেই কবির অন্তর অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হইয়া উঠে।

গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন সমাপন করিয়া মধুসূদন নয় বৎসর বয়সে কলিকাতায় হিন্দু কলেজের জুনিয়র স্কুলে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হন। এইখানেই তিনি সহাধ্যায়িরূপে পান বাংলার অন্যতম মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে। জুনিয়র স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া মধুসূদন ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করেন। মধুসূদন যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে এক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁহার বন্ধু ও সহপাঠী ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। মধুসূদন হিন্দু

কলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় তিনি বহু ইংরেজি কবিতা রচনা করেন। এই সময়েই তাঁহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ। মহাকবি হইবার ও বিলাত যাইবার ইচ্ছা হিন্দু কলেজে পঠদ্দশাতেই তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এই সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বহু গ্রন্থ পাঠ করেন এবং তাঁহার রচিত কোনো কোনো ইংরেজি কবিতা বিলাতের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইতে সাহসী হইয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময়ে দুইজন ইংরেজ অধ্যাপকের প্রভাব তাঁহার চরিত্রে পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়; ইঁহাদের নাম ডিরোজিও ও রিচার্ডসন্। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, সে সময় যদিও ডিরোজিও সাহেব কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ছাত্রমহলে যে বিপ্লব তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা মধুসূদন অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন। ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রদিগকে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সকল বিষয়েরই দোষ-গুণ আলোচনা করিয়া নিজেদের কর্তব্যপথ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেন। মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র না হইলেও, ডিরোজিওর শিক্ষা তাঁহার জীবনে কার্যকরী হইয়াছিল। রিচার্ডসন্ও ডিরোজিওর ন্যায় কবির আদর্শস্বরূপ ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক রিচার্ডসন্ ছিলেন কবির কল্পনা-জগতের পথপ্রদর্শক। মধুসূদনের নিকট এই রিচার্ডসন্ এত প্রিয় ছিলেন যে, মধুসূদন তাঁহার গুণগুলির অনুকরণ ত করিতেনই, এমন কি তাঁহার দোষগুলিও অনুকরণ করিতে ভাল বাসিতেন। রিচার্ডসনের প্রভাবের মূল কথাই হইল আত্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধন। সুতরাং বালকবয়সে প্রকৃতির লীলাভূমি কপোতাক্ষ নদের তীরে লালিত-পালিত হইয়া এবং রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিয়া, মধুসূদনের অন্তরে যে কবিত্বশক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ডসনের শিক্ষায়, আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় তাহা যে উদ্ভিন্ন হইবার পথ খুঁজিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই রিচার্ডসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই মধুসূদন কলেজে অধ্যয়নকালে কেবল ইংরাজিতেই কবিতা রচনা করিতে থাকেন।

আশ্চর্য এই যে, যিনি বঙ্গসাহিত্যে যুগপ্রবর্তক কবি বলিয়া আজ বিখ্যাত, তিনি তাঁহার প্রথম জীবনে বঙ্গভাষার প্রতি একান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেকালে অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তির মত তাঁহারও ধারণা ছিল যে, ইংরেজি ভাষায় গদ্য-পদ্য রচনা করিয়াই তিনি যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিবেন। যাহা হউক, পরে তাঁহার এই ভুল ভাঙিয়াছিল এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিদেশী ভাষায় যতই অধিকার থাকুক না কেন, তাহাতে রচনা-শক্তি দেখাইয়া চিরস্থায়ী গৌরব অর্জন করা যায় না। ভুল ভাঙিবার পরে মধুসূদন বাংলাভাষার অনুশীলন আরম্ভ করেন এবং বাংলায় কাব্য, নাটক প্রভৃতি রচনা করিয়া অক্ষয় যশ অর্জন করিতে সক্ষম হন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে মধুসূদন বিজাতীয় ভাব ও আদর্শে আত্মহারা হইয়া পড়েন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠকবি হোমর, ভার্জিল, তাসো, মিলটনের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা এই সময় তাঁহাকে পাইয়া বসে। শুধু তাহাই নহে, বিলাত যাইবার আকাঙ্ক্ষাও এই সময় হইতে তাঁহার মনে বলবৎ হইয়া উঠে। এই আকাঙ্ক্ষা-পূরণের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই তিনি তাঁহার স্নেহময় জনক-জননী, সাংসারিক সুখসম্পদ্ সমস্তই জন্মের মত বিসর্জন দিয়া হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন (১৮৪৩)। খৃষ্টান হইবার পর তাঁহার নাম হইল মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায় মধুসূদনের হিন্দু কলেজে আর স্থান হইল না। হিন্দু সমাজেও নহে। অতঃপর তাঁহাকে বাধ্য হইয়া হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিশপস্ কলেজে ভর্তি হইতে হইল। ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও মধুসূদন মাতাপিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, ইহাই তাঁহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল। তাই রাজনারায়ণ পুত্রের শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন।

হিন্দু কলেজের ন্যায় বিশপস্ কলেজও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠিত করিতে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দু কলেজে ঘটে ভাব-প্রবণতা, কবি-প্রতিভা ও রচনাশক্তির উন্মেষ, আর বিশপস্ কলেজ হয় তাঁহার ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্র। ইংরেজি, লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অভ্যন্তরে যে সৌন্দর্য বর্তমান, বাংলাভাষায় কাব্যরচনা করিবার সময়ে উহা তিনি বাংলা কাব্যে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বিশপস্ কলেজে লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে আরম্ভ না করিলে মধুসূদনের কাব্যে আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সমাহৃত হইতে দেখিতে পাইতাম না। এই কলেজে তিনি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিবারও সুযোগ পাইয়াছিলেন।

খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া অচিরেই মধুসূদনের বিলাতগমনের সুবিধা হইল না। এমন কি বিশপস্ কলেজে থাকিয়া বেশীদিন পড়াশুনা করাও হইল না; পিতা অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। মাত্র তিন-চারি বৎসর বিশপস্ কলেজে অধ্যয়নের পর মধুসূদন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া অকস্মাৎ মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন (১৮৪৮)। মাদ্রাজে মধুসূদনের প্রবাসজীবন দারুণ দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যে পূর্ণ। এই স্থানে থাকিতে প্রথমে তিনি এক অনাথ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেন। ক্রমে অবশ্য তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও মাদ্রাজের তদানীন্তন বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'Spectator'-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার দারিদ্র্য দূর হয় নাই। তাই দারিদ্র্যমোচনের জন্য এবং দারিদ্র্যদুঃখ ও নৈরাশ্য বিস্মৃত হইবার জন্য তিনি মাদ্রাজে থাকিতেই নিজেকে সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত করেন। এইরূপে প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে প্রতিভার যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা উদ্গত হইবার সুযোগ পাইল। তিনি মাদ্রাজের বহু সাময়িক পত্রিকায় ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরেজিতে 'Captive Lady' ও 'Visions of the Past' এই সময়ের রচনা (১৮৪৯)। 'ক্যাপটিভ লেডী' মধুসূদনকে মাদ্রাজের কৃতবিদ্য-সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার সংবাদপত্র-মহলে ইহা তেমন আদৃত হয় নাই। বাঙালী পাঠকও ইহা তেমন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে নাই। বাংলা হইতে তাঁহার অনুরাগী বন্ধুরা বার বার মধুসূদনকে মাতৃভাষা চর্চা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। ইহাদের অনুরোধে তাঁহার মনের গতি ফিরিল; অতঃপর তিনি মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কৃতসংকল্প হইয়া বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন।

মধুসূদনের এই সময় দৃঢ় ধারণা হইল যে, বাংলাভাষাই তাঁহার কবিত্বস্ফুরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং যদি তিনি কোনো ভাষায় অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন তবে তাহা এই বাংলাভাষাতেই। যে বাংলাভাষার প্রতি এতদিন কবির বিরাগ ছিল, এইবার সেই বাংলাভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ

জন্মিল। রামায়ণ-মহাভারত তাঁহার চিরসঙ্গী ছিল। অনুরাগের সহিত মাদ্রাজে বসিয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিতেন এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্যভাষার অনুশীলন করিয়া ঐ সকল পাশ্চাত্ত্যভাষার কাব্যকানন হইতে মনোহর ভাবকুসুম চয়ন করিয়া উহা দ্বারা বঙ্গবাণীর দেউল সাজাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

এইভাবে মনে মনে বাংলাভাষার অনুশীলনে কৃতসংকল্প হইয়া এই ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে রিক্তহস্তে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন (১৮৫৬)। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পান। সে-যুগের সখের নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নাম হয়।

মধুসূদন ছিলেন প্রধানতঃ কবি, এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার প্রথম দান 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। ইহা কবির প্রথম কাব্য হইলেও তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ হয় নাটক-রচনার মধ্য দিয়া। তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইহাই মধুসূদনের প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনা ১৮৫৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকে চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনাবর্ণনার রীতি বাংলা সাহিত্যে নূতনত্বের সন্ধান দেয়। 'পদ্মাবতী' নাটক কবির দ্বিতীয় রচনা (১৮৬০)। প্রথম নাটকের ন্যায় ইহা পাশ্চাত্ত্য-আদর্শে অনুপ্রাণিত অভিনব সৃষ্টি। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এবং সৌন্দর্যসাধন করিয়া মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ছন্দ প্রথমে তিনি 'পদ্মাবতী নাটক'-এর অংশবিশেষে প্রয়োগ করেন; পরে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের আদ্যোপান্ত রচনা করেন। ইতিপূর্বে বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে আরও দুইখানি প্রহসন মধুসূদন রচনা করিয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী নাটক'-এর পর মধুসূদনের বিয়োগান্ত নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয় (১৮৬১)। ইহার পর তিনি আর কোন নাটক-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার প্রতিভা ঠিক নাটক-রচনার উপযোগী ছিল না।

মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পর তাঁহার হিতৈষিগণের চেষ্টায় মধুসূদন পুলিশ আদালতে মাসিক ১২০৲ টাকা বেতনে দোভাষীর (ইণ্টারপ্রিটার, Interpreter) চাকুরী পাইয়াছিলেন। রাজকার্য, পুস্তক-বিক্রয়ের আয় এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় স্বচ্ছন্দে তাঁহার দিনাতিপাত হইত। মাদ্রাজে থাকিতেই মধুসূদন প্রথমে রেবেকা নাম্নী এক স্কচ্‌ বংশীয়া মেয়েকে বিবাহ করেন (১৮৪৮)। এই বিবাহ স্থায়ী হয় নাই। বিবাহের সাত বৎসর পরে পত্নীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। ইহার পর ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের এক অধ্যাপকের কন্যা কুমারী হেনরিয়েটাকে তিনি বিবাহ করেন। ইনিই সাধারণের নিকট মাইকেল-পত্নী হিসাবে পরিচিতা। কলিকাতায় ফিরিবার পর তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল; এবং এই সময়ে বাংলাভাষার একজন অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া মধুসূদনের নাম বাংলার বিদ্বৎ-সমাজে সুপরিচিত হয়।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের পর ১৮৬১ (জানুয়ারী) সালে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধিত করেন। বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্ধিত হইবার সৌভাগ্য মধুসূদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের অল্পদিন পরেই মধুসূদন গীতিকাব্য 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১ জুলাই) এবং ১৮৬২ সালে রোমক কবি ওভিদের Heroic Epistles-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বীরাঙ্গনা' প্রকাশ করেন।

আশৈশব মধুসূদনের বিলাত-গমনে বাসনা ছিল। কিন্তু নানা বাধাবিপত্তির ফলে এতদিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি এইবার স্থির করিলেন ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রা করিবেন। ১৮৬২ সালের ৯ই জুন কবি পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া ইউরোপ যাত্রা করিলেন। প্রবাসে দারুণ অর্থকষ্টের জন্য কবির জীবনে এক বিষম সংকট দেখা দেয় এবং তাঁহার সেই চরম লাঞ্ছনার দিনে তিনি বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন এবং কবির এই ঘোর দুর্দিনে একমাত্র বিদ্যাসাগরই তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। ১৮৬৬ সালের শেষভাগে মধুসূদন লণ্ডনের গ্রেজ্ ইন হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কবির বয়স তখন ৪৩ বৎসর।

১৮৬৭ সালের গোড়ার দিকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া মধুসূদন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে তাঁহার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। ১৮৭০ সালে জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া মাসিক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টে অনুবাদ-বিভাগের পরীক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করেন। দুই বৎসর চাকুরী করিবার পর মধুসূদন পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তাঁহার অর্থচিন্তাই প্রবল হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করেন নাই। ১৮৭১ সালের শেষভাগে মহাকবি হোমরের 'ইলিয়াড' নামক মহাকাব্যের উপাখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়া মধুসূদন বাংলায় 'হেক্‌টর-বধ' প্রকাশ করেন।

ইহার পরই কবি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং তাঁহার আয়ুসূর্য ঢলিয়া পড়ে। রোগের যন্ত্রণা, ঋণের যন্ত্রণায় কবির শেষজীবন অশান্তিময় হইয়া উঠে। নিতান্ত অকালেই নির্মম মৃত্যু আসিয়া ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন ভাগ্যতাড়িত কবির বেদনাবিধুর জীবন-নাট্যের উপর চিরদিনের মত যবনিকা টানিয়া দেল। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর রচয়িতাকে অবশেষে কপর্দকহীন অবস্থায় হাসপাতালে মরিতে হইল! "বঙ্গের পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।"

মধুসূদন অতি অল্পকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে এবং ঐ অল্পসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াই তিনি মাতৃভাষার যে উন্নতিসাধন করিয়া যান, তাহাতে তাঁহার সহিত এক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোনও কবির তুলনা হয় না। তিনি তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা মাতৃভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্কার করিয়া বাংলাভাষার যে উৎকর্ষসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাংলাভাষার ইতিহাসে তাঁহার স্থান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং গৌড়জন চিরকাল আনন্দের সহিত তাঁহার কাব্যসুধা পান করিবে।

৩। মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভা

"সত্য বটে কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানাদেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্নসহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।……নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি।"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদনের কবি-প্রতিভা যে কতদূর অনন্যসাধারণ তাহা বুঝিবার জন্য যেমন দরকার তৎপূর্ববর্তী বাংলা কাব্যেতিহাসের খবর লওয়া তেমনি দরকার তাঁহার প্রতিভার প্রথম পদচারণার গতি-প্রগতি লক্ষ্য করা। বড়ো প্রতিভা যে কোনো ধরা-বাঁধা পথে আত্মপ্রকাশ করে না, মধুসূদন তাহারই এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁহার পূর্ববর্তী যুগন্ধর কবি বলিতে যাঁহার কথা মনে হয় তিনি হইলেন ভারতচন্দ্র, 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'অন্নদামঙ্গল যাঁহার কীর্তির সাক্ষ্য। মধুসূদনের যুগে এই ভারতচন্দ্রকেই পাঠকসমাজে কবিকুলচক্রবর্তীরূপে মাল্যচন্দনে পূজিত হইতে দেখা যায়। "রসনারোচন-শ্রবণ-বিলাস" রচনার বিপুল ঐশ্বর্যে কাব্যসাহিত্যের আসরে তাঁহারই আধিপত্য। মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত আসিয়া কেবল একটু নূতন ঢঙে নূতন ভাবের পরিবেশন করিলেন, রচনা-ভঙ্গিতে সেই হাল্কা যমক-অনুপ্রাসের চুমকি বসানো। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যসৃষ্টিতে তদানীন্তন সাহিত্যসমাজে যে চমক লাগে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মিলিবে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতে, "কিন্তু বোধহয় এতদিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল।" অর্থাৎ যুগের প্রভাবকে তুচ্ছ করিয়া সুরু হয় মধুসূদনের সৃজনী প্রতিভার জয়যাত্রা।

কিন্তু অভিনবত্ব শুধু এইখানে নহে। মাইকেলের কবি-প্রতিভা যে কি অসাধারণ মৌলিকতায় সমৃদ্ধ হইয়া জন্ম লইয়াছিল তাহার পরিচয় তাঁহার প্রথম ইংরাজী-কাব্য-সাধনায়। Captive Lady এবং Visions of the Past ইংরাজী কাব্য-সমুদ্রে তুচ্ছ দুইটি বুদ্‌বুদ্ মাত্র হইতে পারে, কিন্তু মাইকেলের কবি-প্রতিভার চরিত্র-নির্ণয় ক্ষেত্রে তুচ্ছ নহে। মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত Captive Lady ভারতবর্ষের অনৈতিহাসিক বিবরণের অংশবিশেষ অবলম্বনে লিখিত হয়। কবি-কল্পনার স্বাধীন বিবরণ ও প্রকাশ ভঙ্গির সৌষ্ঠব নিম্নোদ্ধৃত অংশে বিশেষ লক্ষণীয় :—

" 'Tis night—Oh ! how I hate her smile,
Which lights the horrors of this isle,
Where, like lone captives, we must sigh
O'er arms that rust and idly lie—
Far from the scenes, where oft the brave
Will meet thee, glory ! or a grave—
Far from the scenes, where revels gay
Will chase the darkest cares away—

Far from the scenes, where maiden bright
Will steal to list, at fall of night,
Her lover's lute and roundelay,
And like a viewless spirit shower
Her dewy wreaths on leaf and flow'r,
Love's token—and then swiftly fade,
And vanish like an airy shade!"

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন, এই উদ্ধৃত অংশের পাশাপাশি ঐ একই গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিলে ইহাদের বিলক্ষণ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যাইবে। 'পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে এই সময়ে কবির হৃদয়ে ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের অঙ্কুর উঠিল; কবি গাহিলেন—

And all around the dazzled eye,
Met scenes of gayest revelrie;
For, here beneath the perfum'd shade,
By some bright silken awning made,
'Midst rose and lily scatter'd round,
That blush'd as if on fairy ground,
Bright maidens—fair as those above—
Sang—softly—for they sang of love;
How fondly in the moon-lit bow'r,
When midnight came with star and flow'r
Young Krishna with his maidens fair
Rov'd joyously and sported there—
Or, on the Jumna's holy stream
Where star-light came to sleep and dream,
From his light skiff, that sped along
His soft reed breath'd the gayest song,
Which swelling on the fitful sweep
Of the lone night-wind's sigh—so deep—
Wing'd ravishment where'er it fell—
Love's accents in their airy spell!"

'Visions of the Past'এ বুঝি কবিত্বের আরও সুন্দর আরও পরিণত প্রকাশ ঘটিয়াছে যাহার জন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই কবিতা পাঠককে বায়রণের 'Dream' শীর্ষক কবিতাটি স্মরণ করাইয়া দেয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই কবিতার অংশবিশেষ সত্যই উপভোগ্য :—

"I look'd, it came that fulgent vision bright
A fleet of light upon a crystal Sea!
And as it came, the shadowy beings, which throng'd,
And hung around that bow'r of loveliness.
Like misty curtains, fled speed-wing'd and fast.
—As when, Bengala! On thy sultry plains,

Beneath the pillar'd and high arched shade
Of some proud Banyan—slumberous haunt and cool—
Echo in mimic accents 'mong the flocks,
Couch'd there in noon-tide rest and soft repose,
Repeats the deafening and deep-thunder'd roar
Of him—the royal wanderer of thy woods !

* * *

Methought I saw them stand with pallid brow
Eclips'd—as when from out the starless realm
Of the dark Grave—by Fancy fondly woo'd
In midnight resurrection, the pale shade
Of what was once ador'd and beautiful,
Stands by the mourner's pillow—silently
But as they saw that airy vision bright,
They fled like Guilt behind a leafy tree,
I stood as one entranced, and sight and sense
Slumber'd in deep and dark oblivion."

লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে প্রাথমিক স্তরেই যে কবি বিদেশী ভাষায় এইরূপ কাব্যসৃষ্টিতে সক্ষম, প্রতিভা তাঁহার অনন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, আর তাহার যাত্রাপথও হইবে পদে পদে অভিনবত্বে চিহ্নিত। তাই ইংরাজি ছাড়িয়া মধুসূদন যেই বাংলায় সাহিত্যসেবা সুরু করিলেন, অমনি সেখানেও তাঁহার চলার পথের দুই ধারে সোনার কমল ফুটিতে লাগিল।

প্রতিভার জন্ম কোনরূপ নিয়মাধীন নহে—কেবল দেশ, কাল ও জাতির কতকগুলি বিশেষ লক্ষণে তাহা একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে। বাংলাদেশে, যে সময়ে একটি প্রবল ভাববিপ্লব ঘটিয়াছিল—ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়া মেধাবী ও ভাবপ্রবণ বাঙালী যুবকেরা ইংরেজ কবি, ঐতিহাসিক ও স্বাধীনতামন্ত্রের প্রচারক বড় বড় লেখকের গ্রন্থ পাঠ করিয়া—একটা অপূর্ব উন্মাদনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, মধুসূদন সেই ভাব-বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং অতিশয় প্রাণ-শক্তিমান্ ছিলেন বলিয়া তিনি সেকালের প্রাচীন সমাজের গণ্ডিবদ্ধ অথচ নিরাপদ জীবনের শান্তিসুখ ত্যাগ করিয়া, সেই ভাব-বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছিলেন ; সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির দুরন্ত আবেগে তিনি প্রায় বালক বয়সেই পরিবার, সমাজ ও ধর্ম ত্যাগ করিয়া, প্রথমে খৃষ্টান পাদ্রীদের আশ্রয়ে—পরে জীবিকার সন্ধানে সুদূর মাদ্রাজে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, স্নেহের দুলাল মধুসূদন এই যে সর্বসুখ ত্যাগ করিয়া, নির্বান্ধব জীবন ও দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন—শান্তি অপেক্ষা অশান্তি এবং গৃহ অপেক্ষা মুক্ত প্রান্তর তাঁহার প্রিয় হইয়াছিল, ইহা কোন্ দুর্গ্রহের বা মহত্তর ভাগ্যের তাড়নায় ? তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে ইহার পরিণাম শোচনীয় হইয়াছিল ; কিন্তু এমনই করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিয়া, তিনি একটা বৃহত্তর জীবনের আশ্বাস তাঁহার কাব্যে ধ্বনিত করিয়াছিলেন, যেন সেই যুগের যজ্ঞাগ্নিকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া, এবং নিজে ভস্ম হইয়া, তাহার আলোকচ্ছটায় বাংলার বাণীমন্দির উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন ; নিজেকে এমনভাবে দগ্ধ না করিলে ঐ আলোক আমরা

পাইতাম না। ইহাই যেন বিধাতার বিধান; যাঁহারা মহাপ্রাণ ও মহাশক্তিমান্, তাঁহাদের জীবন এমনই করিয়া বহুর প্রয়োজনে উৎসর্গিত হইয়া থাকে; বাঙালীর মনোজীবনে, তাহার ভাষায় ও সাহিত্যে, যে নববেগসঞ্চারের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা আর কোনমতে, কোনো ক্ষুদ্রতর কবিশক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইত না। মধুসূদনের কবিজীবন ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার প্রতিভায় ইহারই স্বাক্ষর দেদীপ্যমান।

মহাকবি গেটে বলিয়াছেন—"The great works of art are brought into existence by men, as are the great works of Nature, in accordance with true and natural laws; all arbitrary phantasy falls to the ground; there is Necessity, there is God." মধুসূদন ছিলেন বাংলা সাহিত্যে এই "প্রয়োজন"—এই "বিধাতৃবিধান"। তাঁহার কাব্যপ্রতিভার স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে।

প্রথম যৌবন হইতেই মধুসূদনের কেবল একটি কামনা ছিল—খুব বড় কবি হইবার; একটি পিপাসাও ছিল বিদ্যার্জনের। তিনি বহু ভাষা শিখিয়াছিলেন, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিদের কাব্য মূলভাষায় পড়িয়াছিলেন; ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহার কালে এতবড় বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ইংরেজিকেই ছাত্রাবস্থা হইতে তিনি নিজের ভাষারূপে বরণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ভাষাতেই কাব্যরচনার অভ্যাস করিতেছিলেন। মাদ্রাজবাসকালে মাতৃভাষার সহিত কোন সম্পর্কই আর ছিল না। সেখানে তিনি বাংলাভাষা একরকম ভুলিতেই বসিয়াছিলেন। "I am losing my Bengali faster than I can mention"—কবির এই মর্মান্তিক স্বীকৃতির পিছনে রহিয়াছে মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন অনুরাগ। মাদ্রাজে থাকিতেই তিনি ইংরেজি ভাষায় পূর্বোক্ত দুইখানি কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন—'Captive Lady' ও Visions of the Past'. কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। পিতার মৃত্যুসংবাদে এবং বন্ধুদের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি দেশে ফিরিলেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত, ধনী ও কৃতবিদ্য সমাজে মেলামেশার অবকাশে তিনি দৈবক্রমে সেকালে সৌখীন নাটকাভিনয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন; এবং তাহাতেই প্রথম বাংলা-নাটক ও পরে বাংলা-কাব্যের উন্নতিসাধনে প্রাণমন সমর্পণ করিলেন। নাটকগুলির নাম—'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। প্রথম দুইখানি বিলাতি আদর্শের নাটক, শেষের দুইখানি প্রহসন। কিন্তু বাংলা-নাটকের নূতন আদর্শ-স্থাপন ছাড়া মধুসূদন নাটক-রচনায় তেমন সাফল্যলাভ করেন নাই—কেবল ঐ প্রহসন দুইখানি স্থায়ী গৌরবলাভ করিয়াছে।

ইহার পর সহসা তাঁহার কবিপ্রতিভার পূর্ণ-জাগরণ ও অসাধ্যসাধন। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে 'তিলোত্তমাসম্ভব' নামে একখানি কাব্যরচনা করিলেন, তাহাতে রোমাণ্টিক কল্পনার দুঃসাহসিকতা আছে। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও উচ্চাঙ্গের কাব্য-সংগীত ও কাব্য-কল্পনার আবেগে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করিলেন, এবং অবিলম্বেই বাংলার শিক্ষিত সমাজে মহাকবি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। ঐ কাব্য বাংলা-সাহিত্যে যুগান্তর আনিল। 'মেঘনাদবধ' রচনার প্রায় সমকালে তিনি 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা' নামে আরও দুইখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর

বাংলাসাহিত্য ত্যাগ করিয়া জীবনের অপর বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন; পরিশেষে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু উদ্দাম অমিতাচার এবং স্বভাবসুলভ অদূরদর্শিতা ও মহানুভবতার ফলে ঋণজালে জড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মধুসূদনের সমগ্র জীবনকাহিনী একটি বিয়োগান্ত নাটকের মত। যেন ঊর্দ্ধ্ব হইতে একটা বহ্নিমান গ্রহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল; সেই দাহ মহতী কামনার দাহ। দেহ তাহাকে ধারণ করিতে পারে নাই। জীবনে নিষ্ফল হইলেও— মধুসূদনের প্রাণ তাঁহার কাব্যের মধ্যে অমর হইয়া আছে। মধুসূদন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার ধ্রুবতারা বাণীর মন্দিরে চিরকাল ভাস্বর হইয়া থাকিবে।

এই প্রতিভার উন্মেষও যেমন, তেমনি তাহার বিকাশকাল চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। মাত্র চারি বৎসরের মধ্যেই এই কবির কাব্যরচনা আরম্ভ ও শেষ হইয়াছে। পরে ইউরোপবাসকালে তিনি কতকগুলি সনেট রচনা করেন—তাহাতে বিগত জীবনের একটা ভাবময় স্মৃতিমাত্র আছে। একমাত্র ফরাসী কবি র‍ঁ্যাবো (Rimbaud) ভিন্ন জগতের কোনো কবির জীবনই এমন অদ্ভুতভাবে আরম্ভ ও সমাপ্ত হয় নাই।

মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতার স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই সঙ্গে সেকালের বাংলা-সাহিত্যের অবস্থাও স্মরণ করিতে হইবে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হইলে সেকালের বাঙালী সমাজ যে বিস্ময় বোধ করিয়াছিল, তাহার কারণ, তখন কবিওয়ালা ও ঈশ্বর গুপ্তের যুগ, অথচ শিক্ষিত বাঙালীরা তখন শেক্‌সপীয়র ও মিলটন পড়িয়াছে। বাংলাভাষা ও বাংলা-কাব্যের সেই অবস্থায় বিলাতী আদর্শে বড়-কিছু রচনা করা যে অসম্ভব, ইহা বুঝিয়া তখন সকলেই কাব্যরচনা বা উৎকট সাহিত্যরচনার আশা ত্যাগ করিয়াছে—বাঙালী মাতৃভাষার চর্চাও আর করিতে ইচ্ছুক নয়। এতবড় সংকট এ জাতির জীবনে পূর্বে আর কখনও হয় নাই। এই সময়ে মধুসূদনের মত কবির আবির্ভাব যে একটা কত বড় সৌভাগ্যের মত—তাহা না বুঝিতে পারিলে মধুপ্রতিভার মূল্যনিরূপণ সম্ভব নয়। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিলেন—সেই বাংলাভাষাতেই মিলটনের ছন্দ এবং পাশ্চাত্ত্য মহাকবিদের কল্পনা ধরিয়া দিলেন। প্রতিভার এমন অসাধ্যসাধন সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তাই কেবল প্রতিভা-শক্তিতে মধুসূদন বাংলা-সাহিত্যে অদ্বিতীয়, তাঁহার কাব্যগুলির শ্রেষ্ঠতা যেমনই হউক। এ যেন সহসা কোথা হইতে এক দেবতা বা দৈত্য আসিয়া বাংলা-কাব্যের কুঁড়েঘরখানিকে বিরাট পাষাণপ্রাসাদে পরিণত করিল। বাংলা-কাব্যে ঐ যে সংগীত আরম্ভ হইল, উহারই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির শেষ সূক্ষ্মতম সুর রবীন্দ্রকাব্যেও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। মধুসূদনের কবিতা দৈববাণীর মত অমোঘ। তাই ইহার গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও ঝংকারে চিরাচরিত কবিতার মোহময় কল্লোল চিরদিনের মত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পয়ারের পদ্মমধু পান করিয়া বঙ্গভারতীর যে বিতৃষ্ণা হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের অমৃতধারায়। পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যেন সহসা চাপল্যের হিল্লোল উঠিল এই নূতন ছন্দের সোনার কাঠির স্পর্শে। ভাবে আসিল গাম্ভীর্য, ভাষায় সজীবতা আর কল্পনায় গগন-স্পর্শী অভীপ্সা।

তাই বলিতেছিলাম, মধুসূদনের প্রতিভাকে প্রয়োজন ও বিধাতৃবিধান হিসাবে দেখিতে হইবে; কারণ সাহিত্যে তাঁহারই ভিতর দিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে সমগ্র বাঙালী-জীবনের জন্য এক নব

সূচনা; এমন কি, নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিতও আছে তাঁহার বহু উক্তির মধ্যে। এ কালের বাংলা-সাহিত্যে এই যে নবগঠিত মানস-লোকের শ্রী ফুটিয়াছে, মধুসূদনের প্রতিভাই ইহার প্রথম স্রষ্টা। মধুসূদনের জীবন বহু বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হইলেও, তাঁহার কাব্যের মর্মকোষে যে চিত্তটি বিরাজ করিত, সেই চিত্তের সম্পদই ছিল তাঁহার প্রতিভার অবলম্বন। মধুসূদনের নব-আবিষ্কৃত ছন্দ-লোক—কত অভিনব সামগ্রী এই বিরাট হার্মনি, ইহা কি প্রয়োজন ও বিধাতৃবিধান ভিন্ন আদৌ সম্ভব?

ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের মানুষ মধুসূদন; এবং নিজবাসভূমে পরবাসী হওয়াই ছিল তদানীন্তন চিৎ-প্রকর্ষের পরাকাষ্ঠা। তাই মধুসূদন একটু বিলম্বেই বাংলাভাষায় অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং আরও বিলম্বে ইহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যখন অনুরাগী হইয়া উঠিলেন তখন তিনি সেবকের মত নিজেকে নিঃশেষে ভাষালক্ষ্মীর সেবায় উৎসর্গ করিলেন এবং তাঁহার বিরাট্ কবিপ্রতিভা স্বল্পকালমধ্যে কাব্যের ভাষার আমূল পরিবর্তনসাধন করিয়া এক নব যুগের সূচনা করিয়া দিল। মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভা কতক পরিমাণে গ্রন্থজীবী ছিল। তাই তিনি প্রাচীন কাব্য বা কবি-প্রসিদ্ধি হইতে উপমা-উৎপ্রেক্ষা গ্রহণ করিয়া, কাব্যের উৎকর্ষসাধন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। মনে হয়, তিনি বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃত কাব্যের ভাবগৌরব দিয়া পুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্গ-ভারতীর তিনি একাধারে সেবক ও ত্রাণকর্তা। কারণ মধুসূদন শুধু ম্রিয়মাণ বাংলা-কাব্যকে জাগাইয়া তুলিয়াই ঝিমাইয়া পড়েন নাই, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল হইতে প্রথম অব্যাহতি তিনিই দিয়াছিলেন। মধুসূদনের কাব্যে সেই যুগের যে বাণীমন্ত্রটি তাঁহার ছন্দকে এমন স্পন্দিত এবং কাহিনীকেও এমন প্রাণময় করিয়াছে, তাহা তাঁহার পৌরুষ। জাতির নবজীবনের উৎসমুখে যে শিলাখণ্ড চাপিয়া বসিয়াছিল, সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য কবিপ্রাণের অধৈর্য রাবণের উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। মধুসূদনের, কাব্যে আমরা তাই পুরুষের যৌবনদৃপ্ত রূপ দেখিতে পাই ও মহিমময় পৌরুষের বন্দনা শুনিতে পাই। তাঁহার কাব্যপ্রতিভার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য'। বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসেরও ইহা অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ। এই কাব্যই আধুনিক বাংলা-কাব্যের প্রবাহপথ মুক্ত করিয়া দেয়, উনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজীবনের যৌবনাবেগে এই কাব্যই পূর্ণশক্তি ও অনুপম শ্রী ধারণ করিয়া প্রথম প্রকাশ পায়। ভাষা, ভাব আর ছন্দ এই তিনের সন্নিপাতে মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভা গড়িয়া উঠিয়াছে। কাব্য অনাদি, কবি অমর; মধু-কাব্যের অনাদিত্ব, এবং তাঁহার কাব্যপ্রতিভার অমরত্ব সাহিত্যের ইতিহাসে দুই-ই আজ নিঃসংশয়ে স্বীকৃত।

বড় কাব্যের কাব্যগৌরব যেমনই হউক, জাতির সাহিত্যে সেই কাব্যের একটা পৃথক স্থানও আছে—কারণ, তাহাতেই জাতির জীবনের এক-একটা যুগসন্ধি নূতন ছন্দে তাহার তরঙ্গরেখা আঁকিয়া যায়; সে কাব্য যেমন একটি বড় আর্ট, তেমনই তাহাতে একটি বৃহৎ জীবনের অপূর্ব বেদনা ও অসীম আনন্দ উৎসারিত হইয়া থাকে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' তেমনই কাব্য—মধুসূদন সেই কাব্যের কবি। এই দুর্লভ প্রতিভা তাঁহার চির অশান্ত অন্তরকে প্রশান্তি দিতে না পারিলেও, দেশকে শাশ্বত সম্পদ্ দিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভার সম্যক পরিমাপ কিছুতেই সম্ভব নহে। কারণ এত বড়ো একটা প্রতিভা কখনই মাত্র চারিবৎসরের সংক্ষিপ্ত চতুঃসীমার মধ্যে নিঃশেষে বিকশিত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য মেঘনাদবধ রচনাকালেও আত্মপ্রতিভাসচেতন মধুসূদন বন্ধুবর রাজনারায়ণ বসুকে জানান যে তিনি প্রকৃত বীররসের কাব্য লিখিবার জন্য হাত পাকাইতেছেন:— "Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca first" কিন্তু রূঢ় বাস্তবের প্রচণ্ড প্রতিকূলতায় হাত পাকিবার পূর্বেই কবির কাব্যজীবন একরূপ শেষ হইয়া আসিল, 'বাঙলা সাহিত্যে বীররসের কাব্যও তাই আজিও অলিখিত রহিয়া গিয়াছে।' মধুসূদনকে তাই সূর্য-চন্দ্রাদি কোনো অত্যুজ্জ্বল স্থির জ্যোতিষ্কের পরিবর্তে উল্কার সহিত উপমিত করিয়া অধ্যাপক সুকুমার সেন যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণীয়: "উল্কার জীবনে উদয়-অস্ত; তাহার দীপ্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। * * * যেটুকু সময় দৃষ্টিগোচর থাকে তাহাতে তাহার প্রখর উজ্জ্বলতা নয়ন ধাঁধিয়া দেয়, আমরা ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারি না। নির্বাপিত হইয়া গেলে তবেই যেন তাহার যথার্থ পরিচয় ধরা পড়ে। মধুসূদনের আবির্ভাব উল্কার সমশ্রেণীর। সমসাময়িক সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে অল্প লোকেই তাঁহার কাব্যের মর্মগ্রহণ ও মূল্যাবধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। * * * মধুসূদনের অপেক্ষা বড়ো কবি বাঙলায় আবির্ভূত হইয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু মধুসূদনের মত প্রচণ্ড potential প্রতিভা আমাদের দেশের কেন, যে কোন দেশের ইতিহাসে সুদুর্লভ। মধুসূদন যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহার সম্ভাবনা যেমন বিরাট ছিল পরিণতি তেমন ফলবান হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই প্রতিভার তুলনায় তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি পর্যাপ্ত ও সুষম হয় নাই। যে মহাকাব্য লিখিবার জন্য তিনি pucca-first-এর অপেক্ষায় ছিলেন, তাহা আভাসেই রহিয়া গিয়াছে। **"মধুসুদন সেই অলিখিত মহাকাব্যের মহাকবি।**

৪। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন

মহাকবি মধুসূদনের নামের সহিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম-ইতিহাস বিজড়িত। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সম্বন্ধ হইতে মধুসূদন যে সকল সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে আসেন তাঁহাদের মধ্যে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন অন্যতম। মধুসূদন কবি এবং মহারাজা কাব্যানুরাগী। কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে অনেক আলোচনা হইত। মধুসূদন তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'রচনা করিবার সময়ে বুঝিয়াছিলেন যে, মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ব্যতীত বাংলা-নাটকের উন্নতির আশা নাই। তাই একদিন কথাপ্রসঙ্গে কবি মধুসূদন মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন, "যতদিন বাংলাভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন না হইবে ততদিন বাংলা-নাটক-সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতির আশা নাই।" উত্তরে মহারাজা বলিলেন, "বাংলাভাষার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প।" মধুসূদন উত্তর দিলেন, "আমি তাহা মনে করি না। চেষ্টা করিলে আমাদিগের ভাষাতেও অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হইতে পারে।" মহারাজা বলিলেন, "বাংলাভাষার গঠন

বিবেচনায় ইহাতে অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর নহে। ফরাসী ভাষা আমাদিগের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত, কিন্তু আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে ইহাতেও অমিত্রছন্দে রচিত কোন কাব্য নাই।" মধুসূদন বলিলেন, "বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার দুহিতা; এরূপ জননীর সন্তানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।"

এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর হইতে শেষে আত্মশক্তিতে আস্থাবান বাংলার ভাবী মহাকবি মধুসূদন মহারাজার সম্মুখে অকস্মাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে, তিনি অমিত্রচ্ছন্দে কাব্যরচনা করিবেন। ইহার পূর্বে তিনি তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখিয়াছেন—"We want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse." অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাংলাকাব্যের ছন্দোমুক্তির কথা কবি এই সময় বিশেষভাবেই চিন্তা করিতেছিলেন। মহারাজার সহিত উল্লিখিত কথোপকথনের পর হইতেই মধুসূদন মনোযোগের সহিত বাংলা-কবিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যে আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া, তিনি যে দুই বাঙালী কবির গ্রন্থ পাঠ করিতেন, অনেক দিন পর আবার তিনি সেই প্রিয়কবি কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের কাব্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বদেশীয় প্রাচীন কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া তিনি বাংলাভাষার প্রবণতা ও সম্ভাবনা বুঝিয়া লইলেন। পাশ্চাত্য মহাকবিগণের কাব্য হইতে তিনি অমিত্রচ্ছন্দের গঠনপ্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সংগীতে মধুসূদনের স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল; তাই তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় সহজেই শব্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ-মাত্রা-নিরূপণে ও বর্ণসংস্থানজনিত মাধুর্য অনুভবে সক্ষম হইল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করেন। এই নূতন ছন্দে বিরচিত কাব্য শুনিয়া যতীন্দ্রমোহন, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ একবাক্যে মধুসূদনের প্রতিভাকে স্বীকার করিয়া লইলেন। কবিবর তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের জগতে এক অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিলেন। রাজনারায়ণ বসু কবির প্রথম কাব্যকে সম্বর্ধনা জানাইয়া লিখিলেন—"Your reward is very great indeed—immortality." সত্যই, কবি এই অসাধ্যসাধন করিয়া মহাকালের দরবারে অমরত্ব-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

এইভাবে প্রতিভাশালী কবির নেতৃত্বে বাংলা পদ্যসাহিত্য স্বপ্নাতীত এক অভাবনীয় পথে পরিচালিত হইল, বাংলা-সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। সেই হইতে বাংলাভাষার কবিতাস্রোত এক অভিনব পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ কেবল যে ছন্দের অভিনবত্ব ও বিশেষত্ব আছে তাহা নহে, ইহার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কল্পনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। কাব্য হিসাবে অপরিপক্ক হইলেও, ইহাতে কবির প্রতিভার যে আকস্মিক উন্মেষ বা অসাধারণ শক্তির সূচনা লক্ষ্য করা যায়, তাহাই মধুসূদনের পরবর্তী কাব্য 'মেঘনাদবধ'-এ পরিণতি লাভ করিয়াছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ বর্ণনাচ্ছটা ও কল্পনাবিলাসে ভারতের অমরকবি কালিদাস এবং ইংলণ্ডের কবি মিলটনের প্রভাব সুস্পষ্ট। তথাপি কল্পনা ও রচনা- ভঙ্গির অভিনবত্বের জন্য এই কাব্যে নবযুগের সূচনা হইয়াছে; আবার মধুসূদনের কবিজীবনের ইতিহাসেও—বিশেষ করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইতিহাসে—ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ শুধু যে ভাষা ও ছন্দের একটা আমূল পরিবর্তনই আনিয়া দিল তাহা নহে, সেই সঙ্গে ইহা বাংলা-সাহিত্যে গুপ্ত-যুগের অবসানও সূচনা করিয়া দিল। কাব্য-সাহিত্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে মধুসূদন একটি নূতন অলংকার সংযোজন করিয়া বাল্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিলেন। ইহার পরই মধুসূদনের অপূর্ব সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য' বঙ্গ সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করিল। এই কাব্যে কবির প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দও সম্পূর্ণতা ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। ছন্দোমুক্তির দুশ্চর তপস্যায় মধুসূদন কিরূপ দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সহিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র উৎসর্গ পত্র "মঙ্গলাচরণে" নবছন্দ ব্যবহারের কৈফিয়ৎরূপে লিখিত কয়েকটি ছত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় ;—"আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন এদেশের সর্বসাধারণ জনগণ, ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে, মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন।" বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের বর্তমানের রূপৈশ্বর্য কবির এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

মধুসূদন যখন বাংলা-কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিলেন তখন সকলেই যে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা নহে। সাহিত্যের ইতিহাসে যখনই কোন নূতন সৃষ্টি দেখা দিয়াছে তাহা যে সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক ও সমালোচকের স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করিয়াছে—এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বাংলা-সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন করিয়া মধুসূদন বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোককে তাঁহার সাহিত্য-শত্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন ; উপহাস, ব্যঙ্গ এবং কটূক্তি তাঁহার উপর অজস্রধারে যেমন বর্ষিত হইয়াছিল তেমনি গুণগ্রাহী সমালোচকদের নিকট হইতে আশ্বাসবাক্য ও সমাদরও তিনি পাইয়াছিলেন। সাহিত্যসংসারে এক অপরিচিতনামা মধুসূদন অপ্রচলিত ছন্দে, একখানি কাব্য রচনা করিলেন। দেশের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু স্বল্পকয়জন যাঁহারা এই ছন্দের ভাবী গৌরবসম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-সম্পাদক মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিলেন : "আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি, এই নূতন ছন্দ বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে।" দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ'-এ লিখিলেন : "এখন দিন দিন লোকের মন যেমন উন্নত হইতেছে তেমনি উন্নত পদ্যসৃষ্টিও আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেষ্টা যথোচিত সময়েই হইয়াছে—সন্দেহ নাই।"

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। চিরস্মরণীয় এইজন্য যে, ইহার ভিতর দিয়া একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল। মধুসূদনের প্রতিভার অন্যতম উপাদান ছিল বৈপ্লবিক মনীষা, তাই দুঃসাধ্যসাধন তিনি করিতে পারিয়াছিলেন। একটি জাতির ইতিহাসে যখনই একটি নূতন যুগের অভ্যুদয় ঘটিয়া থাকে, তখনই শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতিতে যুগ-পরিবর্তক প্রতিভারও আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম। মধুসূদন বাংলাভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন না করিলে যুগের প্রয়োজন অসম্পূর্ণ থাকিত না, অন্য কেহ তাহা নিশ্চয়ই করিতেন ; কারণ প্রকৃতির কার্য কখনও অসম্পূর্ণ থাকে না। তাই যুগের প্রয়োজনে, প্রকৃতির নেপথ্য-বিধানেই যুগ-পরিবর্তক মধুসূদনের আবির্ভাব এবং সেই আবির্ভাবের সার্থকতা নূতন ছন্দের প্রবর্তনে। রামমোহন রায় একদা ধর্ম ও সমাজসম্বন্ধে যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, বাংলা-কবিতা-সম্বন্ধে

মধুসূদনও সেইরূপ করিয়াছিলেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উপহাস অজস্রধারে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য, অমিত্রছন্দের বিকৃতি করিয়া, কত জনে কত হাস্যোদ্দীপক কবিতা সেই সময় প্রচার করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকারের মত শিক্ষিত লোকও প্রথমে ভাষার এই বিপ্লবকে স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তথাপি নূতন যাহা আসিবার তাহা আসিলই—মধুসূদনের প্রতিভা ইহার বাহন হইল মাত্র।

বিপ্লবীর সকল গুণই মধুসূদনের মধ্যে ছিল। যেরূপ নিন্দা, বিদ্রূপ এবং শ্লেষোক্তি সহ্য করিয়া কবি তাঁহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই বীরোচিত। ফরাসী কবি ভিক্তর হিউগো এবং ইংলণ্ডের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় দুই-চারিজন পাশ্চাত্ত্য মহাকবির জীবনেই কেবল সেইরূপ দৃঢ়তা লক্ষিত হয়। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা চিন্তা করিয়াই, মধুসূদন পয়ারের নিগড় ভাঙিয়া চিরাভ্যস্ত দৃঢ়তার সহিত বিরুদ্ধবাদীদিগের প্রতিকূল সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া, অগ্রসর হইয়াছিলেন। কবি ভবভূতি, তাঁহার সমকালবর্তী পণ্ডিতমণ্ডলীর উপেক্ষায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক সগর্বে লিখিয়াছিলেন ঃ

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তিতে কিমপি তান্ প্রতি নৈব যত্নঃ
উৎপস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা,
কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।"

মধুসূদনও ভবভূতির এই গর্বিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। ভবভূতির ন্যায় তাঁহারও ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা কাব্যলক্ষ্মীর বর্তমান রূপৈশ্বর্যই প্রমাণ করিতেছে। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ সকলেই একবাক্যে মধুসূদনের এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্তনের প্রচেষ্টার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবনা মধুসূদনকে যেমন অক্ষয় যশের অধিকারী করিয়াছে, তেমনি ইহা বাংলা ছন্দের নবজন্মের যবনিকা-উত্তোলনে সাহায্য করিয়াছে।

মধুসূদন শক্তিধর পুরুষ, বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রধান। তাঁহার প্রাধান্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে তাঁহার উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা উপলব্ধি করিতে হইবে। মিল-বর্জনটাই এই নূতন ছন্দের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। এযুগের অন্যতম কবি ও মাইকেলের এক অসহিষ্ণু সমালোচক বুদ্ধদেব বসুও এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ "মাইকেলের যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা-ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো যাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিলো 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'-র একঘেয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ-যতির ঊর্মিলতা।···যতিপাতের এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে ছন্দে প্রবহমানতা এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলো এ-কথাটা তৎকালীন অনুসন্ধানীর দৃষ্টিগোচর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কোনো কারণে যদি না-ও হয়, শুধু বাংলা-ছন্দে প্রবহমানতার জনক ব'লেই মাইকেল উত্তরপুরুষের প্রাতঃস্মরণীয়।"

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায়, সনেটও মধুসূদন সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবর্তন করেন ; 'চতুর্দশপদী' নামও তাঁহারই দেওয়া। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে কবি

লেখেন, I want to introduce the sonnet into our language,' এবং তাঁহার সুবিখ্যাত 'মাতৃভাষা'-শীর্ষক কবিতাটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম চতুর্দশপদী কবিতা।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়া মধুসূদন যে নূতন ছন্দের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন তাহা বাংলা ভাষার প্রাণের ছন্দের সহিত আজ মিলিয়া গিয়াছে। তাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে আন্দোলন আছে, স্বাচ্ছন্দ্য আছে, প্রবল বেগ আছে, গতির অনিবার্যতাও আছে—এই ছন্দ আবর্ত নহে, তরঙ্গ-সমাকুল নদী, যেখানে নৌকা ভাসাইলে অলক্ষ্যে অসীমের দিকে তাহা টানিয়া লইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মধুসূদন পুরোমাত্রায় সচেতন শিল্পী। শুধু যে বাংলাছন্দে যুক্তবর্ণের পরম রহস্যের তিনি আবিষ্কর্তা তাহা নহে; বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনের ফলদ প্রয়োগসম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন বলিয়া ছন্দের পরিপূর্ণতা সাধনে পরবর্তী কাব্যে তিনি কঠিনতর ধ্বনিসন্ধানের পরিচয় দিয়াছিলেন। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্তর্নিহিত ধ্বনিসৌষ্ঠবও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অমিত্রাক্ষরের এই পূজারী তাই একই যন্ত্র হইতে তূরীনির্ঘোষ আর সেতারের মীড় বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মাইকেলের ছন্দ যেন দূরশ্রুত সমুদ্রকল্লোল—আওয়াজও আছে, রেশও আছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ডঙ্কা-নাদে তাই আগামীর আগমনী বাজিল; ভাষা-পাষাণীর ঘুম ভাঙ্গিল। গদ্যের সহিত কাব্যের স্বর্ণলঙ্কার সেতুবন্ধনই ছিল মধুসূদনের সচেতন প্রয়াস। মধুসূদনের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর সেই সেতু। এইখানেই তাঁহার ঐতিহাসিক প্রাধান্য। আমাদের সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটাইয়া, পুরাণের কাহিনীকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়া তিনি যে সার্থক ছন্দে সার্থক কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন, ঐশ্বর্যের ব্যঞ্জনায় কালের সঞ্চয়ে তাহা চিরন্তন হইয়া থাকিবে। মধুসূদন যদি এই ছন্দের, এই ভাষার সৃষ্টি না করিয়া যাইতেন তাহা হইলে সংস্কার-পাষাণের শাপমুক্তি ঘটিতে আরও বিলম্ব হইত। কাব্যলক্ষ্মী তাই আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের আদিকবি মধুসূদনের কণ্ঠে স্বহস্তে বিজয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছেন। "সাহিত্যের পতাকায় শ্রীমধুসূদন নাম" তাই অমিত্রাক্ষরের ঋষি বলিয়া চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকিবে।

মোট কথা, এই অমিত্রচ্ছন্দ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাইকেল আজও অদ্বিতীয়। এই ছন্দের প্রথম বৈশিষ্ট্য—এখানে ভাব ও বাক্য যতির বশে নহে; বরং ইহার বিপরীত, অর্থাৎ যতিই ভাব ও বাক্যের বশে। এই স্বাধীন ছন্দে প্রতিপদেই যতির বৈচিত্র্য এবং ভাবের প্রকাশে স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সঙ্গীতের স্বাদ-বিশিষ্ট অমিত্রাক্ষর কবিতার দ্বিতীয় বিশেষত্ব—বিভিন্ন রসোপযোগী অফুরন্ত শব্দ-সম্পদ। রসোপযোগী বাক্য-প্রযোগই মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের মনোহারিত্ব। তিনি যে শুধু সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে রসোপযোগী শব্দ চয়ন করিয়া কাব্য-রসের পুষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে; ইংরেজির অনুকরণেও তিনি অনেক পদ গঠন করিয়া কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। "সংস্কৃতছন্দে যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।"—রবীন্দ্রনাথ

নূতন নূতন ক্রিয়াপদ-গঠন মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। ইংরেজিতে বিস্তর বিশেষ্য-বিশেষণ পদ হইতে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন দেখা যায়। ইহাতে শব্দ-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। মধুসূদনও কবিতার উপযোগী ঐরূপ বিস্তর ক্রিয়াপদ প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। মাইকেলের পূর্বে

এইরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাংলা কাব্যে ছিল বটে, কিন্তু মধুসূদনের ক্রিয়াপদ-সৃষ্টি আরও সুন্দর ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ। বাক্য-বিন্যাস এই ছন্দের চতুর্থ বিশেষত্ব। বাক্য-বিন্যাসের স্বাভাবিকতা-গুণে মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে সকল রসই সুখাস্বাদ্য। সংযতভাবে অনুপ্রাস ব্যবহার অমিত্রচ্ছন্দের—পঞ্চম বিশেষত্ব। তাঁহার অনুপ্রাস হইতে হীরকের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। এইসব গুণেই মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ রসে, বাক্যে ও ভাবে সুস্বাদু, সুশ্রাব্য এবং সজীব।

৫। মেঘনাদবধ কাব্যের পটভূমিকা

'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা দ্বিতীয় কাব্য। ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি। এই অমর মহাকাব্য প্রকাশের সঙ্গে আমরা মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশকালে উপস্থিত হই। ১৮৬১ সালে মধুসূদন ইহা দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম খণ্ড (১—৫ সর্গ) ১৮৬১ সালের জানুয়ারী মাসে, এবং দ্বিতীয় খণ্ড (৬—৯ সর্গ) ঐ বৎসরের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'-র মূল আখ্যায়িকা রামায়ণ হইতে গৃহীত। রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণের পুত্র মেঘনাদের নিধন ইহার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু প্রাচ্যের এই বিষয়বস্তু বর্ণনায় বহু গ্রন্থপাঠী মধুসূদন পাশ্চাত্ত্যের বহু কাব্য হইতে নানা উপকরণ আহরণ করিয়া বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেন। 'ইলিয়াড', 'ডিভাইনা কমেডিয়া', 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড', 'প্যারাডাইস্ লষ্ট', বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কাশীরামদাসের 'মহাভারত', কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থের ভাবকল্পনা ও বিষয়বস্তুর সাহায্য অবলম্বনে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সৌন্দর্য সাধিত হইয়াছে। প্রাচ্য কাব্য, নাটক প্রভৃতিতে নান্দী, স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের পর যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়, সেই রীতি পরিত্যাগ করিয়া কবি এই কাব্যে প্রথমেই বীণাপাণির বন্দনা-গীতি গাহিয়াছেন। ইহাতে কবির উপর গ্রীক-কবি হোমর, ইতালীয় কবি ভার্জিল ও ইংরেজ-কবি মিলটনের প্রভাব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয়। এইভাবে কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ নববেশে সুসজ্জিত করিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ পরিবেশন করিয়াছেন। এই অনুকরণে কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয় নাই, অথবা কবির মৌলিকতার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। পরন্তু তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও সৃজনীশক্তির যাদুস্পর্শে বৈদেশিক উপকরণসমূহ এবং আদর্শ নবালঙ্কারে ভূষিত হইয়া কবির কাব্যে এমনভাবে সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা আমরা বঙ্গ সাহিত্যে কবির বিশিষ্ট দান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, এই সূত্রে বঙ্গ সাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে আধুনিক যুগের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে।

এইখানে একটি কথা বলা দরকার। মধুসূদন ইউরোপীয় কাব্যকলা বরণ করিয়াছিলেন প্রাণের দোসররূপে। কথিত আছে, তাঁহার স্ত্রীর কণ্ঠে ফরাসী গান শুনিয়া তিনি অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন। তবু তাঁহার রাবণ-মেঘনাদ-বিভীষণ, অথবা রাম-লক্ষ্মণ-সীতা হোমরের প্রায়াম-হেক্টর অথবা আগামেম্নন্-নেস্টর-হেলেন-ইউলিসিসের অনুকৃতি হইয়া উঠে নাই, এমন কি ইহারা ইউরোপীয়ও নহে —সমস্ত নূতনত্ব সত্ত্বেও ইহারা খাঁটি ভারতীয় জিনিস।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ অনেক নূতনত্ব বিদ্যমান। রামচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি এবং রাক্ষসদিগের প্রতি বিরাগ উদ্রেক করাই রামায়ণের কবির উদ্দেশ্য। কিন্তু 'মেঘনাদবধ'-এর কবি এই চিরপুরাতন আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কবির বর্ণনাগুণে আমরাও রাক্ষস-পরিবারের জন্য অশ্রু-মোচন না করিয়া পারি না। রাক্ষস-পরিবারের স্বজাতিপ্রেমে আমরা মুগ্ধ হই—তাহাদের বিপর্যয়ে আমাদের দুঃখ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। মধুসূদন রাক্ষসকে রাক্ষস করিয়া আঁকেন নাই, মানুষের মত দেখিয়াছেন এবং সেইমত আঁকিয়াছেন। বীরত্বে, গৌরবে, ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে সাধারণ মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা মানুষ; তাঁহারা যজ্ঞ ও দেবপূজা করেন; রাক্ষসের কুলবধূ স্বামিপুত্রের কল্যাণের জন্য শিবারাধনা করেন এবং সতী পতির সঙ্গে সহমৃতা হন।

মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহার রামচন্দ্র ও সীতাদেবী নারায়ণের ও লক্ষ্মীর অবতার নহেন; তাঁহারাও মানব-মানবী এবং পৃথিবীর অপর নর-নারীগণের সুখদুঃখভাগী। মধুসূদন রামায়ণের প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া রাবণ ও রাক্ষস-পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই করিতে গিয়া তিনি রামায়ণে অনুল্লিখিত, এমন কি রামায়ণ-বিরোধী অনেক কথা বলিয়াছেন, অনেক ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির চরিত্রকে ভীরু, কাপুরুষ ও শান্তরূপে চিত্রিত করিয়া রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, সরমা প্রভৃতির চরিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। কবির নিজের স্বদেশপ্রীতি খুব প্রবল ছিল, তাই তাঁহার কাব্যে রাক্ষসগণ উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হইয়াছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে, একজন বিদেশী সসৈন্যে আসিয়া অপরের দেশ আক্রমণ করিয়াছেন। সেই আক্রান্ত দেশ—অর্থাৎ লঙ্কার স্বাধীনতা বিপন্ন। সেই আক্রান্ত রাজা স্বদেশ ও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে হারাইয়াও অদম্যতেজে প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। মধুসূদন রাবণচরিত্রে লক্ষ্য করিয়াছেন একটি অদম্য শক্তির অপ্রতিহত গতিবেগ। তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এইজন্য রাবণ কবির সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। দেশরক্ষায় অসাধারণ বীরত্ব কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। এইজন্যই বীর মেঘনাদের চরিত্র কবি অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যে রাক্ষস-নারীচরিত্রগুলিও কবি আঁকিয়াছেন অভিনব উৎসাহের আবেগে। প্রমীলা বীরাঙ্গনা। তাই উহাকে তিনি তেজস্বিনী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রমীলায় বীরাঙ্গনার তেজ ও কুলবধূর কোমলতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে। সরমা রাক্ষসবধূ, বিভীষণের পত্নী। রাজপুরীতে সহায়হীনা সীতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি, রাবণের পাপাচরণের প্রতি ঘৃণা তাঁহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে। অপরপক্ষে, রামের চরিত্রকে নিতান্ত হীন না করিলেও, কবি তাঁহাকে অত্যন্ত শান্ত, বিপদে কাতর ও দুর্বলচিত্তরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। রামের দুর্বলতা এবং লক্ষ্মণের ভীরু কাপুরুষের মত মেঘনাদকে বধ করা কবির ভাল লাগে নাই ("I despiss Ram and his rabble"—কবির এই উক্তি স্মরণীয়)। কিন্তু রাবণ ও মেঘনাদ স্বদেশ-রক্ষার জন্য যেরূপ আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন ও অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া পরাধীন দেশের অধিবাসী মধুসূদন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই।

এই রাক্ষস-পক্ষপাতিত্বহেতু তিনি রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতি লঙ্কার রাক্ষসগণকে লোমশ ও নরখাদক বীভৎস জীব করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। উহারাও তাঁহার কাব্যে মানুষ। ইহাদের অন্তর হইতে মানুষের মতই স্নেহ-ভালবাসা, স্বজাতি-প্রীতি প্রভৃতি উৎসারিত হইয়া উহাদিগকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। 'মেঘনাদ-বধ কাব্য'-এর রাবণ মহিমান্বিত সম্রাট, স্নেহশীল পিতা, নিষ্ঠাবান ভক্ত এবং স্বদেশবৎসল বীর। মেঘনাদও ধর্মভীরু পবিত্রাত্মা স্বদেশপ্রেমিক। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়ঃ "মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এই পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে এইটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগদৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে তিনি আনন্দবোধ করিয়াছেন…যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।" তাই কালের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া মেঘনাদবধের শঙ্খধ্বনি আজও আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয়, হৃদয়ে সাড়া জাগায়।

মেঘনাদবধ কাব্য করুণরস-প্রধান। যদিও কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমেই বলিয়াছেন, 'গাইব মা, বীররসে ভাসি' মহাগীত', তথাপি কাব্যের আদ্যোপান্ত করুণরসই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; স্থানে স্থানে বীররস উৎসারিত হইয়াছে মাত্র। সমগ্র কাব্যের মধ্যে এক অতি সকরুণ সুর ধ্বনিত হইয়া কাব্যখানিকে অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। আদিম যুগের প্রভাতে যেমন করিয়া ক্রৌঞ্চবধূর কাতর ক্রন্দন বাল্মীকির হৃদয় বীণায় করুণ ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, ঠিক তেমনিভাবে ভারতের মহাকবির পদাঙ্ক-অনুসরণকারী কবি মধুসূদনের হৃদয়তন্ত্রীও ভগ্নহৃদয় দশানন এবং পুত্রশোকাতুরা মন্দোদরীর বিলাপে করুণসুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—রক্ষোনরের সংগ্রামের বিশ্ববধিরকারী রুদ্রনাদও সে করুণ রাগিণীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণকালে রাবণের উচ্ছ্বাস, সীতা ও সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণরস প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে রাবণের করুণ বিলাপে এবং পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার সহমরণ ও রাবণের মর্মভেদী আর্তনাদের সহিত। এক কথায় বলিতে গেলে, পরাজয়ের কারুণ্যই সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বিষয়বস্তু এবং কাব্যে বর্ণিত ঘটনা-পরম্পরার কেন্দ্রস্বরূপ।

মেঘনাদবধ কাব্য-এ মধুসূদনের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ পরিণতি—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য—দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। সকলে অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—নির্ঝরিণীর কুলুকুলু নিঃস্বনে অভ্যস্ত বঙ্গভাষায় জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জন আসে কোথা হইতে! বীণাধ্বনি শ্রবণে অভ্যস্ত তন্দ্রালস বাঙালীর কানে গম্ভীর ভেরীনিনাদ প্রবেশ করে কেমন করিয়া! সত্যই 'মেঘনাদবধ-কাব্য'-এ

এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাহনে করুণ স্বর এবং বীরোচিত ভাব উভয়ই অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিবর হেমচন্দ্র তাই বলিয়াছেন: "সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস-সংকলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাংলা পুস্তকেই নাই।…নিবিষ্টচিত্তে যিনি মেঘনাদ বধের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাংলাভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন কবি!…সত্য বটে কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানাদেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্নসহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন।"

সত্যই দেশী ও বিদেশী নানা কবির নানা কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত, সমুন্নত ও সমৃদ্ধ মধুসূদনের যে কল্পলোক, তাহার সাহায্যে তিনি যে অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাংলাভাষা থাকিবে ততদিন গৌড়ীয় জনগণ, তাহাতে 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত 'মেঘনাদবধ'-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "The reader who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe, with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce that bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived like Vyas, Valmiki or Kalidas; Homer, Dante or Shakespeare." মেঘনাদবধ কাব্যের পদে-পদে ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের যে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গভারতীর মন্দির শুধু আলোকিত হইয়া উঠে নাই, সাহিত্যের পৃথিবীতে আবিষ্কৃত এক নূতন ভূখণ্ড পর্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। যে মহিমা ট্র্যাজেডির পুণ্যফল, ট্র্যাজেডির তাপস মধুসূদন সেই মহিমায় রাবণকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তেমনি কাব্যলক্ষ্মীকে বাংলা সাহিত্যের মন্দিরে চিরকালের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

৬। কাব্যবিচারে মেঘনাদবধ কাব্য

(ক) ভূমিকা—ইহার অভারতীয় আদর্শ

কবিপ্রতিভা বলিতে বিশেষ এক শ্রেণীর শিল্পপ্রতিভাই সাধারণতঃ বুঝায়। কবি এক আশ্চর্য ক্ষমতায় কতকগুলি মানসমূর্তি ফুটাইয়া তুলেন; তাঁহার স্বীয় জীবনের সমস্ত দুঃখ-চাঞ্চল্য-বিক্ষোভকে সাধারণতঃ অন্তরালে রাখিয়া তিনি এমন এক অনবদ্য সৃষ্টি মানুষের সম্মুখে দাঁড় করান যাহার রহস্যময় সৌন্দর্য চিরদিন মানুষের সম্মুখে যেন অপূর্বই থাকিয়া যায়। বলা যাইতে পারে, ইহা এক ধরণের সেবা, সেবক আত্মগোপন করিয়া তাঁহার রূপ-রসের সেবা মানুষের দরবারে হাজির করিয়া দেন।

ইহার দৃষ্টান্ত ব্যাসের 'মহাভারত', বাল্মীকির 'রামায়ণ', হোমারের 'ইলিয়াড', কালিদাসের 'শকুন্তলা', শেক্স্পীয়রের 'ম্যাকবেথ', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইত্যাদি। যাঁহারা এ-সমস্তের স্রষ্টা তাঁহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া এই সমস্ত সৌন্দর্যের কক্ষে কক্ষে শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিচরণ করিতে পারা যায়। বড় স্থষ্টির ভিতরে যে পূর্ণতপস্থার এবং সেবায় আত্মসমর্পণের ভাব রহিয়াছে, সমগ্রতার দিক্ দিয়া দেখিলে মাইকেল-কাব্যে তাহা পাওয়া যাইবে।

বাংলাকাব্যে প্রথম ভাববিপ্লব শুরু হইল মধুস্থদনকে দিয়া। তিনিই সর্বপ্রথম কাব্যে কবিমানসের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। তখন কেহ কবিমানসের আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠা ও প্রয়াস বুঝিতে পারে নাই; তাই তাঁহার কাব্যের একটা দিকই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এবং তাঁহার দোষগুণও সেই প্রাচীন আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করা হইয়াছিল। কিন্তু মধুস্থদন তাঁহার ব্যক্তিমানসের বিদ্রোহকে কাব্যের বাহিরে, এমন কি, নিজের অন্তর্জীবনের গভীরতর চেতনায় সজ্ঞানে স্বীকার করেন নাই; তিনি কেবল কাব্যকল্পনা, কাব্যরীতি ও চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতিতে—কাব্যের রূপ ও রসের পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন; তাই সেখানে আমরা কবিসত্তার ব্যক্তিকে তেমন গূঢ় ও গভীর হইতে দেখি না—কেবল কবিকল্পনার স্বাধীনতাই লক্ষ্য করি। কিন্তু তাহারই মধ্যে যে স্থষ্টিভঙ্গিমা, তাহাই বাংলাকাব্যে প্রথম ভাববিপ্লব শুরু করিয়া দিয়াছিল।

যেভাবেই হোক মধুস্থদনের মধ্যে এক বিপ্লবীর আবির্ভাব অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক; আর ঠিক এই কারণেই অনেক সমালোচক অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, মধুস্থদন সনাতন ভারতবর্ষীয় আদর্শের বিরোধিতা করিয়া এই মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কথাটি হয়ত আংশিকভাবে সত্য। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বনাথের আইনকানুন মানিয়া চলিবেন না। না মানিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আসলে তিনি মহাকাব্যের গঠনসম্পর্কে বিশ্বনাথের মৌলিক নির্দেশগুলি অমান্য করেন নাই। তাঁহার মহাকাব্যের অবলম্বন বীররস অথবা করুণরস। তাঁহার নায়ক দেবতা নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, দেবতা ও মানুষের শত্রু রাক্ষস; কিন্তু তিনি সদ্বংশজাত ও ধীরোদাত্ত চরিত্রবিশিষ্ট। আর তিনি যে ভারতীয় আদর্শের ঠিক বিরোধী ছিলেন এমন কথা বলা যায় না, কারণ সেরূপ হইলে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী তাঁহার হৃদয়কে অমন করিয়া স্পর্শ করিতে পারিত না।

আসল কথা, একদিকে ধর্মান্তর গ্রহণ, অপরদিকে এই হিন্দুরই চিরপূজিত ধর্মগ্রন্থ হইতে উপাদান লইয়া অভিনব, কিঞ্চিৎ পাশ্চাত্য-ঘেঁষা ভঙ্গিতে কাব্যস্থষ্টি, এই দুইয়ের একজাতীয় সম্মিলিত প্রতিঘাতে সাধারণ পাঠকের মনে মধুস্থদন সম্বন্ধে ঐরূপ অভারতীয়তার কথা জাগিয়া উঠে। যিনি হিন্দুধর্মকে বর্জন করিলেন তিনিই আবার হিন্দুর ধর্মগ্রন্থকে ভালবাসিবেন, এই বিরোধের সমাধান ধর্মান্ধ সমাজের মানুষের পক্ষে হয়ত একটু কঠিন; কিন্তু এখানে যে হিন্দু বা খ্রীষ্টান নহে কবি-মধুস্থদনকেই খুঁজিতে হইবে—যিনি কাব্যস্থষ্টির উপাদান খুঁজিয়া পাইবামাত্র স্থষ্টি-পাগল—, এবং এই স্থষ্টি যে আদর্শ প্রচারের জন্য নহে, কবি-প্রতিভার লীলা মাত্র, ইহা বুঝিলে আর মধুস্থদনকে আসামীরূপে দাঁড় করাইতে হয় না। রাজনারায়ণকে লিখিত কবির একটি পত্রাংশ এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে,—

"I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't

care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it." অন্যত্র তাঁহার মুখে শুনা যায়, "You know I am 'smit with the love of sacred son". There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend ! * * * 'The Muses before everything' is my motto !"

অর্থাৎ কবি মধুসূদন ভারতীয় মহাকাব্যেরই উপাদানে নূতন এক মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন মহাকবিসুলভ কাব্যসৃষ্টির পবিত্র উন্মাদনায়। সার্থক স্রষ্টা যিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে নূতনত্বের আস্বাদন থাকিবেই। তাই তাঁহার রাম-লক্ষ্মণ, তাঁহার রাবণ-মেঘনাদ-মন্দোদরী, তাঁহার রাক্ষস-সমাজ ও বানর-সমাজ হয়তো বহুস্থলেই বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের অনুরূপ হয় নাই; বহুস্থলেই আসিয়া পড়িয়াছে হোমর-মিলটন-ভার্জিলের ছাপ। [এই সম্পর্কে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মেঘনাদ কাব্যের পটভূমিকা,' 'এই কাব্যের মৌলিকতা' ও 'প্রশ্নোত্তর'-অংশে কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।] কিন্তু ইহাতেই যে 'অভারতীয় আদর্শের' দায়ে দায়ী করিয়া মাইকেলকে ভারতবাসী অশ্রদ্ধা করিবে, ইহার মত মূঢ়তা আর নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশীয় আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসী বাঙালী কল্পনার সাহায্যে মিলটন-হোমার-প্রতিভার অতিথি সৎকার। এ আতিথ্যে অগৌরব নেই।"

প্রকৃত প্রস্তাবে "ভারতীয় এবং গ্রীক উভয় সাহিত্যের মহাকাব্য-রসিক ছিলেন মধুসূদন। রামায়ণ-মহাভারত-কাহিনী যেমন তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিত, ইলিয়াড-অডেসির কাহিনীও তেমনি তাঁহার কল্পনাকে উত্তেজিত করিত। রামায়ণ-কাহিনীর মহৎ স্নিগ্ধ কবিত্বের উপর ইলিয়াড-কাহিনীর কঠিন ও দীপ্ত শৌর্যের রঙ্ ফলাইয়া নূতন কাব্যসৃষ্টি-প্রচেষ্টার ফল মেঘনাদবধ। মেঘনাদবধে গ্রীক মহাকাব্যের প্রভাব যথেষ্ট আছে এবং বাল্মীকির কাহিনীও যথাযথভাবে অনুসৃত হয় নাই, তথাপি কাব্যটির ভারতীয়রূপ, এমন কি বাঙালীভাব এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। * * * মধুসূদন লিখিয়াছিলেন, It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own : in the present poem, I mean to give free scope to my inventing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the Un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done."

সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্ত প্রাচীন কাহিনীই কালক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে, তাহাদের অল্প-বিস্তর পরিবর্তন হইয়া থাকে। রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রথমে ছিল আর্য-অনার্য সভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী, কিন্তু পরে যখন আর্য-সভ্যতা ও অনার্য-সভ্যতার সংমিশ্রণ হইয়া গেল তখন এই বিরোধের ভাবটি কাটিয়া গেল। পরবর্তী কালে রামচন্দ্র আর্য-সভ্যতার প্রতীক না হইয়া ভক্তবৎসল দেবতায় রূপান্তরিত হইলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ কাহিনীর রূপান্তরের আর একটি ধাপ পাওয়া যায় মাত্র। মাইকেলের যুগকে স্মরণ করিলে এই পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী তাহা বুঝিতে

কষ্ট হয় না। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা শক্তির লীলার সহিত পরিচিত হইলাম। রাবণ ও ইন্দ্রজিতকে মধুসূদন শক্তির ঐশ্বর্যের প্রতীক করিয়া আঁকিলেন। কাজেই এই পরিবর্তন বিকৃতি নহে, কালোচিত রূপান্তর-সাধন; আপাতদৃষ্টিতে ইহা ভারতীয় আদর্শের বিরোধী মনে হইলেও, এই বিরোধ, এই 'Un-Hindu character' সার্থক হইয়াছে যুগের ধর্মকে উপলব্ধি করিয়া, তাহাকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া।

আদর্শের পরিবর্তন প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আমরা জানি, মধুসূদনের প্রতিভার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার পরমাশ্চর্য সম্মেলন হইয়াছিল। তিনি হোমরের অনুকরণে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছেন, হোমরের অনুকরণ করিয়াই রাক্ষস-নায়কদিগকে বীর্যবান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ট্যাসোকে অনুসরণ করিয়া তিনি প্রমীলার চরিত্রে যোদ্ধজনোচিত শৌর্য আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যে বাহুবলের সংগ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে নৈতিক শক্তির (moral force) অনতিক্রম্য প্রভাব। ইহাই 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রামচন্দ্র ভীরু হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার ভীরুতাও মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে। রাক্ষসদিগের মাহাত্ম্য-কীর্তন আছে, কিন্তু রক্ষোরাজকে শেষ পর্যন্ত নীতিধর্মের কাছে নতশির হইতে হইয়াছে। এই নৈতিক আদর্শ সমস্ত কাব্যখানিকে বিস্তৃতি ও ঐক্যদান করিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, আদর্শের পরিবর্তন করিতে গিয়া মধুসূদন কাব্যে একটি নূতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

(খ) মেঘনাদবধে মহাকাব্যের লক্ষণ

মেঘনাদবধ-কাব্য বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক মহাকাব্য। অনেকে বলিয়া থাকেন মহা-কাব্য প্রাচীনকালের বিশিষ্ট সম্পদ; আধুনিককালে খাঁটি মহাকাব্য রচিত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মহাকাব্য ত আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটি মাত্র আছেঃ 'ইলিয়াড', 'অডেসি', 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। অলঙ্কারশাস্ত্রের কৃত্রিম আইনের জোরেই কালিদাসের 'রঘুবংশ', ভারবির 'কিরাতার্জুন'. বা মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট', ভল্‌টেয়ারের 'হাঁরিয়াড' প্রভৃতিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে জোর করিয়া বসান হইয়া থাকে।" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীরও এই মত। তিনি বলিয়াছেন, "কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। কিন্তু ইহারা যে শ্রেণীর, যে পর্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর নহে। যে অর্থে ইলিয়াড বা অডেসি মহাকাব্য, সেই অর্থে প্যারাডাইস্ লষ্ট মহাকাব্য নহে। বস্তুতঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমরের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না।"

এ্যারিষ্টটলের মতে, "ট্রাজেডির মত মহাকাব্যেরও মূল আখ্যান থাকে একটি, কিন্তু যেহেতু ইহা দৃশ্যকাব্য নহে সেইজন্য ইহার মধ্যে উপাখ্যান থাকে বেশী। ইহার ভাব ও ভাষা হয় ঐশ্বর্যবান্ এবং রাজসিক গুণবিশিষ্ট, হেক্সামিটার বা তজ্জাতীয় ছন্দে ইহা রচিত হয়। বিষয় ও বর্ণনার গৌরবে মহাকাব্য সমৃদ্ধ হইবে।"

ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মহাকাব্যে একটি বিশালতা, বিস্তৃতি ও ঔদার্য আছে, যাহা ইহাকে অন্যসকল কাব্য হইতে পৃথক করিয়া দেয়। এজন্য উহাতে উপাখ্যানের বাহুল্য থাকে এবং তাহার জন্য সাধারণতঃ অষ্টাধিক সর্গের প্রয়োজন হয়। আনন্দবর্ধন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মহাকাব্যকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। অমৃতের দুইটি অর্থ আছে—একটি যাহার মৃত্যু নাই, এবং যাহা পরমরস। মহাকাব্যে যাহা ছন্দে গাঁথা হয় তাহা যদি আনন্দের প্রকাশ হয়, তবে সে মৃত্যুঞ্জয়ী। মহাকাব্যের ক্ষয় নাই, কারণ উহার ছন্দে অমৃতমন্ত্র আছে। রসের ব্যাপক ভূমিকার কষ্টিপাথরেই মহাকাব্যের প্রকৃত মূল্যনিরূপণ হইয়া থাকে। রসিক সেই মহাকাব্যকেই বরমাল্য দিয়া থাকেন, যাহার ভিতর আছে আনন্দ ও বিশালতার রসোত্তীর্ণ ঐক্য আর স্থাপত্য-শৈলীর চরমোৎকর্ষ। করুণার আবেগে বাল্মীকির মুখে যখন ছন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তখন সেই ছন্দকে ধন্য করিবার জন্য নারদঋষির নিকট হইতে তিনি একজন যথার্থ মানুষের সন্ধান করিয়াছিলেন। মহাকাব্য তাই মানুষের ইতিহাস, যুগের ইতিহাস, জাতির ইতিহাস, জাতির ঐতিহ্য ও অভীপ্সার ইতিহাস। রসাত্মক বাক্যের মাধ্যমে একটি যুগকে বিবৃত করিয়া তাহার পরিপূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটনের মধ্যেই মহাকাব্যের সার্থকতা।

কাজেই আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি যে, প্রাচীনতম মহাকাব্যগুলি কোন একজন কবির সম্পত্তি নহে, তাহারা কোন একটি জাতির সমগ্র সম্পদ্। মহাকাব্যের ভিতর দিয়া একটি জাতি বা সভ্যতার বহুকালের সঞ্চীয়মান ঐতিহ্য স্থায়ী রূপ পাইয়া থাকে। মহাকাব্যের প্রধান গুণ তাই—বিস্তৃতি—সর্বতঃপ্রসারীভাব। কিন্তু মহাকাব্যের অবলম্বন—রস। অলঙ্কারবর্ণিত নয়টি রসের যে কোনও একটি মহাকাব্যের অঙ্গীরস হইতে পারে (যেমন রামায়ণের অঙ্গীরস হইল করুণ) যদি তাহা বিশালতার অনুভব জাগাইতে পারে। বিশালতার সঙ্গে অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা ও উন্মুক্ততাও থাকিবে। ইহাই সমস্ত মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ। প্রাচীনযুগের যে চারিখানি মহাকাব্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এই গুণটি বর্তমান।

"মেঘনাদবধ কাব্য" খানি শুধু পরিকল্পনায় নহে, চরিত্রসৃষ্টিতেও মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমেই দেব-দেবীর কথা ধরা যাইতে পারে। ইলিয়াডে দেব-দেবীগণ মানব-মানবীর ন্যায়। মানুষের সব দোষগুণই তাঁহাদের আছে, শুধু তাঁহাদের শৌর্য ও শক্তি মানবাতিরিক্ত। মাইকেলের দেব-দেবীরা হোমরের আদর্শে পরিকল্পিত, কিন্তু তাহা হইলেও মহাদেব যে অমোঘ নীতিধর্মে অনুরক্তি দেখাইয়াছেন, জুপিটারে তাহার লেশমাত্র নাই। এখানে 'কুমারসম্ভব'-এর কিঞ্চিৎ প্রভাব দেখা যায়। মধুসূদন দেব-দেবীর প্রত্যক্ষগোচর যে মূর্তি আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রতিভার স্বকীয়তাই প্রমাণ করে। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টির আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ—পরিকল্পনার ঐশ্বর্য। শুধু বাহিরের ঐশ্বর্য নহে, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ প্রত্যেকটি চরিত্র অনুভূতির ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান্। এমন বর্ণাঢ্য অনুভূতি যে, পাঠকের কল্পনাকে তাহা সহজেই উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, তাহার অন্তরে স্থায়িভাবের সঞ্চার করে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

মেঘনাদবধ কাব্যের মহাকাব্যোচিত পরিকল্পনা ও চরিত্রসৃষ্টির মহিমার উল্লেখের পর উহার বর্ণনার ওজস্বিতার কথা বলা প্রয়োজন। ভাষা ভাবেরই বাহন মাত্র এবং ভাষা ছাড়া কবির ভাবও

অভিব্যক্ত হইতে পারে না। মাইকেলের ভাষায় ও বর্ণনায় আমরা সর্বত্র মহাকাব্যোচিত ওজস্বিতা, গাম্ভীর্য ও বিস্তৃতির পরিচয় পাই। হোমর যেমন কোন দেবতা বা বীরের নাম করিলেই তাঁহার উপযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বর্ণনার সমৃদ্ধি আনয়ন করিতেন, মাইকেলও তেমনি করিয়াছেন। বর্ণনাকে ওজস্বিতা দেওয়ার জন্য মাইকেল সাধারণতঃ গুরুগম্ভীর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্য ওজোগুণসমৃদ্ধ হইয়াছে—এবং অনেক স্থানে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ-বহুল পদের প্রয়োগে মহাকাব্যোচিত দীপ্তির সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, অতিদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ সংস্কৃতে প্রযোজ্য হইলেও বাংলায় তাহা বে-মানান হইবে। সেইজন্য তিনি সমাসবদ্ধ পদসংযোজনার পরিবর্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ-সমন্বিত গুরুগম্ভীরনাদ-বিশিষ্ট সচরাচর অপ্রচলিত শব্দের সন্নিবেশ করিয়া দীপ্তিগুণ আনয়ন করিয়াছেন। এই জাতীয় প্রয়োগে তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতা প্রমাণিত হয়। ওজোগুণে এই কাব্য তাই অদ্বিতীয়, বাক্যবিন্যাসে অনুপম এবং রস-ব্যঞ্জনায় অপূর্ব।

মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ উপমা-বৈশিষ্ট্য। উপমা-প্রয়োগেও মাইকেলের প্রতিভা আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। লক্ষ্মণের সঙ্গে শিবের সাক্ষাতের বর্ণনাটি এইরূপ :

"কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্তি ; দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি ! জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবী-ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন !
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ; শাল-বৃক্ষ-সম,
ত্রিশূল দক্ষিণ করে ! চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে।"

"এই বর্ণনার উপমা-সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয়। মাইকেলের অনন্যসাধারণ প্রকাশভঙ্গীর প্রকৃষ্ট পরিচয় ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। মহাদেবের কল্যাণমূর্তি নহে, ভীমকান্তরূপ তিনি আঁকিয়াছেন। সেইজন্য তিনি এমন কয়েকটি জিনিসই নির্বাচন করিয়াছেন যাহা এই ভীষণতার পরিচয় দিতে পারে—ললাটে শশিকলা, শিরে জটাজূট এবং তাহার মধ্যস্থলে জাহ্নবীর ফেনলেখা, অঙ্গে বিভূতি, হস্তে ত্রিশূল। নিখুঁত ও উপযুক্ত উপমায় চিত্রটি একেবারে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

হোমরের অন্যতম প্রধান গুণও এই উপমার বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ বিষয়কে তিনি উপমার সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ উপমাগুলি উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, উপমানের বৈশিষ্ট্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া মহাকাব্যকে বিশালতা দান করে। মাইকেলের কাব্যে উপমার প্রাচুর্য যেমন হোমরকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনি উপমাপ্রয়োগে তাঁহার স্বকীয়তাও লক্ষণীয়। কাব্যের আত্মা হইতেছে ঔচিত্যবোধ এবং বিচার করিলে পরে দেখা যাইবে যে, মেঘনাদবধ কাব্যের উপমাসমূহ প্রায় সর্বত্রই অতিশয় ঔচিত্যবান্। তিনি ঠিক যে ভাবটি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন প্রত্যক্ষগোচর প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সুপরিচিত কিংবদন্তী বা সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সেই

ভাবটিকে সুস্পষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করিয়াছেন। উপরের উদ্ধৃত অংশটি বিচার করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। মাইকেলের অধিকাংশ উপমাই ঐশ্বর্য, বৈচিত্র্য, ঔচিত্য, ও সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় দেয়। তাঁহার উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য সত্যই অসাধারণ। 'Epic Simile' বলিতে যাহা বুঝায়, এবং যাহা হোমরের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, মাইকেল ঠিক তাহারই নিদর্শন দেখাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। স্পষ্ট, নিখুঁত ও বিস্তারিত চিত্রে উপমানকে স্তরে স্তরে সজ্জিত ও প্রসারিত করিয়া তুলিয়া ধরাই হইল এই জাতীয় উপমার লক্ষণ। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা মাইকেলের এই ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে :

চারি দ্বারে বীরব্যূহ জাগে ; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্যকুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্রপাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে, জাগে বীরব্যূহ
রাক্ষস কুলের ত্রাস লঙ্কার চৌদিকে।

—তৃতীয় সর্গ

এখন প্রশ্ন, মেঘনাদবধ কোন্ শ্রেণীর কাব্য? ইহা মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ কবি নিজে ইহাকে পাশ্চাত্ত্যরীতিতে বিরচিত মহাকাব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যদিও বিনয়বশতঃ তিনি ইহাকে 'মহাকাব্য' না বলিয়া 'কাব্য' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের লক্ষণ-অনুসারে বিচার করিলে যদিও ইহা মহাকাব্য নামের উপযুক্ত হইবে না, তথাপি ইহার অনেক স্থল যে মহাকাব্য-লক্ষণাক্রান্ত: তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কাব্য পাঠ করিতে করিতে আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, উত্তেজিত ও অশ্রুসিক্ত হই, এবং বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকন করি, তাহা যদি মহাকাব্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়, তবে মেঘনাদবধ অবশ্যই একখানি মহাকাব্য। ইহাতে মহাকাব্যোচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য-বর্ণনারও অভাব নাই। কবি ইহাতে যে উদ্দাম-কল্পনা, বর্ণনাশক্তি এবং মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা মহাকাব্য-রচয়িতারই উপযুক্ত।

এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক কাব্যসমালোচকের মত এখানে উদ্ধৃত হইল। "বিষয়-গুণে, কাব্যোচিত ছন্দ, ভাষা, অলঙ্কার ও রসাদিগুণে এই কাব্যখানি মহাকাব্যই বলিতে হয়। ইংরাজীতে এপিক (Epic) বলিলে যদি আমাদের ভাষায় "মহাকাব্য" বুঝায়, তাহা হইলেও ইহা মহাকাব্য ; আর সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশানুসারে বিচার করিলেও ইহা মহাকাব্য। বিশ্ববিশ্রুত রামায়ণের লঙ্কা-যুদ্ধ যে কাব্যের আখ্যান বস্তু; অযোধ্যার সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশোদ্ভব, অশেষ গুণ-সম্পন্ন, বীর ভ্রাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণ যাহাতে একপক্ষ, এবং স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-বিজয়ী প্রবলপরাক্রান্ত রক্ষোরাজ রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ কুমার মেঘনাদ অপর পক্ষ ; অষ্টাধিক সর্গ ব্যাপিয়া বীর ও করুণাদি প্রধান প্রধান রস যে কাব্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান এবং চমৎকার রূপে অভিব্যক্ত—সে কাব্যকে মহাকাব্য ভিন্ন আর কি বলা

যাইতে পারে? সংস্কৃত-সাহিত্যে কুমার-সম্ভব, নৈষধীয়-চরিত, শিশুপালবধ ইত্যাদির ন্যায় বাঙ্গালা-সাহিত্যে মেঘনাদবধও মহাকাব্য।"

আলংকারিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার 'সাহিত্যদর্পণে' মহাকাব্যের গঠনসম্পর্কে এইরূপ নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন: "মহাকাব্য সর্গে বিভক্ত হইবে; তাহার নায়ক একজন দেবতা অথবা সদ্বংশজাত, ধীরোদাত্ত ক্ষত্রিয় হইবে; শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের একটি ইহার অঙ্গীরস হইবে এবং অন্য রসগুলি প্রধান রসের অঙ্গ হইবে; ইহাতে নাটকের সমস্ত নাটক-সন্ধি থাকিবে,......আরম্ভে নমস্কার, আশীর্বাদ বা বস্তুনির্দেশ থাকিবে; ইহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে; 'প্রতি সর্গের' শেষে পরবর্তী সর্গের সূচনা থাকিবে। কোন একটি সর্গ একই ছন্দে রচিত হইবে, কিন্তু সর্গান্তে নূতন ছন্দের প্রবর্তন করিতে হইবে; ইহাতে নগর, বন, উপবন, শৈল, সমুদ্র, প্রভাত, সন্ধ্যা, ক্রীড়া, মন্ত্রণা, যুদ্ধ প্রভৃতির সমাবেশ থাকিবে; আর, কবি, বৃত্তান্ত, নায়ক বা অন্য কাহারও নামে মহাকাব্যের নামকরণ হইবে।" কিন্তু এই সংজ্ঞার মধ্যে মহাকাব্যের প্রকৃত তাৎপর্যের কোন পরিচয় নাই। ইহা অলংকারিকের নিতান্তই ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনের কথা। কারণ, প্রকৃত কাব্যসৃষ্টি নিয়মের ছক-বাঁধা গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলিয়াছেন, "One can increase one's talent by training or by following the rules of rhetoric, but genius is a gift of Nature. No rule can be made for the world's supreme singers with spontaneous breath of creative genius such as Vyasa, Valmiki, Homer, Shakespeare, Virgil, Dante, Milton and Kalidas. Supreme imaginative originality is seldom bound by the rules of grammar."

মধুসূদনের বেলাতেও এই originality'র কথাই বড় হইয়া উঠিতে বাধ্য। তাঁহার কাব্যের মধ্যে অলংকারশাস্ত্র-সম্মত অনেক লক্ষণই দেখা দিয়াছে, এমনকি যে বিশ্বনাথ সম্বন্ধে তিনি কোন সময় বলিয়াছিলেন, "I will not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanatha of Sahitya Darpan." তাঁহারই নির্দেশ অনুযায়ী কাব্যখানিতে অষ্টাধিক সর্গ যোজনা করেন; তাহা ছাড়া "সন্ধ্যাসূর্যেন্দুরজনী" ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনাও তাঁহার কাব্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখা দিয়াছে। কিন্তু প্রতিভার মৌলিকতার ফলে কাব্যের নায়ক না হইল দেবতা, না হইল কোন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়; সনাতন প্রথাকে অগ্রাহ্য করিয়া কবি এক অনার্য বংশীয় ব্যক্তিকে নায়কের মহিমাদান করিয়াছেন,—সংস্কৃতমতে কোন অনার্যই 'সদ্বংশ' বলিয়া দাবী করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, সর্গান্তে নূতন ছন্দের প্রবর্তন, অথবা সর্গান্তে ভাবী সর্গের আভাসদান ইত্যাদি নিয়ম তিনি স্বচ্ছন্দে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন। অঙ্গীরসের প্রশ্নও পুরাপুরি রহিয়া গিয়াছে, কারণ বীররসের প্রাচুর্যসত্ত্বেও করুণরসেই কাব্যের আরম্ভ এবং করুণরসেই উহার পরিসমাপ্তি। এ সমস্তই কবির originality'র নিদর্শন। এখন যদি আমরা এই সকল নিয়ম-লঙ্ঘনের ফলে গ্রন্থখানির মহাকাব্য হওয়ার দাবী খারিজ করি, তবে আমাদের সেই বিচার কতখানি ন্যায়সম্মত হইবে ইহা একটি সূক্ষ্ম আলোচনার বিষয়।

মহাকাব্যের লক্ষণ মোটামুটি দুইভাগে বিভাজ্য, বহিরঙ্গ লক্ষণ ও অন্তরঙ্গ লক্ষণ। বিশ্বনাথের পরিচয়ের সংজ্ঞায় বহিরঙ্গ লক্ষণেরই প্রাধান্য এবং আমাদের আলোচনায় বুঝা গেল, মেঘনাদবধ কাব্য-এ ইহার অনেকগুলি থাকিলেও কতকগুলি মোটা মোটা জিনিসের রীতিমত অভাব আছে।

কিন্তু অন্তরঙ্গ লক্ষণ বলিতে যাহা বুঝায় আলোচ্য গ্রন্থে তাহা আদৌ অপ্রচুর নহে। বিষয়বস্তুর বিরাটত্ব, চরিত্রের সমুন্নতি, ভাবের গাম্ভীর্য, বস্তুধর্মের প্রাচুর্য, বর্ণনার নাটকীয়তা, এবং সমস্ত কিছুর বাহনস্বরূপ কাব্যকলার উৎকর্ষ ইত্যাদি সম্পর্কে মেঘনাদবধের বিরুদ্ধে বিশেষ একটা অভিযোগ কখনই থাকিতে পারে না। এইখানে মহাকাব্যের যে শ্রেণীভেদের কথা আসিয়া পড়ে সে সম্পর্কে Abercrombie'র কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার পূর্বেই অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের সমালোচকগণ 'এপিক'-কে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন, Authentic Epic ও Literary Epic; উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হইল, বস্তুধর্মের প্রাচুর্য; কিন্তু স্বরূপধর্মের পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়। Authentic Epic একটি সমগ্র জাতি বা যুগের মর্ম-কাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করে, যুগবিশেষের ভাবধারার একেবারে একটি নগ্নরূপ ইহাতে ফুটিয়া উঠে; লোকায়ত সমাজের হুবহু চিত্র—তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের আদর্শ, তাহাদের ধ্যানধারণা—"The totality of the beliefs of a people"—এই শ্রেণীর এপিকের প্রধানতম উপজীব্য; কবিসত্তা এখানে নিতান্তই নগণ্য। কবি আপনাকে বিসর্জন দিয়া নির্বাচিত যুগের গান গাহিয়া থাকেন। জগতে মাত্র চারিখানি গ্রন্থ এই সূক্ষ্ম বিচারে 'এপিক বা 'মহাকাব্য' নামের যোগ্য,—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও অডিসি। আর Literary Epic-এর বৈশিষ্ট্য হইল ইহা কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ছাপ বহন করিবেই। ইহা পরবর্তী কালের সৃষ্টি; তাই প্রাচীন এপিকের ভাবধারা ইহাতে অনুসৃত হইলেও সেই সঙ্গে কবির নিজস্ব মতামত, আদর্শবাদ আর সর্বোপরি কবি-নৈপুণ্যও স্থান পাইয়াছে। "It is the product of individual genius working in an age of scholarship and literary culture on lines already laid down." কালিদাস, ভার্জিল, ট্যাসো, মিল্টন ও মধুসূদনের মহাকাব্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। Abercrombie বলিয়াছেন—"Authentic Epics were intended for recitation, when the Literary Epics are meant to be read." বড়ই সমীচীন এই মন্তব্য; কারণ প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্যে যুগের আদর্শ, ঐতিহ্য ও জীবনের পরিচয় দিবার জন্য কবি একেবারে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তাই সেখানে ভাষা ও রচনা-কৌশল বড় কথা নহে, নিতান্ত প্রাঞ্জল ভাষায় অজস্র কাহিনী গ্রন্থের বিরাট কলেবরকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, আবৃত্তি-মাত্রেই তাহার সবকিছুই জানা হইয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে যুগের কথা, জীবনের কথা যেমনই থাকুক ইহারা প্রধানতঃ সাহিত্যিক আনন্দের জন্যই রচিত। সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ, শিল্প-কলার উৎকর্ষ, ভাষার রূপমাধুরী ইত্যাদির জন্য পাঠক এই জাতীয় মহাকাব্যকে বার বার পাঠ করিতে প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন। "আধুনিক যুগে এপিক রচনা করিতে বসিয়া সকলেই প্রাচীন মহাকবিগণের ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ ও বাক্যাংশ (expression) প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক যুগে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এপিক রচনা করিতে বসিয়া কেহই প্রাচীন এপিকের মত ভাষা ও উপমা ব্যবহারের সাধনায় মধুসূদনের মত সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' এ Literary Epic-এর প্রাণবস্তুর সহিত Authentic Epic-এর বর্ণনাভঙ্গী ও ভাষার স্পষ্টতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।"

কিন্তু এত কথা সত্ত্বেও মেঘনাদবধের মহাকাব্যত্ব স্বীকার করিতে তদানীন্তন অনেক সমালোচক-কেই কুণ্ঠিত দেখা যায়। 'ছুঁছুঁন্দরীবধ-কাব্য'-এর কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে বিরুদ্ধ সমালোচকগোষ্ঠীর

পরিচয় পাওয়া যায় তন্মধ্যে আর সকলকে বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথকে সহজে বাদ দেওয়া যায় না। ভারতী পত্রিকায় (১২৮৯) মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন যে, মহাকাব্যের মধ্যে একটি মহৎভাব, আদর্শ থাকা চাই, উহা কোনো মহৎ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে সেরূপ কোনো মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় না। সমালোচক বলিলেন যে, নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় রাম-লক্ষ্মণ বধ করিলেন, ইহা মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের মধ্যেও না আছে গৌরব, না আছে বীরত্ব, না আছে মহত্ত্ব। তিনি বলিলেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "বৃত্র সংহার"-এর মধ্যে বরং মহাকাব্যের উপাদান আছে, সেখানে মহত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় দধীচির জীবনে; স্বর্গোদ্ধারের জন্য দধীচির অস্থিদান, অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ প্রভৃতি মহাকাব্যের উপযোগী ঘটনা বটে। কিন্তু "মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্বও নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনাও নাই, তেমন মহৎ চরিত্রও নাই।" তদুপরি ইহা পাশ্চাত্ত্য কবিদের অনুকরণে লিখিত; পাশ্চাত্ত্য কোন কবি তাঁহার মহাকাব্যে নরকবর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মধুসূদন অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে নরকের বর্ণনা জুড়িয়া দিয়াছেন, ইহার সহিত মূল কাব্যের কোন সম্বন্ধ নাই। গ্রীক মহাকবি হোমরের মহাকাব্যের সূচনা গ্রীক সরস্বতীর বন্দনা দিয়া, কিন্তু মধুসূদনের পক্ষে হিন্দুদের দেবতা সরস্বতীর বন্দনা অত্যন্ত কৃত্রিম, কারণ, সরস্বতীর সহিত তাঁহার ধর্মজীবনের কোনই সম্বন্ধ ছিল না—ইত্যাদি।

যুক্তির দিক হইতে কথাগুলি যে বিশেষভাবে বিচারণীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত হইল, উদীয়মান সমালোচক রবীন্দ্রনাথ মাত্র ষোল বৎসর বয়সে এই যে সমালোচনায় হাত দেন, তাহা নিতান্তই তাঁহার হাত পাকাইবার জন্য। চিরদিনই দেখা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন লেখকগণ তাঁহাদের আবির্ভাবকে প্রবীণের সমালোচনা ও সনাতনীদের নিন্দার দ্বারা বিঘোষিত করেন; প্রতিভার ঔদ্ধত্যে বিচারবুদ্ধি—তখন আবিষ্ট থাকে। রবীন্দ্রনাথই পরযুগে স্বীকার করিয়াছিলেন যে তিনিও মধুসূদনের অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনী-লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "যে আঘাত সহ্য করিয়া আহত হয় না, আঘাত তাহারই ভূষণ; সুতরাং সাহিত্যের মানসূচী প্রতিষ্ঠাকল্পে মধুসূদনের রচনাকে আক্রমণস্থল রূপে নির্বাচন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভালোই করিয়াছিলেন; কারণ ক্ষীণপ্রাণ সাহিত্যিকদের উপর রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনাসায়কগুলি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের পক্ষে মারাত্মকই হইত। কিন্তু মধুসূদনের কঠিন প্রাণ রবিকর-পীড়নে ম্লান হইবে না।" প্রকৃতপক্ষে এই সমালোচনায় কেবল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্যের গৌরবময় অভ্যাস হইয়াছে, মধুসূদনের কোন গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ মধুসূদনের এই মহৎ কাব্যের সর্বতোমুখী ও নির্দোষ সমালোচনার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন তাহা তখনও রবীন্দ্রনাথে দেখা দেয় নাই। এ যুগের যে-কোন প্রধান সাহিত্য-বিচারক রবীন্দ্রনাথের অভিযোগগুলির সন্তোষজনক জবাব দিতে কখনই অসুবিধা বোধ করিবেন না। আশা করি, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের স্বীকৃতি ও আমাদের পূর্বলিখিত আলোচনার বলে সকলেই মেঘনাদবধের মহাকাব্যত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইবেন।

(গ) মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা

স্বনামধন্য কবি মধুসূদনের হাতে কেবল ছন্দেরই যুগান্তর ঘটে নাই, কবি-ভাষারও যুগান্তর ঘটিয়াছে। প্রতিভাবান্ এই সার্থকস্রষ্টা আপন কাব্যের উপযোগী ভাষা তৈয়ারী না পাইয়া সৃষ্টিব্যাপারে কোন অন্তরায় বোধ করেন নাই, বরং কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন ভাষাকেও তৈয়ার করিয়া লইবার তাগিদে তাঁহার সৃজনীপ্রতিভা নবতর উৎসাহে উল্লসিত হইয়া উঠে। কাব্যসৃষ্টি ও ভাষাসৃষ্টি যুগপৎ চলিতে থাকায় কবি একবার প্রাণ ভরিয়া স্রষ্টার গৌরব উপভোগ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই কাব্যের ভাষাকে যে অনেকেই ভাল চোখে দেখেন না বা ভালবাসিতে পারেন না, ইহার প্রমাণ যত্রতত্র মিলিয়া থাকে। ইহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনীত হয় তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান ঃ দুরূহ আভিধানিক শব্দের বাহুল্য, শ্রুতিকটু শব্দের সঙ্কলন, বাক্যগঠনে সরলতার অভাব, সংযুক্ত-ব্যঞ্জন-সমন্বিত শব্দের প্রয়োগ, উপমার কষ্টকল্পনা ও অতিশয়োক্তি, সাধুর সহিত চলিতের মেলামেশি, ক্রিয়াপদ গঠনের স্বেচ্ছাচার এবং সর্বোপরি ব্যাকরণ লঙ্ঘনের কথা তো আছেই। এত দোষ সত্ত্বেও সেকালে যে কোন কোন সম্প্রদায় এই কাব্যের ভক্ত ছিলেন, তাহা বোধহয় কেবল ইহার অলংকার ও শব্দযোজনার ঘটা ও মোটামুটি একটা কবিত্বের গভীরতার জন্য! তখনও শব্দ-পণ্ডিতের আদর ছিল, তাই মধুসূদনের শব্দ-পাণ্ডিত্য আদৃত হইত। সমস্যা দেখা দিল যুগ-চেতনার পরিবর্তনে; একালে যখন ভাবের স্বচ্ছতা, রচনার সাবলীলতা, প্রসাদগুণ ইত্যাদি রচনার উৎকর্ষের মানসূচী হইল তখনই মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা নিন্দিত হইতে লাগিল। কেহ বলিয়াছেন, "মাইকেলের কাব্যরচনাতে কলা-কৌশল যেন কলকব্জার মত কার্য করে; এইজন্যই তাঁহার অনুপ্রাস শিশুবোধ, উপমা দ্যুতিহীন, পুনরুক্তি ক্লান্তিকর। ভাষার এই জীবনবিমুখ সুদূরতা অর্থাৎ Poetic diction তাঁহার কাব্যরচনার অভিশাপ। মাইকেলের ভাষায় আড়ম্বর আছে, ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ নাই।" আরও বেশী সূচীমুখ হইয়া উঠিয়াছে কবি বুদ্ধদেবের মন্তব্য ঃ "মৃত শব্দরাজিতে আকীর্ণ ব'লেই মাইকেলি কলরোল আমাদের কানেই শুধু পৌঁছয়, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে না……মাইকেলের সযত্ন-সজ্জিত সমস্ত বর্ণনা তাই তো সহস্রাক্ষ ছাপার অক্ষরে কেবলই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, কোনো একটি বাসা বাঁধতে পারলো না মনের মধ্যে।"

কিন্তু এ যুগের এই সকল সমালোচক কোনদিন ভাষার অন্তরের কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, অথবা কবির সৃষ্টিবিশেষের সহিত সংগতি বজায় করিবার জন্য ভাষারও যে অভিনবত্বের প্রয়োজন হইতে পারে একথাও বোধহয় কোনদিন চিন্তা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথও মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাকে খুব সুনজরে দেখিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু আধুনিক যুগের অতি উৎসাহী সমালোচকের ন্যায় তিনি এই ভাষাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিবার জন্য অমন কোন হাইকোর্টের রায় দিয়া যান নাই। বরং তিনি যখন মেঘনাদবধের নির্মমতম সমালোচক ছিলেন সেই তাঁহার বাল্যকালেও 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' এমন একটি দুরূহ ছত্রেরও ভাষাগত দোষ ধরিতে পারেন নাই; পক্ষান্তরে খাঁটি গুণগ্রাহীর ন্যায় লিখিয়াছেন, "এখানে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বারবার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে।"

ইহাই হইল ভাষাবিচারের খাঁটি দৃষ্টিভঙ্গী; অর্থাৎ দেখিতে হইবে, যে ভাব ও কবিকল্পনার বাহন হইল ভাষা, সেই ভাব ও কল্পনা কত সুন্দরভাবে ভাষার মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে। এখন যদি

ঐ ভাব ও কল্পনার মধ্যে একটা অনন্যসাধারণ মৌলিকতা থাকে, তবে ভাষারও একটা অনন্যসাধারণ রূপ অবশ্য প্রয়োজন। সত্যকার প্রতিভাশালী যে কবি, তিনি কখনই আর পাঁচজন কবির ন্যায় হইতে পারেন না; তিনি স্রষ্টা ঃ সুতরাং তাঁহার ষ্টাইলের মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্র্য থাকিবে, তাই ষ্টাইলের প্রাণ যে ভাষা, তাহারও একটা স্বতন্ত্র রূপ ফুটাইয়া তোলা অবশ্য প্রয়োজন, আর এই প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ একমাত্র বিশিষ্ট প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব। ভাষাই কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপাদান, এবং ভাবে নয়, ভাবের প্রকাশ-সুষমাতে, অর্থাৎ ভাষার কারুশিল্পেই, প্রকৃত কবিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। মেঘনাদবধের ভাষাসম্পর্কে এ যুগের অদ্বিতীয় সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে যে কেবল পূর্বোল্লিখিত ধরণের বিরুদ্ধ সমালোচনার অবিমৃষ্য ও উদ্ধত রূপ প্রকটিত ও প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা নহে, মাইকেলের ভাষার এক অপরিচিতপূর্ব ভাষ্য লাভ করিয়া বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য ধন্য হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, মধুসূদনের কাব্যে আমরা যে শক্তির পরিচয় সর্বাধিক পাই, তাহা তাঁহার ভাষার কবিত্ব-লক্ষণ; ছন্দে ও বাক্যে তিনি বাংলা কাব্যের ধাতুকেই পরিবর্তন করিয়াছিলেন; বাক্যের সংগীতগুণ, শব্দের নূতনতর প্রয়োগ ও মিলন-কৌশলে (phrase making) সে ভাষার যে অপূর্বত্ব—ভিন্ন ধরণে বিহারীলাল ব্যতীত সে যুগের আর কোন কবি বাংলা-কাব্যের ভাষাকে তেমন শিল্প-কৌলিন্য দান করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের ভাষায় সবচেয়ে বড় লক্ষণ তাহার সংগীতগুণ—যে প্রতিভার বলে তিনি এত বড় ছন্দ-সংগীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ভাষায় এই শব্দসংগীতও (Phrasal music) সেই প্রতিভার পক্ষে স্বাভাবিক। বক্তার পক্ষে যেমন বাক্‌পটুতা, কবির পক্ষেও তেমনি শব্দনির্মাণপটুতা—বক্তাকে কেবল আহরণ করিতে হয়, কবিকে সৃষ্টি করিতে হয়। মধুসূদনের ভাষায় যে সংগীত আছে, তাহা রসবিগলিত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংগীত—বিশেষত—সংগীতের যাহা শ্রেষ্ঠ উপাদান সেই স্বর-ধ্বনির অপূর্বলীলা। এ সংগীত কাব্যরচনাকালে প্রাণ হইতেই কানে বাজিয়া উঠে, এবং তাহা হইতেই কবির রসনায় শব্দসৃষ্টি হয়।

বাস্তবিকই যাঁহারা মনে করেন, মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুসূদন অভিধান দেখিয়া শব্দচয়ন করিতেন, তাঁহাদের এই শব্দসংগীতের কথা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। তাহা ছাড়া, শব্দগুলি যে কষ্টকল্পিত নহে, সেই সম্পর্কে কবির নিজের মুখের উক্তিও বিশেষ মূল্যবান্। রাজনারায়ণকে লিখিত এক পত্রে কবি বলিয়াছেন, "I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials and you know, I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you,' মোহিতলাল তাঁহার সূক্ষ্ম অথচ বিস্তারিত সমালোচনায় মেঘনাদবধের ভাষার যে সকল গুণাগুণ দেখাইয়াছেন তাহা এই কাব্যের সমালোচকমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। আমরা উহা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। উক্ত সমালোচকের বক্তব্য হইল, মধুসূদন কেবল অলঙ্কার-প্রীতির জন্যই অলঙ্কার ব্যবহার করেন নাই, ভাবের সুর অনুযায়ী ছন্দ-সংগীতেরও বৈচিত্র্যসাধন ছিল তাঁহার লক্ষ্য। 'সর্ব্বহর কাল তাহে পারে না হরিতে'—এখানে যেটুকু যমক বা অনুপ্রাসের টান আছে, তাহা কেবল ভাষার অলংকারবৃদ্ধির জন্যই নহে, এই অনুপ্রাসে যে বিশিষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনির সমাবেশ হইয়াছে, তাহাতে ভাষার ভাবানুরূপ

গাম্ভীর্যের সঞ্চার হইয়াছে। আবার, 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে'— এই চরণের নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাসও, Tennyson-এর 'Immemorial elms and murmur of innumerable bees''—এর মত নিকৃষ্ট শব্দালঙ্কার মাত্র নয়; কারণ, তাহাও সেই 'মধুকর-নিকর-করম্বিত'-জাতীয় অনুপ্রাসেরই ইংরেজি সংস্করণ; যেস্থানে যেভাবে উহা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা যেমন অতর্কিত তেমনই স্বাভাবিক। যেক্ষণে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ-কর্তৃক মেঘনাদ হত হইল, সেইক্ষণে—

যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বূরপতি, সহসা পড়িল
কনকমুকুট খসি, রথচূড়া যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে!

অনুপ্রাসের দ্বারাই ভাবের এমন অপরোক্ষ অনুভূতি সঞ্চার করার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। পূর্বপংক্তিগুলির পরে সহসা ঐ পংক্তিটিতে আসিয়া পাঠকের চিত্তের একটা কম্পন-শিহরণ জাগে—রাবণের প্রাণেও যেমন সহসা একটা অমঙ্গলের ভীতি-শিহরণ জাগার সংবাদ ঐ শব্দ কয়টি জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে কেবল বর্ণের সমধ্বনি নয়—বিশিষ্ট ধ্বনিতেই, সেই শিহরণ-উদ্রেকের গুণ আছে। অতএব, মেঘনাদ বধের ভাষায় যমক-অনুপ্রাসের যে প্রাচুর্য প্রায় সর্বত্র আছে, তাহার কারণ শুধু শব্দালঙ্কার-প্রীতি নয়—অব্যর্থ শব্দধ্বনির দ্বারা ভাবের যথাযথ রূপসৃষ্টিও তাহার অভিপ্রায়। মধুসূদন তাঁহার কল্পনা অনুযায়ী শব্দচয়নে কেবলমাত্র অভিধানের শরণাপন্ন হন নাই, সেই শব্দরাশির উপরে তিনি নিজের অসামান্য কবিশক্তি প্রয়োগ করিয়া, কাব্যেরই প্রয়োজনে, একটি বিশিষ্ট বাণীরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাতে ভাষার শক্তিই বাড়িয়াছে—স্বভাবের বিকৃতি ঘটে নাই। সে ভাষা প্রয়োজনমত প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে অনায়াসে উঠা-নামা করিতেছে। 'বাজিরাজি, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে মুখস্'—ইত্যাদি ছত্রে যে সংস্কৃত শব্দের পাশে আমাদের ঘরের কথা বসানো হইয়াছে, তাহা একান্তই ঐ স্থান ও ঘটনাবিশেষের ভাবমণ্ডল বজায় রাখিবার প্রয়োজনে এবং সাধু ও চলিত এই উভয়-শ্রেণীর মধ্যবর্তী দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া আমাদের কাব্য-ভাষাকে এক স্বাধীন গতি-দান করিবার জন্য। মোহিতলালের মতে বাংলাভাষার এই যে নূতন সজ্জা—রণসজ্জা—কবি নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা প্রতিভা ব্যতিরেকে একান্ত অসাধ্য। কবি বিহারীলাল যেমন তাঁহার সেই সরল অথচ শুদ্ধ ও মার্জিত ভাষায়,—যেখানে যেমন ইচ্ছা একেবারে 'মুখের বোল' ব্যবহার করিয়াছেন, মধুসূদনও তেমনই, তাঁহার সেই অতিশয় সাধু ও অলঙ্কৃত ভাষায়, প্রাচীন ও আধুনিক—কাশীদাস-কৃত্তিবাস এবং কবি-পাঁচালীর—ভাষা মিশাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

তবে ক্রিয়াপদ-নির্মাণের হঠকারিতা, ব্যাকরণ-লঙ্ঘন, ইংরেজি-প্রভাবিত শব্দনির্মাণ ইত্যাদি ত্রুটি বা স্বেচ্ছাচার যে মাইকেলের ভাষায় বিদ্যমান এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সর্বপ্রকার রীতি-নীতির বশ্যতা স্বীকার কোন মৌলিক কবি-প্রতিভার পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁহারা আর কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কবি-ভাষার বিচারে কেবল ব্যাকরণ খুলিয়া বসেন, অথবা প্রাণের দরজা বন্ধ করিয়া কেবল কানের কপাট খুলিয়া রাখেন, তাঁহারা সাহিত্য সমালোচনার অধিকারী নহেন। 'মেঘনাদবধ'-এর

ভাষা-বিচারে তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন এই কবির প্রতিভার মৌলিকতার একটা সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করা। কারণ, প্রতিভাবান্ স্রষ্টার প্রয়োজনের স্বরূপ সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝিয়া লওয়া বিশেষ সাধনা ব্যতীত সম্ভব নহে। এক্ষণে আমরা এই কাব্যের অন্যান্য প্রচলিত ত্রুটির কথা আলোচনা করিব।

(ঘ) মেঘনাদবধ কাব্যের দোষ

বহুগুণসমন্বিত হইলেও মেঘনাদবধ কাব্য ত্রুটিশূন্য নহে। পৃথিবীতে কোন কবির রচনাই নির্দোষ নহে ; ব্যাস-বাল্মীকি, ভবভূতি-কালিদাস, সেক্সপীয়র-মিল্‌টন প্রমুখ সকল মহাকবির কাব্যেই অল্প-বিস্তর দোষ আছে। মধুসূদনও এ-নিয়মের বাহিরে যাইতে পারেন নাই। সুতরাং কাব্যবিচারে দোষ-গুণের দুই-ই উল্লেখ করা আবশ্যক।

এই কাব্যের পরিধি অতিশয় সংকীর্ণ। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের একটি কাণ্ডের একটি খণ্ডাংশ লইয়া ইহা রচিত। মহাকাব্য-বর্ণিত ব্যাপার সংঘটিত হইতে তিন চারদিনের বেশী সময় লাগে নাই। অষ্টাদশপর্বব্যাপী মহাভারত বা চতুর্বিংশতিসর্গব্যাপী ইলিয়াডের তুলনায় ইহা কত ক্ষুদ্র। এমন কি ভার্জিলের ঈনিড, দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়া এবং ট্যাসোর জেরুজালেম-উদ্ধার ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তৃত-পরিসর।

মেঘনাদবধ কাব্যে সর্বব্যাপী নীতিধর্মের কথা আছে, এবং রাবণ যে বিশ্ববিধানকে বিচলিত করিয়াছেন তাহা বারংবার কথিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদ-প্রমীলার ব্যক্তিগত কাহিনী এত প্রাধান্য পাইয়াছে যে, বিশ্ববিধানের শৃঙ্খলাবিপর্যয়রূপ বিষয়টি যথোচিত প্রাধান্য পায় নাই। ইহার কারণ মাইকেলের পরিকল্পনায় একটা স্ববিরোধিতা ছিল। এই মৌলিক অসঙ্গতিতে কাবের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মাইকেল রাম ও তাঁহার দলকে পছন্দ করিতেন না, অথচ তাঁহাদিগকেই ন্যায়ধর্মের প্রতিভূ করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে পাপীর চিত্র পুণ্যবানের চিত্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। মিল্‌টন যেমন শয়তান বা পাপ-পুরুষকেই তাঁহার কাব্যের নায়ক করিয়া ফেলিয়াছেন, মেঘনাদবধের কবিও তেমনি, রাম-লক্ষ্মণকে বিসর্জন দিয়া, পাপাচারী রাক্ষসরাজ ও তাঁহার পরিজনদিগকেই তাঁহার কাব্যের নায়ক-নায়িকা করিয়া তুলিয়াছেন। নীতির দিক হইতে বিচার করিলে পাপাচারীর প্রতি কবির এই সহানুভূতি তাঁহার কাব্যে নিন্দনীয়। তবে এইসঙ্গে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মধুসূদন পাপীর প্রতি সহানুভূতি ও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিলেও, পাপের প্রতি আদৌ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই।

মেঘনাদবধ কাব্যে কবির বিশ্বাসের অভাব আর একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। সমগ্র কাব্যখানি পাঠ করিয়া মনে হয়, "কবি কোনো বিশ্বাসের পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয় পান নাই। যে বিশ্বাসের জোরে দান্তের কাব্য নরক-প্রভাবে অলৌকিক হইয়াও প্রাকৃতপন্থী উপন্যাসের মত, এমন কি চলচ্চিত্রের মত প্রত্যক্ষ, যে-বিশ্বাসের জোরে মিল্‌টন বাইবেলের রূপকথা লইয়া অমর কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার কণামাত্র অংশ যদি মাইকেলের থাকিত তাহা হইলে তাঁহার কাব্যের রূপ-প্রতিমায়, অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যও, প্রাণসঞ্চার না হইয়াই পারিত না। তিনি কোনো ঐতিহ্যকেই আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই ;

না স্বজাতীয়, না বিজাতীয়। মাইকেল কোনো ঐতিহ্যকে পান নাই বলিয়া তাঁহাকে প্রথার হাতে অসহায় আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল; তাই তাঁহার রাম-লক্ষ্মণ-সীতা কিংবা রাবণ-মেঘনাদ-প্রমীলা কেহই জীবন্ত নহে, তাই তাঁহার নরকে দুঃখের অগ্নিশুদ্ধি নাই, স্বর্গে নাই সৌন্দর্যের অমরতা, আছে শুধু লিপিপুস্তিকার নীতিকথা।" তাঁহার কাব্যে দান্তের নরকবর্ণনার অনুকরণ নিতান্তই প্রাণহীন হইয়াছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কবি তাঁহার কাব্যের এই সব দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে নিজে সচেতন ছিলেন বলিয়াই তিনিই ইহা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতে পারিয়াছেন: "I find that here are many metrical blemishes in the earlier books of Meghnada. I am sure the poem has many faults. What human production has not ?" মধুসূদনের এই উক্তিটি তাঁহার সকল দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করিবার পক্ষে আমরা যথেষ্ট মনে করিতে পারি।

(ঙ) এই কাব্যের মৌলিকতা

মেঘনাদবধ কাব্যের মৌলিকতা লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, মেঘনাদবধের প্রতি ছত্রে যখন অন্যান্য মহাকবিগণের হস্তচিহ্ন বর্তমান, তখন ইহাতে কবির নিজস্ব কৃতিত্ব বা মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি কোথায়? কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে, কতকগুলি মৃতজীবের কঙ্কাল হইতে অস্থি সংগ্রহ করিয়া, একটি অভিনব জীব সৃষ্টি করা যেরূপ কঠিন, অন্যান্য কাব্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া একখানি নবীন কাব্য প্রণয়ন করাও সেইরূপ কঠিন। তাঁহাদিগের আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, মিলটন অথবা সেক্সপীয়রকে গৌরবচ্যুত হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত অত্যন্ত সুচিন্তিত: "ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগও ছিল সুগভীর। সেইসঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন আয়ত্ত ক'রে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃত-রস-ভোগে......মাতৃভাষায় তিনি এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে-কাব্যে স্খলিতগতি প্রথম-পদ-চারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশীয় আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসী বাঙালীর কল্পনার সাহায্যে মিল্টন-হোমর-প্রতিভার অতিথিসৎকার। এ আতিথ্যে অগৌরব নেই।"

আমরাও বলি, অগৌরব নাই; কারণ মধুসূদন না জন্মাইলে মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হইত কি না সন্দেহ। তাই, সকল দোষসত্ত্বেও আমরা হেমচন্দ্রের কথায় বলিতে বাধ্য হই যে, "সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, নানাদেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরজিতে যে অপূর্ব মালা গ্রথিত হইয়াছে—তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল কণ্ঠে ধারণ করিবেন। যদি মৌলিকতার গৌরব আমরা মধুসূদনকে দিতে কুণ্ঠিত হই, তথাপি ইহা ত অস্বীকার করিবার নহে যে, মেঘনাদবধ কাব্য বাংলাভাষায় যে-শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে, কেবল তাহারই জন্য ইহা অমরতা লাভ করিবে," এবং রাজনারায়ণ বসুর কথায়, "বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদবধ পাঠ করিবে।"

কিন্তু কেবলমাত্র কবির কয়েকজন গুণগ্রাহীর মন্তব্যই কাব্যের মৌলিকতা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমাদের মনে হয়, গ্রন্থের প্রারম্ভে কবির এক প্রার্থনাবাক্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাই তাঁহার মৌলিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিবার জন্য দায়ী। তিনি লিখিলেন, "কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু লয়ে রচ মধুচক্র"—আর অমনি দেশশুদ্ধ লোক ব্যাখ্যা করিলেন যে, মৌমাছি যেমন বিভিন্ন ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র রচনা করে, কবিও তেমনি দেশী-বিদেশী অসংখ্য কবির কাব্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত কাব্যখানিকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং নিজেই যখন স্বীকার করিয়াছেন পরের জিনিষ লইয়া তাঁহার কাব্যসৃষ্টি তখন আর মৌলিকতার অবসর কোথায়? তবে জোড়া-তাড়া লাগাইবার কায়দা-কানুন নাকি বড়ই চমকপ্রদ, তাই তাঁহার মিস্তিরিগিরির প্রশংসা করিতে হয়! কিন্তু ঐ উত্তুঙ্গ-আশা-মত্ত কবির কি মাত্র এইটুকুই হইল প্রার্থনা যে, তিনি যেন পরের জিনিষ নিজের তহবিলে পুরিয়া, তাহার কিছু রং ফিরাইয়া আবার তাহার দ্বারাই অপরের মন ভুলাইতে পারেন? ইহাও কি একটা গর্বের বিষয় হইতে পারে যে, অত বড় কবি বুক ফুলাইয়া গ্রন্থের প্রথমেই সকলকে বলিবেন—আমি যেন পরের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া কেবল ভাল করিয়া মালা গাঁথিতে পারি! প্রকৃতপক্ষে কবির প্রার্থনাই তাহা নহে। তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন কল্পনা-দেবীর নিকট, সুতরাং মধুকরী হইল কল্পনা, কবি নহেন। যে 'কবি-চিত্ত-ফুলবনে তাহাকে মধুসংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে, তাহা নানা দেশের নানা কবির চিত্ত-ফুলবন নহে, মধু-কবিরই চিত্তরূপ ফুলের বন। এখানকার অর্থ হইল, কবিমাত্রেরই মন বিচিত্র ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ; এই কবি-চিত্ত যেন ফুলের বনের মতো। ফুলে ফুলে যেমন মধু থাকে কবি-চিত্তের বিচিত্র ভাবের মধ্যেও তেমনি রসমাধুর্য বর্তমান। যেমন ফুলের মধ্যে মধু থাকিলেই মৌচাক তৈয়ারী হয় না, তেমনি কবির মনের মধ্যে ভাব থাকিলেই রসোত্তীর্ণ কাব্য রচিত হয় না;—প্রয়োজন হইল কল্পনারূপ ভ্রমরের যাহা কবি-চিত্তের বিভিন্ন ভাবাশ্রয়ী রস একত্রিত করিয়া রসোত্তীর্ণ কাব্যরূপ মধুচক্র রচনা করিবে। কাব্যে কল্পনার এই প্রাধান্য মধুসূদন অন্যান্য স্থানেও প্রচার করিয়াছেন। তুলনীয়ঃ—

"সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন",—

সুতরাং এখানে কেবল আত্মসচেতন কবি আপন দুঃসাহসিক কাজের সাফল্যের জন্য আপনারই কল্পলোকে এক সাড়া জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন; তাই এই অংশেই নানাদেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নের সঙ্কল্প রহিয়াছে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই।

তবে এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এই নহে যে, মধুসূদনের কোথাও কোন ঋণ নাই এই কথা প্রতিষ্ঠিত করা। পূর্বসূরীর নিকট ঋণ সকলেরই অনস্বীকার্য। তিনি যে তাঁহার অধ্যয়ন-গবেষণায় এ-দেশের সে-দেশের কোন কবিকেই বাদ দেন নাই—সেই তো তাঁহার গৌরব। মিল্টন যদি তাঁহার ছন্দ-সঙ্গীতের গুরু হইয়া থাকেন, কৃত্তিবাস হইয়া থাকেন কাহিনী-অংশের ঋণদাতা, আর হোমরই তাঁহার 'কবি-চিত্ত-কমলের রবি', তবে ইহাতে অগৌরব কোথায়? তাঁহার স্বল্প-পরিসর কবি-জীবনে তিনি যে প্রাচ্য-প্রতীচ্য, আর্য-অনার্য, সংস্কৃত-অসংস্কৃত সকলের সমন্বয়াত্মক ভাবে-ভাষায়-ছন্দে-গীতে এক অনাস্বাদিতপূর্ব কাব্যরসায়ন সৃষ্টি করিয়াছেন—এইখানেই এই কাব্যের মৌলিকতা। ইহা কি কেবল মালাকারের

কীর্তিমাত্র? মালার ফুলও কি তাঁহারই চিত্তবনজাত নহে? বস্তুসম্পদ্ বহুলাংশে তিনি অপরের নিকট হইতে লইয়াছেন, কিন্তু ইহা তো প্রতিভাহীনের চৌর্য নহে, প্রতিভাবানের বলিষ্ঠ সংগ্রহ। যে রামায়ণ-কাহিনী তাঁহার মূল অবলম্বন, তাহার কি অভিনব রূপই না আমরা মেঘনাদবধে দেখিতে পাই! চিরপূজিত আর্য-রামায়ণের অথবা চিরাদৃত কৃত্তিবাসী রামায়ণের গাত্রে এমন নিঃশঙ্কচিত্তে আর কে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত? আপন আদর্শের অনুযায়ী শৌর্যবীর্যবিশিষ্ট মানবীয় চরিত্র কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া মধুসূদন বীরের ন্যায় ঐ রামায়ণকেই ভাঙিয়া গড়িলেন। বাল্মীকির কাব্যের রাক্ষস-চরিত্র শোধন করিয়া তিনি উন্নত মানব-চরিত্র করিয়া লইলেন। সেখানকার ভাবধারাকে তিনি এক বিরুদ্ধখাতে বহাইয়া দিলেন; তাই আমরা যে রাবণ বা রামকে পাইলাম তাহা বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস কাহারও মার্কা-মারা জিনিষ নহে; তাহা নিতান্তই কবির নিজস্ব সম্পদ্—কবিমানসপ্রসূত সম্পূর্ণ নূতন চরিত্র। সমালোচককে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মেঘনাদবধ কাব্যের গোটা পরিকল্পনার মধ্যে রহিয়াছে এক অসাধারণ মৌলিকতা। গ্রীক পুরাণকাহিনী তাঁহার বীরত্ব-প্রিয় কবিমানসকে মুগ্ধ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি তো গ্রীক্‌পুরাণ হইতে কাব্যের উপাদান হুবহু গ্রহণ করেন নাই, লইয়াছেন কেবলমাত্র উহার উৎকৃষ্ট সৌরভ, আর তাহাতেই সুরভিত করিতে চাহিয়াছেন আপনারই সেই সনাতন পুরাণকাহিনী। "It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the Un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done." কবির এই নিজের কথা হইতেই বুঝিতে হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে যাহা কিছু স্থান পাইয়াছে তাহার মূল উৎস রামায়ণ-মহাভারত বা ইলিয়াদ-অদিসি নহে, কবির নিজেরই 'inventing powers', অর্থাৎ সৃজনীশক্তির মৌলিকতা। প্রকৃতপক্ষে কবির ভাবলোকের মূলীভূত উপাদান (raw materials) রূপে আমরা এদেশ সেদেশ অনেক কবির অনেক কথাই খুঁজিয়া পাই, কিন্তু সেগুলি মধুসূদনের কল্পনালোকে রঞ্জিত হইয়া যখন তাঁহারই নিজস্ব পরিকল্পনার অঙ্গহিসাবে পরস্পর এক নাড়ীর যোগে সংযুক্ত থাকিয়া এক অখণ্ড কাব্যদেহের অপূর্ব রূপলাবণ্যবিধানে অংশ গ্রহণ করে, তখন গুণগ্রাহী পাঠকমাত্রকেই তাঁহার কবি-কৃতির মৌলিকতায় মুগ্ধ হইতে হয়। ভার্জিল, দান্তে ও মিল্টনের অনুকরণে মধুসূদনের যে প্রেতপুরীর বর্ণনা বহুনিন্দিত হইয়া আছে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিয়া বলিতে হয় যে, এই নিকৃষ্ট রচনার মধ্যেও মৌলিকতা একেবারে বিরল নহে। মিল্টনের "Chaos" বর্ণনা অস্পষ্ট ধূমে আচ্ছন্ন। স্পষ্ট ভাষার দ্বারা স্পষ্ট চিত্র সেখানে অঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু মধুসূদনের বর্ণনাভঙ্গিতে সর্বত্র স্পষ্টতা রক্ষিত হইয়াছে, নরকবর্ণনার ছবিটি কোথাও অস্পষ্ট ধূমাচ্ছন্ন হয় নাই। মহামায়াকে দুর্গা হইতে স্বতন্ত্র দেবীরূপে উপস্থাপনা মধুসূদনের নিজস্ব কল্পনা। মাইকেলের মেঘনাদ ও প্রমীলা, বিশেষ করিয়া মাইকেলের মন্দোদরী, কৃত্তিবাসের মেঘনাদ, প্রমীলা ও মন্দোদরী হইতে কতই না বিভিন্ন। কৃত্তিবাসের মন্দোদরী যেখানে পুত্রকে যুদ্ধবিরত রাখিবার জন্য 'পরমা সুন্দরী ন'হাজার নারী'র সেবার প্রলোভন দেখাইতেছেন, সেখানে মাইকেলের মন্দোদরীর মুখে আমরা শুনি,

"যাইবি রে যদি,—রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে রক্ষুণ এ কাল রণে! এই ভিক্ষা করি তাঁর পদযুগে আমি!" চিত্রাঙ্গদার নামটুকু বাদে আর সমস্তই মাইকেলের নিজস্ব সৃষ্টি। রামায়ণের সরমাকে কে মনে রাখে? কিন্তু এখানে সে "সুবর্ণ-দেউটি যেন তুলসীর মূলে"। এত বড়ো যে রাবণ-চরিত্র তাহার ছাঁচই রামায়ণের ছাঁচ নহে। মূলকথা, রামায়ণের রাক্ষস-চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ রাক্ষস-চরিত্র; কিন্তু সৃজনী-প্রতিভার সম্রাট শ্রীমধুসূদনের হাতে সেই সুদূর লঙ্কাবাসী প্রাচীন যুগের রাক্ষস চরিত্রগুলি একেবারেই বর্ত্তমান মার্জিত সভ্যতার যুগের আদর্শ মানব-চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। তাই বলিতে হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন আছে দেশী-বিদেশী প্রভাবের বিস্তারিত পরিচয়, তেমনি ইহার প্রতি ছত্রে লক্ষিত হয় মাইকেলের মৌলিকতার জ্বলন্ত নিদর্শন।

(চ) রস-বিচার

মেঘনাদবধ কাব্যে কোন্ রসের প্রাধান্য, ইহা লইয়া অনেক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। একদল সমালোচকের মতে ইহা বীররসের কাব্য, আবার অন্যদলের মতে ইহা করুণরসের কাব্য। আসল কথা, মূল অনুভূতিটা করুণরসেরই, ব্যঞ্জনায় বীররস ফুটাইবার প্রয়াস লক্ষণীয়। কবি অশ্রুজলে তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়া অশ্রুজলেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। বীরবাহুর শোকে কাতর রাক্ষস-রাজের আর্তনাদের সঙ্গে গ্রন্থের সূচনা, এবং প্রমীলার চিতারোহণে লঙ্কার নর-নারীর করুণ বিলাপের সঙ্গে ইহার শেষ। ইহার আদি, মধ্য এবং অন্ত সমস্তই বিষাদপূর্ণ। সেইজন্যই আমরা বলি যে, মেঘনাদ বধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য বেশী। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন: "অনেকে মেঘনাদবধ কাব্যকে বীররস-প্রবল কাব্য বলিয়াই অবগত আছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘনাদবধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য। বর্ণনীয় বিষয় পাঠান্তে পাঠকের হৃদয়ে যে ভাব স্থায়ী হয়, সেই ভাবের বিচারে মেঘনাদবধকে করুণরস-প্রধান কাব্য বলিয়া নির্দেশ করাই সঙ্গত। যে অশ্রুধারা রাক্ষস-পরিজনদিগের নয়ন হইতে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদিগের বীরবক্ষের শোণিতরেখা ধৌত করিয়া দেয়; হাহাকারে রণকোলাহল নিমগ্ন হইয়া যায়। অধিকাংশ পাঠকই মধুসূদনকে বীররস-বর্ণনায় নিপুণ কবি বলিয়া অবগত আছেন; কিন্তু অশোকবনস্থিতা, মূর্তিমতী বিরহব্যথারূপিণী জানকীর এবং শ্মশান-শয্যায় স্বামীর পদপ্রান্তে উপবিষ্টা নব-বিধবা প্রমীলার অনুপম চিত্র দর্শন করিয়া কে বলিবে যে, মধুসূদন বীররসেরই কবি? মধুসূদনের নিজের জীবনের ন্যায় তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যও করুণ রসাত্মক।"

এই রস-বিচার করিতে বসিয়া একটি কথা স্বভাবত মনে উঠে যে, এত বড় একটা কবি কি তাঁহার সংকল্প ও কার্যের মধ্যে এই যে অসঙ্গতি, এ বিষয়ে আদৌ সচেতন ছিলেন না? "গাইব, মা, বীররসে ভাসি মহাগীত" বলিয়া যে বিরাট আয়োজন-আড়ম্বর তাহা সমস্তই যে করুণরসের প্লাবনে ভাসিয়া গেল, ইহা কি কবি কিছুই ধরিতে পারিলেন না? এত বড় একটা ব্যর্থতারই বা কী এমন কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে পারে? উত্তরের জন্য আমাদের প্রথমে কবির নিজস্ব কথাই খুঁজিতে হইবে। মেঘনাদবধ কাব্য বীররস-প্রধান মহাকাব্য হইবে, ইহাই কবির প্রকাশ্য সংকল্প বটে, কিন্তু তাঁহার বন্ধুকে লিখিত পত্রেই আবার পাওয়া যায়: "You must not, my dear fellow, judge of the work as a regular 'Heroic Poem', I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told." Do not be frightened, my dear fellow, I

won't trouble my reader with **Viraras** (বীররস)।" আবার, আপন লেখনী নিঃসৃত কাহিনীর কারুণ্যে আকৃষ্ট কবির তৃপ্তিভরা উক্তিতেও আছে একটা সঙ্কেত :—"I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for Promila, I never thought, I was such a fellow for the pathetic."

অতএব বুঝিতে হইবে কবির নিজের মধ্যেই এক প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব ছিল; নিজের জীবনের অসাফল্য ও নৈরাশ্যকে চাপিয়া দেশ, জাতি বা ধর্মের গৌরবগান এবং বিরাট বিপুল ও গম্ভীর বস্তুসম্পদের বর্ণনা—এই মহাকাব্যোচিত লক্ষ্যই ছিল তাঁহার লক্ষ্য ; কিন্তু কার্যত ব্যক্তিজীবনের সেই চরম কারুণ্যকে তিনি চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই, এবং এই না পারার লক্ষণ বুঝিয়াই তিনি তাঁহার কাব্যকে বন্ধুদের নিকট পরিচিত করিবার সময় Heroic Poem না বলিয়া 'sacred song' নামেই অভিহিত করিয়াছেন। রাবণ ও মেঘনাদের পরাজয়ের মধ্যে কবির আপন সত্তারই পরাজয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং স্বীয় আদর্শের ব্যর্থতা তাঁহার প্রাণের নিভৃত কোণে যে অশ্রুর উৎসরূপে বিরাজ করিতেছিল মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় গুরুগম্ভীর শব্দ ও বর্ণনার অন্তরালে বহিয়া চলিয়াছে। তাই মেঘনাদ যখন মরিবেই, তখন তাহাকে অন্যায় যুদ্ধে হত হইতেই হইবে, এবং লক্ষ্মণের ন্যায় বিরাট বীরকেই সেই হত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইবে, নচেৎ কবির আত্মা শান্তি পাইবে না।

"মেঘনাদবধ কাব্যের অন্তর্গত এই লিরিক-প্রবৃত্তি যেমন কবির অন্তর্জীবনের পরিচয় বহন করিতেছে, তেমনি আর একদিক দিয়া ইহাতে সেই যুগের বাঙালী চিত্তের প্রতিচ্ছবি রহিয়াছে।" তখনকার সেই শিক্ষিত বাঙালী সমাজের রেনেসাঁসের যুগে দেশী ও বিদেশী আদর্শের যে এক সমন্বয়-সাধন ছিল সকলের আদর্শ, তাহা মধুসূদনের চিত্তকেও প্রবলভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। "য়ুরোপীয় আদর্শকেই তিনি নিঃসংশয়ে বরণ ও ঘোষণা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি বাঙালী জীবন ও বাঙালী সংস্কারের মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সীতা-চরিত্রের প্রেরণামূলক হিন্দু-সংস্কার জয়ী হইয়াছে ; বীরাঙ্গনা প্রমীলাও, বাঙালী গৃহস্থ-বধূর স্নিগ্ধ শোভায় তাহার উগ্র নারীমহিমার ভাস্বরচ্ছটা সম্বরণ করিয়াছে। ইহারই ফলে, মেঘনাদবধ কাব্যের বীর চরিত্রগুলিও উন্নত পর্বতচূড়ার মত কঠোর অটলতা লাভ করে নাই। রাবণের সকল দুঃখ, সকল পরাজয়ের মূল তাহার স্নেহশীলতা ; রামের তো কথাই নাই—সে চরিত্র ভ্রাতৃস্নেহের অত্যধিক প্রাবল্যে পৌরুষের শেষ লক্ষণটুকুও হারাইয়াছে ; এমন কি রাজ্যলোভী গৃহ-শত্রু বিভীষণ—যে একই উপায়ে স্বার্থ ও পরমার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়াছে, যাহার চক্রান্তে ও সহায়তায় মেঘনাদ হত হইল—সেও মৃত্যুশয্যাশায়ী ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখপানে চাহিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠে ; ধর্মবিশ্বাস ও স্বার্থনিষ্ঠা—কিছুই তাহাকে কঠোর করিতে পারে নাই। এইজন্যই হোমর-মিল্টন হইতে গিয়াও মধুসূদন বাঙালীর কবি হইয়াই রহিলেন।"

তাই মেঘনাদবধের রস-বিচারে রস-প্রাধান্যনির্ণয়ে মতানৈক্যের কোন অবসর নাই। বীররস ইহার আবরণ ও আভরণ মাত্র, দেহখানি করুণরসেই অভিসিঞ্চিত। কাব্যখানি যেন একেবারে মাইকেলেরই প্রতিচ্ছবি ;—উপরে হ্যাট-বুট-কোট-প্যাণ্টে পুরা সাহেব, কিন্তু ভিতরে সেই স্নেহকোমল বাঙলা মায়ের দরদী সন্তান। কাব্য কবির অন্তর হইতেই উৎসারিত হয়, তাই অন্তরের কোমলতা-কারুণ্যের ধারা এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে ক্ষরিত হইয়াছে। তবে আবরণই হোক, আর, আভরণই

হোক, যতটুকু বীররস এখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমকক্ষ বাংলা কাব্যের আর কুত্রাপি এখনও দেখা যায় নাই। হয়ত দীর্ঘতর জীবন পাইলে কবির স্বপ্ন সত্যই সফল হইতে পারিত, কারণ "মধুসূদনের মত প্রচণ্ড potential প্রতিভা আমাদের দেশের কেন, যে কোন দেশের ইতিহাসে সুদুর্লভ। মধুসূদন যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহার সম্ভাবনা যেমন বিরাট ছিল পরিণতি তেমন ফলবান্ হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই, তাই প্রতিভার তুলনায় তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি পর্যাপ্ত ও সুষম হয় নাই। যে মহাকাব্য লিখিবার জন্য তিনি pucca fist-এর অপেক্ষায় ছিলেন তাহা আভাসেই রহিয়া গিয়াছে। মধুসূদন সেই অলিখিত মহাকাব্যের মহাকবি।"

(ছ) উপসংহার

পরিশেষে একটি কথা বলিবার আছে। মেঘনাদবধ কাব্য একদিনেই কবিকে যশস্বী করিয়া তোলে নাই। নিন্দা ও উপহাসের ভিতর দিয়া এই কাব্য তাহার পথ করিয়া লইয়াছে। খৃষ্টান হইয়া মধুসূদন বাঙালীর নিকট যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সারাজীবনের অশান্তি ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া কবি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। জীবনে ও কাব্যে এক নূতন আদর্শের সন্ধান করিতে গিয়া এই অশান্ত প্রতিভা বঙ্গভারতীর চরণে যে কাব্যাঞ্জলি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে আমরা উপহাস করিলেও কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিব না। উপহাসে তাঁহার কবি-প্রতিভাকে হয়ত ব্যঙ্গ করা যায়, কিন্তু বিচার করা যায় না। মাইকেল-প্রতিভার অনুরাগী স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়ঃ "ঐ একটা অদ্ভুত জিনিয়াস্ তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত কাব্য তোদের বাংলাভাষাতে ত নাই-ই, ভারতবর্ষেও এমন একখানা কাব্য ইদানীং দুর্লভ। কিন্তু তোদের দেশে কেউ একটা নূতন কিছু করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস্। বলি, আগে ভাল করে দেখ্না, লোকটা কি বল্ছে। ...তা না এই মেঘনাদবধ কাব্য, যা তোদের বাংলাভাষার মুকুটমণি, তাকে অপদস্থ করতে কিনা 'ছুঁচোবধ কাব্য' লেখা হলো। তা যত পারিস্, লেখ্না, তাতে কি। সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনো হিমাচলের মত আকাশ ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার খুঁত ধরতে যারা ব্যস্ত ছিল, সে-সব critic-দের মত ও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গেছে।" মাইকেলের সৃষ্টি কালোত্তীর্ণ হইয়া শাশ্বত স্থান লাভ করিয়াছে। কাব্যবিচারে ইহার দোষ-গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে ইহা যে অতুলনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এবং রস-বিচারে, বিশেষ করিয়া বীর ও করুণ-রসের অভিব্যক্তিতে বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য এখনও পর্যন্ত অদ্বিতীয়।

৭। মেঘনাদবধ কাব্যে চরিত্রসৃষ্টি

মেঘনাদবধ কাব্যের যাহা স্থাপত্য-সুষমা, তাহার মূলে আছে চরিত্র-সৃজনে কবিকল্পনার অবাধ বিলাস। মাইকেলের এই বলিষ্ঠ কল্পনা উৎসারিত হইয়াছে দুকূলপ্লাবী প্রচণ্ড প্রাণশক্তির কেন্দ্র হইতে; তাই এই কল্পনা মহাকাব্যসঞ্চারী হইতে পারিয়াছে, সামান্য কবিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। মেঘনাদবধ রামায়ণের চিরপরিচিত, পুরাতন কথা অবলম্বনে রচিত। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের রচনার মূল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে লইয়া থাকেন, এবং নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে পরিবর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নূতন অর্থারোপ করিয়া থাকেন। এই

সব প্রক্রিয়ার দ্বারা পুরাতন কাহিনী তাঁহাদের স্বকীয় প্রতিভার স্পর্শে মহিমান্বিত হইয়া উঠে এবং এই স্বকীয়তার মধ্যে কবির বিশেষ পরিচয় থাকিয়া যায়। মহাভারত হইতে কালিদাস শকুন্তলার কাহিনী লইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শকুন্তলা ও মহাভারতের শকুন্তলা স্বরূপত ভিন্ন। মাইকেলের মেঘনাদ বাল্মীকির মেঘনাদ হইতে স্বতন্ত্র। শুধু মেঘনাদ কেন, মেঘনাদবধ কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্রসৃষ্টিতে মধুসূদন নানাভাবে নিজস্ব পরিচয় দিয়াছেন।

প্রাচীন কবিগণের সহিত অর্বাচীন কালের কবিগণের প্রভেদ এইখানেই। প্রাচীন ও অর্বাচীন কাব্যে মূল প্রভেদটি এইখানেই, একটিতে কবির পরিচয় আছে, অপরটিতে নাই, বা থাকিলেও নিতান্ত প্রচ্ছন্ন। হোমরের কাব্যে আর সকলকেই পাই কেবল হোমরকেই পাই না। দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়াতে দান্তেকে সর্বাগ্রে পাই—বস্তুতঃ তাঁহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমগ্রটি তুলিয়া রহিয়াছে। অন্যদিকে 'প্যারাডাইস লষ্ট' কাব্যের নিরপেক্ষতার ভান সত্ত্বেও মিল্টনের পিউরিটান রুচি ও সৌন্দর্যবিলাসী কবিপ্রকৃতি দুই-ই বিদ্যমান। তেমনি মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে যে রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করি, তাহা ঘটিয়াছে কতকটা কালের ধর্মে এবং কতকটা কবিপ্রকৃতির প্রচণ্ড উদ্দামতার প্রভাবে। তাহার উপর, প্রাচীন কাব্য প্রধানতঃ জগন্ময় (objective), অর্বাচীন কাব্য প্রধানতঃ মন্ময় (subjective)—পৃথিবীর কাব্যপ্রবাহ জগন্ময়তা হইতে মন্ময়তার অভিমুখে চলিয়াছে। আর এই মন্ময়তার প্রভাবে অর্বাচীন কাব্যে অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে, প্রাচীন কাব্যে যাহার অস্তিত্ব ছিল না বলিলেও হয়, বা হয়ত বীজাকারে মাত্র ছিল। অর্বাচীন কালের কবি হিসাবে মাইকেলের কাব্যে কালের ধর্ম বা বিশেষ স্বভাবের পরিচয় তো থাকিবেই। এখন মাইকেলের কালের ধর্মের সহিত তাঁহার নিজস্ব কবিধর্ম যুক্ত করিলেই তাঁহার কাব্যের স্বরূপ এবং সেই সঙ্গে চরিত্র-সৃষ্টির মৌলিকতা বুঝিতে পারা যাইবে।"

চিত্রাঙ্গদা

প্রথমে "চিত্রাঙ্গদার" কথা আলোচনা করিব। কাব্যের প্রারম্ভেই ইহার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে—বীরবাহুর জননী, রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা তাঁহার একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে শোকাকুলচিত্তে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। বীররসের ন্যায় করুণরসের উদ্দীপনেও মধুসূদন কিরূপ নিপুণ ছিলেন, এই দৃশ্যটি তাহার পরিচায়ক। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের করুণরস যে কেবলই করুণ তাহা নহে, রীতিমত একটি যুগ্মস্রোতে চরিত্রখানি ভাসিয়া চলিয়াছে, এবং এককথায় তাহাকে বলিতে হয় বীর-গর্ভ-করুণ। উপরে একটি অসহায়া উপেক্ষিতা নারীর বক্ষোভেদী বিলাপ, কিন্তু ভিতরে শুনা যায় এক দলিত ফণিনীর ক্রুদ্ধ শ্বাস। যে কারুণ্যপূর্ণ ভাষায় চিত্রাঙ্গদা রাবণের নিকট নিজের হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়। রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া যখন বলিলেন:

"বীরমাতা তুমি;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন?"

তখন চিত্রাঙ্গদার পক্ষে এই সান্ত্বনা তৃপ্তিপ্রদ হইল না। সন্তানকে স্বদেশের কল্যাণের জন্য ধর্মযুদ্ধে নিহত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে সান্ত্বনা আসিতে পারে সত্য; কিন্তু অপরের পাপ-তৃষারূপ অগ্নিতে হৃদয়ের ধনকে আহুতিরূপে অর্পিত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে যে যন্ত্রণা হয়, তাহা কে বুঝিবে? সুগন্ধি কুসুম যখন দেবতার উদ্দেশে হোমানলে অর্পিত হয়, তখন তাহার পুষ্পজন্ম সফল হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই ফুল যখন প্রচণ্ড দাবানলে ভস্মীভূত হয়, তখন তাহা কেবল ক্ষোভেরই কারণ হইয়া উঠে। বীরবাহুর মৃত্যুতে যে একটি উৎকৃষ্ট বীরত্ব-কুসুম অপচিত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়াই চিত্রাঙ্গদার শোকাকুল চিত্ত স্বামীর কথায় সান্ত্বনা মানিল না। যে অগ্নিকুণ্ডে বীরবাহু সমর্পিত হইয়াছিল, তাহা হোমানল নয়, লঙ্কেশ্বরের অসংযত বাসনারূপ দাবানলই তাহার প্রকৃত পরিচয়। মায়ের প্রাণ শান্তি মানিবে কেন? পাপাচারী স্বামীর বিরুদ্ধে এতকাল তাঁহার অন্তরে জমিয়াছিল এই পর্বতপ্রমাণ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা; পত্নী হইয়া বাঁচিবার হয়ত কোন সাধই তাঁহার ছিল না, কেবল মা হইয়াই তাঁহাকে বাঁচিতে হইয়াছে। আজ যখন তাঁহার বিক্ষুব্ধ জীবনের সেই অবলম্বনটুকু খসিয়া গেল, তখন বাঁধভাঙা স্রোতের ন্যায় পুত্রশোকের মধ্যে সেই চিরসঞ্চিত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধাও মাথা তুলিতে ছাড়িল না, এবং ইহা হইতেই দেখা দিল এমন এক দৃপ্ততেজ যাহার বলে সামান্যা নারী চিত্রাঙ্গদা কর্বুরাধিপতি দশাননকে আসামীর ন্যায় দাঁড় করাইয়া তাঁহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। "বীরকর্ম্মে হত পুত্র"—রাবণের এই উক্তির ভণ্ডামি তাঁহার পক্ষে অসহ্য। জ্বালাময় বাক্যস্রোতে তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, লঙ্কাসমরের একমাত্র কারণ রাবণের পাপ-প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। ক্ষুরধার কণ্ঠে তাই তিনি জেরার পর জেরা করিতে লাগিলেন:

"কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ রাজা, এসেছে এ দেশে,
রাঘব? * * *
তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশ-রিপু
কেন তারে বল, বলি?"

রাম রাবণের পক্ষে চক্ষুশূল হইতে পারেন, কারণ তাঁহার পাপ-লালসা চরিতার্থ করিবার পথে রাম বিঘ্ন ঘটাইতে আসিয়াছেন! কিন্তু সকলে কেন তাঁহাকে শত্রু মনে করিবে? কেন তবে তিনি এক সর্বধ্বংসী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তাহার জবাব চিত্রাঙ্গদা না চাহিতেই দিলেন:

"কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।"

সুতরাং দেখা যায়, লঙ্কাপুরীর আর সকলে যখন রাবণের সমরায়োজনে সহযোগিতা করিতে প্রাণপণ করিয়াছে, তখন রাবণেরই অন্যতমা মহিষী এই সমরের কার্য-কারণ ও ন্যায়ান্যায়ের খতিয়ান একেবারে রাক্ষসরাজের সম্মুখেই তুলিয়া ধরিলেন। তিনি যেন এখন জীবনের শেষের পথে, 'শেষের পথে কিসের

বল ভয়?' তিনি ছাড়িবেন না, তাঁহার প্রশ্নের মধ্যে রহিয়াছে এক উলঙ্গ নির্মম সত্য। তিনি সেই সত্য কথার একটি সোজা উত্তর চাহেন :

"কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে?

কিন্তু পাপমগ্ন স্বামীর যে জবাব দেওয়ার কিছুই নাই তাহা তিনি জানেন, তাই সভাত্যাগের পূর্বে নিজেই বিচার-পর্ব সমাধা করিতে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গেলেন :

"হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!"

তাই বলিতে হয়, চিত্রাঙ্গদায় আমরা যাঁহাকে পাই, তিনি কেবল বীরবাহুর জননী নহেন, বীরবাহুর বীরজননী,—করুণরস-সায়রে একটি অনুপম বীরাঙ্গনা-শতদল। সুশীতল বারিধারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াও মেঘ যেমন বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করে, পতিপরায়ণার হৃদয়, স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ হইলেও, অবস্থা-বিশেষে যে তেমনি তাহা হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা নির্গত হয়, চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে কবি ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এই চিত্র বাল্মীকির রামায়ণে নাই, ইহা মধুসূদনের সৃষ্টি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে চিত্রাঙ্গদার উল্লেখ মাত্র আছে। কিন্তু এখানে রাবণের অবস্থা পরিস্ফুট করিবার জন্য চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। কেন তাহা বলিতেছি।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াই রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাঁহাকে পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। পাপ গোপন করিবার প্রবৃত্তির ন্যায়, যে কোন উপায়ে হউক, পাপাচারের সমর্থন করিবারও প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে বড় প্রবল। সীতাহরণরূপ দুষ্কার্যের জন্য রাবণ মাঝে মাঝে আপনাকে ধিক্কার দিতেন; কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাঁহার সাহস হইত না। বরং আত্মবঞ্চকের ন্যায় নিজের হৃদয়কে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেন যে, তাঁহার নিজের কোন অপরাধ নাই, ভগিনী সূর্পণখার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই তিনি এই দুষ্কার্য করিয়াছেন। কিন্তু রাবণকে তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনের জন্য চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের অবতারণা; রাবণ যখন চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে বলিলেন, "তোমার বীরপুত্র, দেশের শত্রুকে বিনাশ করিয়া স্বর্গে গিয়াছে; তুমি বীরমাতা, তোমার পক্ষে শোকে কাতর হওয়া শোভা পায় না", চিত্রাঙ্গদা তাহাতে প্রবোধ না মানিয়া স্বামীকেই তিরস্কার করিয়া বলিলেন :

"কে, কহ, এ কাল অগ্নি জালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে?"

আত্মদ্রোহী রাবণ স্ত্রীর নিকট সহানুভূতি পাইলেন না। সেইজন্য বলিতেছিলাম, চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের অবতারণা করিয়া, মধুসূদন যন্ত্রণা-নিপীড়িত রাক্ষসরাজের অবস্থা সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন।

মন্দোদরী

লঙ্কার অন্তঃপুরে অপর যে নারীচরিত্রটি একেবারে চিত্রাঙ্গদার পাশাপাশি পাওয়া যায়, তিনি হইলেন "মন্দোদরী"। উভয়েই রাবণের মহিষী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য! চিত্রাঙ্গদার

তখন চিত্রাঙ্গদার পক্ষে এই সান্ত্বনা তৃপ্তিপ্রদ হইল না। সন্তানকে স্বদেশের কল্যাণের জন্য ধর্মযুদ্ধে নিহত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে সান্ত্বনা আসিতে পারে সত্য; কিন্তু অপরের পাপ-তৃষারূপ অগ্নিতে হৃদয়ের ধনকে আহুতিরূপে অর্পিত হইতে দেখিলে বীরজননীর প্রাণে যে যন্ত্রণা হয়, তাহা কে বুঝিবে? সুগন্ধি কুসুম যখন দেবতার উদ্দেশে হোমানলে অর্পিত হয়, তখন তাহার পুষ্পজন্ম সফল হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই ফুল যখন প্রচণ্ড দাবানলে ভস্মীভূত হয়, তখন তাহা কেবল ক্ষোভেরই কারণ হইয়া উঠে। বীরবাহুর মৃত্যুতে যে একটি উৎকৃষ্ট বীরত্ব-কুসুম অপচিত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়াই চিত্রাঙ্গদার শোকাকুল চিত্ত স্বামীর কথায় সান্ত্বনা মানিল না। যে অগ্নিকুণ্ডে বীরবাহু সমর্পিত হইয়াছিল, তাহা হোমানল নয়, লঙ্কেশ্বরের অসংযত বাসনারূপ দাবানলই তাহার প্রকৃত পরিচয়। মায়ের প্রাণ শান্তি মানিবে কেন? পাপাচারী স্বামীর বিরুদ্ধে এতকাল তাঁহার অন্তরে জমিয়াছিল এই পর্বতপ্রমাণ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা; পত্নী হইয়া বাঁচিবার হয়ত কোন সাধই তাঁহার ছিল না, কেবল মা হইয়াই তাঁহাকে বাঁচিতে হইয়াছে। আজ যখন তাঁহার বিক্ষুব্ধ জীবনের সেই অবলম্বনটুকু খসিয়া গেল, তখন বাঁধভাঙা স্রোতের ন্যায় পুত্রশোকের মধ্যে সেই চিরসঞ্চিত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধাও মাথা তুলিতে ছাড়িল না, এবং ইহা হইতেই দেখা দিল এমন এক দৃপ্ততেজ যাহার বলে সামান্যা নারী চিত্রাঙ্গদা কর্বুরাধিপতি দশাননকে আসামীর ন্যায় দাঁড় করাইয়া তাঁহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। "বীরকর্ম্মে হত পুত্র"—রাবণের এই উক্তির ভণ্ডামি তাঁহার পক্ষে অসহ্য। জ্বালাময় বাক্যস্রোতে তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, লঙ্কাসমরের একমাত্র কারণ রাবণের পাপ-প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। ক্ষুরধার কণ্ঠে তাই তিনি জেরার পর জেরা করিতে লাগিলেন:

"কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ রাজা, এসেছে এ দেশে,
রাঘব? * * *
তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশ-রিপু
কেন তারে বল, বলি?"

রাম রাবণের পক্ষে চক্ষুশূল হইতে পারেন, কারণ তাঁহার পাপ-লালসা চরিতার্থ করিবার পথে রাম বিঘ্ন ঘটাইতে আসিয়াছেন! কিন্তু সকলে কেন তাঁহাকে শত্রু মনে করিবে? কেন তবে তিনি এক সর্বধ্বংসী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তাহার জবাব চিত্রাঙ্গদা না চাহিতেই দিলেন:

"কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।"

সুতরাং দেখা যায়, লঙ্কাপুরীর আর সকলে যখন রাবণের সমরায়োজনে সহযোগিতা করিতে প্রাণপণ করিয়াছে, তখন রাবণেরই অন্যতমা মহিষী এই সমরের কার্য-কারণ ও ন্যায়ান্যায়ের খতিয়ান একেবারে রাক্ষসরাজের সম্মুখেই তুলিয়া ধরিলেন। তিনি যেন এখন জীবনের শেষের পথে, 'শেষের পথে কিসের

বল ভয় ?' তিনি ছাড়িবেন না, তাঁহার প্রশ্নের মধ্যে রহিয়াছে এক উলঙ্গ নির্মম সত্য। তিনি সেই সত্য কথার একটি সোজা উত্তর চাহেন :

"কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ?

কিন্তু পাপমগ্ন স্বামীর যে জবাব দেওয়ার কিছুই নাই তাহা তিনি জানেন, তাই সভাত্যাগের পূর্বে নিজেই বিচার-পর্ব সমাধা করিতে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গেলেন :

"হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !"

তাই বলিতে হয়, চিত্রাঙ্গদায় আমরা যাঁহাকে পাই, তিনি কেবল বীরবাহুর জননী নহেন, বীরবাহুর বীরজননী,—করুণরস-সায়রে একটি অনুপম বীরাঙ্গনা-শতদল। সুশীতল বারিধারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াও মেঘ যেমন বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করে, পতিপরায়ণার হৃদয়, স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ হইলেও, অবস্থা-বিশেষে যে তেমনি তাহা হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা নির্গত হয়, চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে কবি ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এই চিত্র বাল্মীকির রামায়ণে নাই, ইহা মধুসূদনের সৃষ্টি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে চিত্রাঙ্গদার উল্লেখ মাত্র আছে। কিন্তু এখানে রাবণের অবস্থা পরিস্ফুট করিবার জন্য চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। কেন তাহা বলিতেছি।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াই রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিলেন। বিধাতা যদিও তাঁহাকে পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। পাপ গোপন করিবার প্রবৃত্তির ন্যায়, যে কোন উপায়ে হউক, পাপাচারের সমর্থন করিবারও প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয়ে বড় প্রবল। সীতাহরণরূপ দুষ্কার্যের জন্য রাবণ মাঝে মাঝে আপনাকে ধিক্কার দিতেন ; কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাঁহার সাহস হইত না। বরং আত্মবঞ্চকের ন্যায় নিজের হৃদয়কে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেন যে, তাঁহার নিজের কোন অপরাধ নাই, ভগিনী সূর্পণখার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই তিনি এই দুষ্কার্য করিয়াছেন। কিন্তু রাবণকে তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনের জন্য চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের অবতারণা ; রাবণ যখন চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে বলিলেন, "তোমার বীরপুত্র, দেশের শত্রুকে বিনাশ করিয়া স্বর্গে গিয়াছে ; তুমি বীরমাতা, তোমার পক্ষে শোকে কাতর হওয়া শোভা পায় না", চিত্রাঙ্গদা তাহাতে প্রবোধ না মানিয়া স্বামীকেই তিরস্কার করিয়া বলিলেন :

"কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ?"

আত্মদ্রোহী রাবণ স্ত্রীর নিকট সহানুভূতি পাইলেন না। সেইজন্য বলিতেছিলাম, চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের অবতারণা করিয়া, মধুসূদন যন্ত্রণা-নিপীড়িত রাক্ষসরাজের অবস্থা সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন।

মন্দোদরী

লঙ্কার অন্তঃপুরে অপর যে নারীচরিত্রটি একেবারে চিত্রাঙ্গদার পাশাপাশি পাওয়া যায়, তিনি হইলেন "মন্দোদরী"। উভয়েই রাবণের মহিষী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য! চিত্রাঙ্গদার

মধ্যে তবু এমন কিছু আছে—যাহা যত মহনীয় বরণীয় হোক—ঠিক বাঙালীর ঘরে আশা করা যায় না। কিন্তু মন্দোদরী একটি আদর্শ বঙ্গনারী। বাঙালীর মাতৃত্বের মহিমায় মহীয়সী এই নারী মাইকেলের অপূর্ব সৃষ্টি। ভীষণ রাক্ষসপুরীর মধ্যে যখন যুদ্ধের ডামাডোল বাজিয়া উঠিয়াছে তখন আমাদের কবি যে কী ক্ষমতাবলে সমস্ত সমরায়োজন ভেদ করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে অবস্থিত এই শাশ্বত জননীকে আবিষ্কার করিয়া আমাদের উপহার দিলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। চিত্রাঙ্গদাও মাতা, কিন্তু সেখানে মন্দোদরীর ন্যায় মাতৃত্বের বিশালতা, পূর্ণতা ও মহনীয়তা নাই, উহার একটিমাত্র আঙ্গিকের বিচ্ছিন্নবিকাশই তাঁহার একমাত্র গর্ব। কিন্তু মেঘনাদ-জননী মন্দোদরী কেবল মেঘনাদেরই জননী নহেন,—"তারাকিরীটিনী-নিশিসদৃশী আপনি রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী!"—পুত্র মেঘনাদ এই নিশির 'শরদিন্দু', এবং পুত্রবধূ প্রমীলা ইহার 'শারদ কৌমুদী'; কিন্তু তারা-সদৃশ আরও অনেকেরই তিনি ধাত্রী। ধৃতিরূপিণী এই নারী তাই কেবল লঙ্কেশ্বরী নহেন, লঙ্কার জননীও বটে। তিনি যখন বিভীষণ সম্বন্ধে বলেন, "এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্মতি"—তখন তাঁহার মুখের এই একটি কথা 'মোর'—সমগ্র লঙ্কাপুরীর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ—শুধুই কর্তৃত্বের নয়, তাঁহার অপরিসীম মমত্বের অধিকার,—অতি সহজেই ব্যক্ত করে।

মন্দোদরী শুধুই পুত্রের জননী নহেন, রাবণের গৃহিণী—তাঁহার সহধর্মিণী। সমস্ত রাক্ষসপুরী ও রাক্ষস-পরিবারের কল্যাণ-চিন্তা, রাজ্যের শুভাশুভ, স্বামীর সম্পদ-বিপদের ভাবনা তাঁহাকে ভত্রিণীযোগ্য গুরুভার মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছে। বাৎসল্যে, পাতিব্রত্যে ও সংসারধর্মপালনে তিনি সর্বদাই আত্মতৃপ্ত। 'তাঁহার এখন সেই বয়স, যে বয়সে জননীরূপিণী নারী কেবল মাতৃত্বের সুখে ও গৌরবে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত—যেন তাহার পাইবার আর কিছুই নাই, এখন কেবল দিবার পালা আসিয়াছে।' স্বামীর বিপদে স্বামীকে দুর্বুদ্ধির জন্য তিরস্কার করা তাঁহার কাজ নহে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া সেই বিপদের ভাগ লওয়াই তাঁহার কাজ। প্রিয়তম পুত্র মেঘনাদ কাল-সমরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, আশঙ্কায় মন্দোদরীর অন্তর উৎকণ্ঠিত, তিনি কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? নিয়ত পুত্রের কল্যাণ-কামনায় শিবের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। খাঁটি বাঙালী মায়ের মত ব্রত উপবাস প্রার্থনাদি দ্বারা সেই বিপদ কাটাইবার জন্য আত্মনিগ্রহের কঠিন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, নিছক মাতৃহৃদয়ের আকুলতাই তাঁহার এই চরম বিপদের দিনে বিশ্বস্তর আশ্রয়স্বরূপ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই মন্দোদরীর আমরা কোন সন্ধানই পাই না। সেখানকার মন্দোদরী রীতিমত রাক্ষস-নারী, রাক্ষসোচিত রুচি অনুযায়ী সে মেঘনাদকে যুদ্ধবিরত করিবার জন্য "ন' হাজার পরমা সুন্দরী নারীর" প্রলোভন দেখাইয়াছে। পক্ষান্তরে অনুরূপ ক্ষেত্রে মাইকেলের মন্দোদরী পুত্রের যুদ্ধগমনে যথেষ্ট কাতর হইলেও অবশেষে তাঁহার বিদায়-বাণীতে বলিতেছেন, "যাইবি রে যদি, রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে রক্ষুণ এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি তাঁর পদযুগে আমি।" মাতৃ-চরিত্রের এই সমুন্নতিসাধন মাইকেল প্রতিভারই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বারুণী

"বারুণী"-চরিত্রের পরিকল্পনা মধুসূদনের আর একটি নিজস্ব সৃষ্টি। রাক্ষস বীরগণের পদভরে লঙ্কাপুরী বিকম্পিত হওয়াতে অসহিষ্ণু জলনিধি গর্জন করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার তরঙ্গাভিঘাতে

জলাধিষ্ঠাত্রী বারুণীদেবীর মুক্তাময়ী গৃহচূড়া মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিল। অকস্মাৎ এইরূপ উপপ্লবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি লঙ্কেশ্বরের সমর-সজ্জার বিষয় অবগত হইলেন এবং যুদ্ধের বিবরণ জানিবার জন্য স্বীয় সখী মুরলাকে লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর নিকট পাঠাইলেন।

মেঘনাদবধের এই বারুণী-চরিত্র হিন্দুপুরাণানুমোদিত নহে। হোমরের থেটিস হইতে মিল্‌টন তাঁহার 'কোমাস' কাব্যের স্যাব্রিনার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইকেলের বারুণী-চরিত্র এই স্যাব্রিনা হইতে কল্পিত। সমুদ্রের সঙ্গে সমরপ্রিয় বায়ুদলের যুদ্ধ এবং বায়ুরাজ প্রভঞ্জনের বিষয় গ্রীক-পুরাণের 'ইওলাস্ য়্যাণ্ড উইণ্ডস্' হইতে গৃহীত। (মধুসূদন নিজে বলিয়াছেন গ্রীক দেবদেবীর তিনি পরিচয় দিবেন হিন্দু-দেবদেবীর পোষাকে। কত নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে—তাঁহার এই উক্তির সার্থকতা লাভের ভিতর, তাহা-ই ভাবিবার বিষয়।) মুরলা নামটি কবি সম্ভবতঃউত্তর-রামচরিত হইতে লইয়া থাকিবেন।

প্রমীলা

"প্রমীলা" মাইকেলের চরিত্রসৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মেঘনাদের জীবনের ঐশ্বর্য ও মৃত্যুর মহিমা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার জন্য কবি প্রমীলা-চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্য বীর ও করুণরসপ্রধান, কিন্তু ইহার মধ্যে যে জিনিসটি সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জল হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইল গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতা। প্রমীলা, সীতা, সরমা এবং মন্দোদরী, এই চারিটি চরিত্রের প্রসঙ্গে কবি ইহা পরিস্ফুট করিয়াছেন নিপুণভাবে।

মেঘনাদ রথে উঠিবেন, এমন সময় পতিগতপ্রাণা প্রমীলা আসিয়া তাঁহার হাত দুইখানি ধরিলেন। যে ভাবী অমঙ্গলরূপ মেঘ ইন্দ্রজিতের জীবনাকাশে সঞ্চারিত হইতেছিল, সাধ্বীর কোমল হৃদয়ে বুঝি পূর্ব হইতেই তাহার ছায়াপাত ঘটিয়াছে। প্রমীলাচরিত্রটির আংশিক পরিকল্পনায় কবি 'হেক্টরবধ' কাব্যের হেক্টর-পত্নী এণ্ড্রোমেকীকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি স্বকীয় কল্পনার রঙে তিনি এই চিত্রটি এমন বর্ণাঢ্য করিয়া আঁকিয়াছেন যে, সমগ্র কাব্যখানিতে প্রমীলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে নিজের রূপৈশ্বর্যের মহিমায়।

মেঘনাদবধ কাব্যের নায়িকা প্রমীলা। মেঘনাদের তিনি উপযুক্ত পত্নী। প্রমীলা বীর্যে ভৈরবী, কিন্তু কোমলতায় কুলবধূর আদর্শস্থানীয়া। কোমলা ব্রততীর ন্যায় স্বামীকে অবলম্বন করিয়াই তিনি জীবিতা। কিন্তু, অবস্থা বিশেষে, তিনি যে বীরপতির সহচারিণী হইবার উপযুক্তা, তাহারও পরিচয় দানে পরাঙ্মুখী নহেন। প্রমীলা-চরিত্র-রচনার প্রেরণা মাইকেল প্রধানতঃ পাইয়াছিলেন ট্যাসোর "জেরুজালেম-উদ্ধার" হইতে। প্রমোদ-উদ্যানে স্বামীর সহিত ক্রীড়াপরায়ণা প্রমীলার যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহা সৌন্দর্যে অতুলনীয়। ট্যাসোর কাব্যের ষোড়শ সর্গ হইতেই কবি ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রমীলা ও মেঘনাদকে প্রমোদ-উদ্যানে দেখিয়া আমাদিগের কুহকিনী আর্মিডার ও প্রমোদ-নিরত রাইনাল্ডোর কথা স্মরণ হয়; এবং আর্মিডার পুরীর ন্যায় প্রমীলার পুরীও মায়ানির্মিত বলিয়া ভ্রম জন্মে।

ট্যাসোর কাব্য হইতে মধুসূদন যদিও তাঁহার প্রমীলা-চরিত্র-সৃষ্টিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তথাপি ইহার গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার নিজের। প্রমীলা তাঁহার কবি-কল্পনার মৌলিক চিত্র। প্রথম সর্গে প্রমীলা অশ্রুসিক্তা এবং যুদ্ধগামী পতিকে বিদায়দানে কুণ্ঠিতা। চরিত্রটির এই অংশে কোন নূতনত্ব নাই; কোমলতাময়ী কুলবধূর পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, কবি ইহাতে কেবল তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কুলবধূর কোমলতার সঙ্গে বীরাঙ্গনার শৌর্যের সম্মিলনেই প্রমীলা-চরিত্রের নূতনত্ব। তৃতীয় সর্গ হইতে কবি প্রমীলা-চরিত্রের এই নূতনত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিতে মেঘনাদের বিলম্ব দেখিয়া প্রমীলার প্রাণ অধীর হইল। ভাবী বিপদের ছায়া অতি প্রগাঢ়ভাবে সাধ্বীর হৃদয়াকাশে পড়িয়াছিল। পতির বিপদাশঙ্কা বুঝিলে সাধ্বীর প্রাণ পৃথিবীর এমন কোন বিপদ নাই যাহার সম্মুখীন হইতে ভীত হয়। প্রমীলা যখন সখী বাসন্তীকে বলিলেন, "চল সখি লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে," তখন বাসন্তীর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। বাসন্তী প্রমীলাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিয়া বাধা দিতে চহিলে তেজস্বিনী প্রমীলার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল:

"দানব নন্দিনী আমি রক্ষকুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?"

প্রমীলার যে প্রমোদ-উদ্যান বেণু-বীণা-ঝঙ্কারে মুখরিত থাকিত, মুহূর্তমধ্যে তাহা সমরকোলাহলে পূর্ণ হইল। প্রমীলা বীরসাজে সাজিয়া যুদ্ধে চলিলেন—রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বীরনারী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। দূতীমুখে তিনি রামচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন—হয় যুদ্ধ, না হয় লঙ্কাপুরে প্রবেশের পথ প্রার্থনা করি। রামচন্দ্র পথই দিলেন, যুদ্ধ করিলেন না। সঙ্গিনীদের লইয়া প্রমীলা বীরদর্পে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

এইভাবে প্রমীলা-চরিত্রের মধ্যে নারীর দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক পরিচয় উদ্ঘাটন করা যায়। এখানে বিপদ হইল, স্রষ্টার সৃষ্টি-নৈপুণ্য সকলে নিঃশেষে নাও বুঝিতে পারেন। ইদানীং কালের সস্তা সমালোচনার দিনে আশঙ্কা হয় যে, প্রমীলা-চরিত্রের বিশ্লেষণে একদিকে যখন ভারতীয় শান্ত-মধুর কুলবধূর কোমলতা ও অপরদিকে অভারতীয় বীরাঙ্গনার শৌর্য-তেজ পাওয়া যাইতেছে, তখন সমালোচক মধুসূদনকে এই ভারতীয় ও অভারতীয় কয়েকটি বিখ্যাত প্রাচীন নারী-চরিত্রের আদর্শানুকারী বলিয়াই ছাড়িয়া দিবেন এবং দুই বিভিন্ন আদর্শের নমুনাস্বরূপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য হইতে নারী-চরিত্রের এক সুদীর্ঘ তালিকাও পেশ করিবেন। কিন্তু একই নারী যদি কখনও কুলবধূ ও কখনও বীরাঙ্গনার ন্যায় আচরণ করে তবে কি তাহা বড়ই বিসদৃশ ঠেকে না? এমন একটা জোড়াতাড়া দেওয়ার কল্পনাটাই যে অপ্রাকৃত। অথচ প্রমীলা-চরিত্রকে যিনি অপ্রাকৃত বলিবেন, বুঝিতে হইবে তাঁহার এখনও রসবোধ জাগে নাই। আসল কথা হইল, প্রমীলার মধ্যে আমরা দেশী-বিদেশী বহু প্রখ্যাত নারী চরিত্রের আভাস পাইতে পারি, কিন্তু সমন্বয়ের যাদুপ্রভাবে প্রমীলা সকলের মধ্যে অনন্যা; তাহার মধ্যে অনেককে পাওয়া গেলেও, কাহারও মধ্যে তাহাকে পাওয়া যায় না। এ রহস্যের চাবি কাঠি হইল—, প্রমীলাকে আমরা যতই নূতন দেখি, এই চরিত্রের মূল উপাদান অভিনব নহে, একেবারেই শাশ্বত নারীত্ব, এবং এই নারীত্বের বিচিত্র মণিখচিত স্বর্ণচূড়া যে একটিমাত্র স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইল, প্রেম।

যে পতি-প্রেম 'নিকষিত হেম,' তাহা নারীকে অসাধ্যসাধনে সক্ষম করে; তাহারই বিদ্যুদ্দীপ্তিতে আমরা নারীর কখনও কুলবধূ-রূপ কখনও বা বীরাঙ্গনা-রূপ দেখিবার আশা করিতে পারি। মোহিতলাল ঠিকই বলিয়াছেন, 'প্রমীলা বীরাঙ্গনাও নয়, লজ্জাশীলা কুলবধূও নয়—সে পতিগতপ্রাণা প্রেমিকা নারী। সেই একই প্রেমের দায়ে সে কখনও বীরাঙ্গনা কখনও কুলবধূ।' অবশ্য একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে, প্রমীলার বীরাঙ্গনারূপ অধিকতর সমুজ্জল হইয়া ফুটিয়াছে। কিন্তু সেই রূপের যতকিছু জ্যোতি, তাহার মূল উৎস হইল পতিপ্রেম। এই দৃষ্টিকোণ হইতে প্রমীলা-চরিত্র বিচার না করিলে, প্রমীলা-চরিত্রে বীররসের সঙ্গে শৃঙ্গার-রসের এক সংঘর্ষ বিচারককে বিভ্রান্ত করিয়া দিবার আশঙ্কা! কিন্তু 'কবি এই চরিত্রে আপাতদৃষ্টিতে যাহা একান্ত বিরোধী, সেই আদিরস ও বীররসকে একাধারে মিলাইয়াও রসাভাস বা অসঙ্গতি-দোষ নিবারণ করিয়াছেন।'

প্রমীলা-চরিত্রই মেঘনাদবধের মধ্যে নূতন এবং কবির কল্পনাশক্তির সর্বোত্তম অভিব্যক্তি। যে যুগে মধুসূদন এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন সেই যুগের কথা স্মরণ করিলে আমরা নিঃসংকোচেই বলিতে পারি যে, প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনা চরিত্রের সৃষ্টি সত্যই বিস্ময়কর। পৃথিবীর অনেক কবিরই কল্পনা বীররমণীর মহিমা বর্ণনা করিতে উদ্দীপিত হইয়াছে; কিন্তু অপর কোনো কবিই এরূপ একটি চিত্র আঁকিতে পারেন নাই। ভার্জিলের ক্যামিলা, ট্যাসোর ক্লরিণ্ডা, এরমিনিয়া, বাইরনের মেড্ অফ সারাগোসা, সকলেই প্রমীলা হইতে স্বতন্ত্র। ব্যাসের অতুলনীয় নারী-চরিত্রসৃষ্টি দ্রৌপদীর সঙ্গে প্রমীলার কিছুটা তুলনা হয়ত করা যাইতে পারে। কুলবধূর কোমলতা, পতিপ্রাণার আত্মবিসর্জন এবং বীরাঙ্গনার শৌর্য একসঙ্গে মিলিত হইয়া, প্রমীলা-চরিত্রকে সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় করিয়াছে।

প্রমীলা-চরিত্রের উপাদান সম্পর্কে আরও কিছু বলা যাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ট্যাসোর 'জেরুজালেম-উদ্ধার' কাব্য হইতে মধুসূদন তাঁহার প্রমীলা-চরিত্র-চিত্রণে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। ইহার বীরাঙ্গনা এরমিনিয়ার, ক্লরিণ্ডার এবং গিল্ডিপের চিত্রে তাঁহার বীরত্বানুরাগী হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর ইলিয়াডের রণসজ্জায় সজ্জিতা এথিনীর এবং ইলিয়াডের অশ্বারোহণ-নিপুণা সহসঙ্গিনী কেমিলার চিত্র তাঁহার অস্পষ্ট কল্পনাকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছিল। এ ছাড়া, তাঁহার বাল্যের প্রিয়কবি কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে মধুসূদন মনঃকল্পিতা নায়িকার একখানি রেখাচিত্র পাইয়াছিলেন। আরও একজন স্বদেশীয় কবির নিকট প্রমীলা-চরিত্র সম্বন্ধে মধুসূদন ঋণী আছেন। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পূর্বে, মধুসূদনের বাল্য-সুহৃদ, বঙ্গের অন্যতম কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রকাশিত হয়। নিজের মনঃকল্পিত প্রমীলাকে পদ্মিনীর তেজস্বিতা, কোমলতা এবং পাতিব্রত্যে ভূষিত করিতে মধুসূদনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। রণসজ্জায় সজ্জিতা পদ্মিনীর সঙ্গে ভীমসিংহের সাক্ষাৎ এবং পদ্মিনীর চিতারোহণ মাইকেলের কল্পনায় অজ্ঞাতসারে ছায়াপাত করিয়া থাকিবে। সর্বোপরি সমসাময়িক ইতিহাসও কবিকে কিছু উপাদান যোগাইয়াছে। মেঘনাদবধ বিরচিত হইবার মাত্র চার বৎসর পূর্বে ভারতের উপর দিয়া এক প্রচণ্ড বিপ্লবস্রোত বহিয়া যায়—ইতিহাসে ইহার নাম সিপাই বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নায়িকা ছিলেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই। লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্ব সমগ্র ভারতবাসীকে চমকিত করিয়াছিল এবং যখন মধুসূদনের কল্পনায় প্রমীলার চিত্র প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, তখনও লক্ষ্মীবাঈ ভারতবাসীদিগের

আলোচনার বিষয় ছিলেন। বহুশত বৎসরের পরাধীন জাতির কল্পনা হইতে প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনার সৃষ্টি যে আকস্মিক কারণে হইতে পারে না, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমরা এরূপ বিস্তৃতভাবে প্রমীলা-চরিত্রের উৎস লইয়া আলোচনা করিলাম। ট্যাসো, ভার্জিল, হোমর, কাশীরাম, রঙ্গলাল প্রভৃতির কল্পনা হইতে তিল তিল উপাদান সংগ্রহপূর্বক দেবশিল্পীর ন্যায় মধুসূদন তাঁহার অমৃতময়ী প্রতিভার সাহায্যে এই তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছেন। বাল্মীকির মানস-প্রতিমা যদি হন সীতা, তাহা হইলে মধুসূদনের মানস-প্রতিমা প্রমীলা।

সীতা

অমর কবি মধুসূদনের অমর কাব্য মেঘনাদবধে আরও দুইটি মহীয়সী নারী-চরিত্রের বর্ণনা আছে—সীতা ও সরমা। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, সমগ্র কাব্যের মধ্যে যে জিনিষটি সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে গার্হস্থ্যজীবনের পবিত্রতা। এই পবিত্রতার অনুভূতি ও প্রেরণা মাইকেল বিদেশী কাব্য হইতে পান নাই—ইহা তিনি পাইয়াছেন ভারতীয় নারীত্বের ঐতিহ্য হইতে। ভারতীয় নারীত্বের মহিমার মর্মমূলে যে তিনি প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সীতা ও সরমার কাহিনীতে এবং মন্দোদরীর প্রসঙ্গে তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ রহিয়াছে। গার্হস্থ্যজীবনের পবিত্রতা প্রদর্শন করা এই কাহিনী-প্রবর্তনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

চতুর্থ সর্গে অঙ্কিত "সীতা"-চরিত্রখানি মাইকেলের চরিত্র সৃষ্টির এক পরম বিস্ময়স্বরূপ। এ-সৃষ্টি উপাদানগত নহে, কারণ এখানে উপাদানের নূতনত্ব কিছু নাই, সমস্তই কবিগুরু বাল্মীকির কৃপাদত্ত। এ-সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা ভক্তকবির অন্তরের আরতি-আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ায় চরিত্রখানি চির পুরাতন হইয়াও পুনর্নবীন হইয়া উঠিয়াছে। সীতা-চরিত্রকে অমরত্ব দান করিবার জন্য বাল্মীকির অমৃত বাণীই যথেষ্ট, তবে সাহিত্যে নব নব রূপের মূল্য স্বীকৃত হয় চিরকাল, সীতা-চরিত্রের সেই মূল্য এই কাব্যে যে অত্যুচ্চ হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাল্মীকির হাতে সীতা মানবী হইয়াও দেবী, আর মধুসূদনের হাতে সীতা দেবী হইয়াও মানবী। এই যে মানবীয় স্পর্শের মহনীয় স্ফুরণ, ইহাই চরিত্রটিকে আমাদের নিকট নূতন করিয়া চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলে, আর, এইখানেই চরিত্রস্রষ্টার মৌলিকতা। সীতা যে'খনির তিমির-গর্ভে সূর্যকান্ত মণি', অথবা 'অম্বুরাশিতলে বিম্বাধরা রমা' অথবা 'তমোময় ধামে আভাময়ী প্রভা',—ইহাতে চমকিত হইবার কিছু নাই; কিন্তু অশোকবনেই থাকুন, আর যেখানেই থাকুন, তিনি যে 'এয়ো,' সিন্দূরহীন ললাট তাঁহার পক্ষে সাজে না, ঐ অনিন্দ্যসুন্দর ললাটে প্রয়োজন একটি প্রশস্তোজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু,—সীতার এই পরিচয়ই একমুহূর্তে আমাদের অন্তরতম হইয়া উঠে। 'এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ ?'—। সরমার মুখে এই কথাটি বসাইয়া কবি নিজেই তাঁহার সীতা-চরিত্রের বন্দনার আয়োজন করিলেন। রাক্ষসপুরীতে দীর্ঘকাল অযত্নরক্ষিত জানকীর কপালে এয়োতি-চিহ্ন নাই, ইহা কবির অন্তরকে ব্যথিত মথিত করিয়াছে বলিয়া তিনি ঐ সতী-সাধ্বীর সান্নিধ্যে যাইবার পূর্বে সর্বাগ্রে তাঁহাকে সিন্দূরাতলকা করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। স্বর্গের দেবীর পক্ষে এই চিহ্নের প্রয়োজন না

থাকিতে পারে, কিন্তু মর্ত্যের মানবীর ইহা না থাকিলে অন্তরের মধ্যে খাঁ খাঁ করে। ঐ বিন্দুতেই সে বিধৃত করিয়া রাখে তাহার জীবনের যথাসর্বস্ব পতি-দেবতাকে, আর ঐ মাঙ্গলিক বিধৃতি যে শিব-সুন্দর ভাবের সূচনা করে তাহা আমাদের সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে যেমন আদরের তেমনই অপরিহার্য। তাই বলিতে হয়, মধুসূদন তাঁহার সীতা-চরিত্র অঙ্কনের এই প্রথম ধাপে যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সীতা যে দেবী হইয়াও মানবী, এই কথারই ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

প্রকৃতি ও মানবের অন্তররাজ্যে যাহা কিছু তরুণ ও যাহা কিছু প্রবীণ, সে সমস্তই এই সীতা-চরিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। তাঁহাকে কখনও মনে হয় একটি চিরনবীন কিশলয় মাত্র, আবার কখনও চিরজাগ্রতা বন-দেবী; তিনি কখনও শিশুর তারল্যে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন, আবার, কখনও বা প্রেম-প্রৌঢ়ার ন্যায় পতিপ্রেমের মাহাত্ম্য-স্রোতে অবগাহন করিতেছেন। মনের এই অসাধারণ পেলবতার বলেই সীতা রাজার নন্দিনী রঘু-কুল-বধূ হইয়াও পঞ্চবটী বনে এমন সুখে কাল কাটাইতেন যাহা শুনিয়া সরমার রাজসুখে ঘৃণা জন্মিয়া গেল; ইচ্ছা হইল, রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া তিনিও বন-বাসে চলিয়া যান। সমগ্র প্রকৃতির সহিত এই নারীর হৃদয় নিবিড়ভাবে গ্রথিত হইয়াছিল। সর্বজীবে দয়া, প্রীতি, সেবা, সমবেদনা, কৃতজ্ঞতা, আতিথ্য ইত্যাদি অমূল্য আন্তর সম্পদের তিনি এমন এক দানসত্র খুলিলেন যাহার ছত্রতলে বস্তুজগতও তাঁহার স্পর্শে জীবন্ত; প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণী আসিয়া মুগ্ধ, তৃপ্ত ও ধন্য হইল। কেবল প্রাণী নহে, এককথায় সেখানকার যাবতীয় সত্তার সহিত তাঁহার গভীর আত্মীয়তা। শিশুর সরলতা ও অপরিসীম দরদ অন্তরকে উদ্বেলিত করিত বলিয়া অরণ্যের সেই ভীষণ নির্জনতা তাঁহাকে এতটুকু কাতর করিতে পারিত না। তরুলতা ও পশুপক্ষী লইয়া তিনি এক-সোনার সংসার গড়িয়াছিলেন:

> "নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
> তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
> দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
> নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
> নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে !"

এই কল্পনাঢ্য লিরিক ঝংকার নিছক কবিকৃতি নহে, সীতা চরিত্রেরও এক উজ্জ্বল দিগ্‌দর্শক।

জানকী জনমদুঃখিনী; কিন্তু এই দুঃখের অগ্নিশিখায় তিনি কাহাকেও উত্তপ্ত করিতে চাহেন না। 'এ অভাগী, হায়, লো সুভগে, যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে এ জগতে ?' এই কথায় ফুটিয়া উঠে নারীর যে সর্বংসহা রূপ, তাহাতে একমাত্র সীতাই সীতার তুলনীয়া। দুঃখের আগুনে তিনি যতই জ্বলিতেছেন, ততই ফুটিতেছে তাঁহার ঐ সর্বংসহারূপের অম্লান জ্যোতি। অকুণ্ঠ পতিপ্রেম হইতে তাঁহার অন্তরে জাগিয়াছে এমন এক অপার্থিব তেজ যাহার বলে তিনি দুর্দান্ত-রাক্ষস-কবলিতা হইয়াও আত্মবিস্মৃত হন নাই, আপন উদ্ভাবনী শক্তিতে সেই পৈশাচিক চৌর্যের পথ যাহাতে নিষ্কণ্টক না থাকিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অঙ্গের অলঙ্কার নিক্ষেপ করিতে থাকেন। পতির গরবে গরবিনী তিনি; পর্বতোপরি বিশাল রসাল-মূলে ব্রততীর ন্যায় তিনি যে নাথের চরণতলে বসিয়া সেই শ্রীমুখ-নিঃসৃত নানা কথা শুনিতেন—সেই পূর্বকথা স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার মনে হইতেছে, তাঁহাদের সেই আলাপ, কৈলাসের হর-গৌরীর আলাপেরই সমপর্যায়ের। সুতরাং অন্তর যাঁহার সু-উচ্চ সুখ-স্মৃতিতে

ভরা, পার্থিব নির্যাতনে তাঁহার কী করিবে? পৃথিবীর মাটিতে জন্মিয়াও তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে যে অপার্থিব গুণগ্রাম! কবিকে দেখাইতে হইবে সীতা-চরিত্রে এই স্বর্গ-মর্ত্যের রাখীবন্ধন! তাই মধুসূদন কখনও জানকীকে তুলসীর সহিত, কখনও বা তাঁহার মধুর ভাষণকে গোমুখীর মুখনিঃসৃত পূত বারিধারার সহিত উপমিত করিয়া তাঁহার পবিত্র জানকী-উপাখ্যানটিকে স্বর্গীয় সৌরভে সুরভিত করিয়াছেন; আবার তাঁহাকে কাঁদাইয়া হাসাইয়া কৌতুকে ভাসাইয়া আমাদেরই বাঙালী ঘরের এক সতী-সাধ্বী নারীরূপের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

সরমা

মেঘনাদবধ কাব্যের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে প্রমীলা, সীতা, চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী যেভাবে সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে "সরমা" চরিত্রটি সাধারণতঃ সেভাবে আকর্ষণ করে না। অথচ তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুর মধ্যে আমরা তাহার যতখানি জানিতে পারি, তাহাতে নারীত্বের যে শতদল শোভা বিকশিত হইতে দেখা যায়, তাহা কখনও উপেক্ষার বস্তু হইতে পারে না। এই স্নিগ্ধ-মধুর নারী চরিত্রটি বুঝিতে হইলে আমাদের একবার ভাবিতে হয়, সামান্য একটু বিশ্রম্ভালাপের ক্ষীণ পরিসরের মধ্যে কীভাবে সে তাহার মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, কীভাবে তাহার নীতিবোধ, ধর্মবোধ, এক কথায়, তাহার চরিত্রের সমুন্নতি, একেবারে অনাবৃত করিয়া ধরা দিয়াছে। অপর নারী-চরিত্রগুলির ন্যায় সমগ্র কাব্যের উপর ইহার প্রভাব তেমন প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী না হইতে পারে; কিন্তু এই নিঃশব্দসঞ্চারী আভিজাত্যবর্জিত চরিত্রটি মুহূর্তের জন্য আমাদের মনকে যেভাবে শ্রদ্ধানত করিয়া ফেলে তাহার যথাযথ মূল্য না দিতে পারিলে ইহাকে অকারণ উপেক্ষাই করা হয়।

নারী-স্বভাব-সুলভ কোমলতা ও সমবেদনার বশবর্তী সরমা সীতার লাঞ্ছনায় প্রতিনিয়ত মনঃপীড়ায় কাল কাটাইয়াছে। তাহার এই মানসিক যন্ত্রণা আরও বাড়িয়াছে নিজের অসহায়তার জন্য। ধর্মপ্রাণ স্বামী ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য শত্রুপক্ষে যোগদান করায় পুরীমধ্যে সে সকলেরই চক্ষুশূল। ইচ্ছা থাকিলেও কোন কাজ তাহার স্বাধীনভাবে করিবার উপায় নাই। নারীকুলচন্দ্রমা সীতাদেবীর উপর অযথা অত্যাচার চলিতেছে, নারী হইয়া সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে? কিন্তু উপায় নাই, সে সর্বপ্রকারে দুর্বল; মুখের সান্ত্বনা দিয়াও যে আতঙ্ক-কণ্টকিতা বৈদেহীর কষ্টের লাঘব করিবে তাহার উপায় নাই—চারিদিকেই চর ও চেড়ীর সতর্ক পাহারা। তাই সকলের অজ্ঞাতে অবিরল অশ্রুবর্ষণ করা ছাড়া সরমার আর কোন পথ নাই। এইজন্য মেঘনাদের অভিষেক-উৎসবে সকলকে মত্ত থাকিতে দেখিয়া এই সহৃদয় রক্ষোললনা যে অবসর খুঁজিয়া পাইল তাহাতেই ছুটিয়া আসিল অশোকবনের আঁধার কুটীরে। সীতার চরণতলে বসিয়া কোন বাক্যালাপের পূর্বেই সরমা কাঁদিতে লাগিল,—তাহাতে বুঝিতে হয়, এ কান্না তাহার এই মুহূর্তের নয়, অহোরাত্র যে কান্না সে এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিল, ইহা তাহারই উচ্ছ্বসিত মুক্তধারা। যদি সরমার আর কোন প্রসঙ্গই না থাকিত তথাপি তাহার এই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মধ্যে আমরা তাহার নারী-হৃদয়ের যে পরিচয় পাইতাম তাহা কি উপেক্ষার যোগ্য? এই কান্না কেবল এক নারীর দুঃখে অপর এক নারীর সমবেদনা নহে,—ইহারই মধ্যে আছে সরমার ধর্মবোধ,

নীতিবোধ, অসহায়তার কাতর নিবেদন, অকর্তব্যজনিত ক্ষমা-প্রার্থনা, প্রবল আত্মধিক্কার ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত সীতাদেবীর চরণ-স্পর্শের অবসরলাভজনিত পুলকোচ্ছ্বাস।

সরমা-চরিত্রের অন্যতম আকর্ষণ হইল, তাহার মধ্যে আমরা আদর্শ বঙ্গনারীর এক অতি মধুর চিত্র দেখিতে পাই। কোন সমালোচক বলিয়াছেন, মধুসূদনের চক্ষে "যেন নারীমাত্রেই বঙ্গনারী—" সরমাও সীতাকে সিন্দুর পরাইবার আগে যাহা বলিতেছে, তাহা ভারতের আর কোন দেশের সধবা আর এক সধবাকে নিশ্চয় বলে না—

'আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া সিন্দুর ;
করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে দিব ফোঁটা।
এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ ?'

'এয়ো তুমি' রাক্ষসবধূ সরমার কথাই বটে।

এখানে এই সরমা-সতীর মুখের কথা, এই কৌটা খুলিয়া যত্নের সহিত সীতার সীমন্তে ফোঁটা দেওয়ার পর পদধূলি গ্রহণ, ইহাতে আমরা তাহাকে পাই একেবারে খাঁটি বঙ্গবধূরূপে। বঙ্গনারীত্বের এই মধুর রূপের আদর্শে সীতা অথবা প্রমীলাও যেমন, সরমাও তেমনি চরিত্রের মাধুর্যে ও মহিমায় বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সক্ষম। মধুসূদন মাতৃভাষায় কাব্য লিখিতে বসিয়া যেন নিজের মাতৃজাতিরও বন্দনা গাহিয়াছেন।"

সতীই বুঝে সতীর মহিমা, সতীই রাখে সতীর মান। তাই সীতার কপালে এয়োতির চিহ্ন অনুজ্জ্বল দেখিয়া সরমার প্রাণ তো কাঁদিয়া উঠিবেই। সে কত আশা করিয়া আজ সীতাদেবীর কপালে ফোঁটা দিবে বলিয়া কৌটা ভর্তি করিয়া সিন্দুর আনিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই মহীয়সী মহিলার মিলন-মুহূর্তে সীতা অপেক্ষা সরমাই আমাদের চোখে বড় হইয়া উঠে, তাই বুঝি কবি তাঁহার উপমার অতি সতর্ক ভাষায় জানাইয়াছেন ঃ

'আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশ দিশ !'

এখানে তুলসীর সহিত উপমিত হওয়ায় সীতার পবিত্রতা ও দেবত্ব যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তদপেক্ষা তাহার আরতির ব্যবস্থা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। সরমাকে সুবর্ণ-প্রদীপের সহিত তুলিত করিয়া কবি কেবল যে তাহার রূপেরই প্রশংসা করিয়াছেন তাহা নহে, সুবর্ণ-প্রদীপে যেমন পাত্রের প্রশস্ততা বুঝায় এখানেও তেমনি পূজারিণী হিসাবে সরমার অন্তরের প্রশস্ততা বুঝিতে হয়। ইহা ছাড়া দশ দিক্ আলো করিবার যে ভার তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝি, তাহার পূত চরিত্রের কমনীয় জ্যোতির কথা আমাদের মনে জাগাইয়া দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য।

সরমার মূল্য আর কেহ না হউক, সীতা তো বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারই মুখে শুনিতে হয় সরমার মূল্য,—সে ছিল, মরুভূমির মধ্যে প্রবাহিণী, রৌদ্রের মধ্যে ছায়া, নির্দয়তার মধ্যে মূর্তিমতী দয়া, পঙ্কিল জলে পদ্ম, ভুজঙ্গিনীরূপী কনকলঙ্কার সেই হইল শিরোমণি।

এই চরিত্রের উপযোগিতার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে হয়, চতুর্থ সর্গটির প্রয়োজন-সিদ্ধির মূলে যে দুইটি মাত্র চরিত্র-যোজনার আয়োজন করা হইয়াছে, ইহা তাহারই একটি। এই দুইটিকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে যে শাখা-কাহিনী তাহা মহাকাব্যের বৈচিত্রবিধানের জন্য অপরিহার্য, অথচ সরমাকে বাদ দিয়া এই বৈচিত্র্যের পরিকল্পনাই অচল। দ্বিতীয়তঃ, সরমাই ফুটাইয়াছে সীতার চরিত্র ও মাহাত্ম্য; এই দরদী-সখীর কোমল স্পর্শ না পাইলে সীতার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইত না। সরমা সমবেদনাকাতর চিত্তে যখন তৃষাতুরের ন্যায় সীতার পূর্বজীবন-কাহিনী শুনিতে চাহিল তখন সীতাও যেন আপন বক্ষ উজাড় করিয়া পুঞ্জীভূত ব্যথার কিঞ্চিৎ অপনোদন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সীতার পক্ষে বুঝি একমাত্র সরমারই গলা ধরিয়া কাঁদা সম্ভব ছিল, তাই পাওয়া গিয়াছে গোমুখীর মুখ-নিঃসৃত পূত বারিধারার ন্যায় জানকীর মধুর ভাষণ, তাঁহার হাসিকান্নায়-ভরা আরণ্যজীবনের পবিত্র কাহিনী।

বস্তুতঃ, মেঘনাদবধ মহাকাব্যের এই শান্ত অবসরটুকুর জন্য কবি ও পাঠক সকলেই সরমার নিকট ঋণী। যুদ্ধবিগ্রহ, শোকতাপ, দেব-মানবের আনাগোনা—সমস্ত মিলিয়া যে একটি কল্লোল এই মহাকাব্যে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে এই চতুর্থ সর্গটি এক শান্ত আবহাওয়ার কুঞ্জ রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইটি মহীয়সী রমণী-হৃদয়ের পবিত্র সুষমা দিয়া রচিত এই কুঞ্জটি করুণরসের এক মধুর ধারায় সিঞ্চিত, সঞ্জীবিত ও শীতলায়িত। কিন্তু এই মধুর ধারার উৎস কোন একটি হৃদয় নহে, সীতা-সরমার যুগ্ম-হৃদয়। সুতরাং এই কাব্যে সরমাকে বাদ দিয়া সীতার কোন অস্তিত্ব নাই। আর এই সরমার অভাবে লুপ্ত হয় মেঘনাদবধ-কাব্যের অন্যতম প্রধান ঐশ্বর্য—ইহার লিরিক-ঝংকার।

মেঘনাদ

মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্ঠচরিত্র "মেঘনাদ"। নির্ভীকতার মূর্ত বিগ্রহ ইন্দ্রজিৎ; লঙ্কার যুদ্ধে সহস্র সহস্র রক্ষোবীর নিহত হইতেছিলেন, কিন্তু ইহার জন্য মেঘনাদের হৃদয়ে কোন উদ্বেগ ছিল না। যতদিন নিরাশার বা দুঃখের অভিজ্ঞতা না জন্মে, ততদিন মানুষের হৃদয়ে চিন্তার বা ভয়ের সঞ্চার হয় না। মেঘনাদের জীবনে নিরাশা বা দুঃখের অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই তিনি নির্ভীক, আত্মশক্তিতে অটল প্রত্যয়শীল। জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সবকিছু লাভ করিয়া মেঘনাদ, নবীন শালতরুর ন্যায়, মস্তক উন্নত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বীরত্বই মেঘনাদ-চরিত্রের একমাত্র ব্যঞ্জনা নহে। তাঁহার হৃদয় একদিকে যেমন বজ্রের ন্যায় কঠোর, অপর দিকে তেমনই কুসুমের মত কোমল। তিনি স্বদেশবৎসল, পিতৃমাতৃভক্ত, অনুজগণের প্রতি স্নেহবান, এমন কি শত্রুরও প্রতি শিষ্টাচারপরায়ণ। এই নির্ভীকতা ও মহাপ্রাণতা তাঁহাকে একটি আদর্শ-চরিত্রের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মধুসূদন ট্রয়-রাজকুমার হেক্টরের ছাঁচে

ঢালিয়া তাঁহার মেঘনাদ-চরিত্র গঠন করিয়াছেন বলিয়াই চরিত্রটি এইরূপ উন্নত হইয়াছে। পৌরুষদর্পী ইন্দ্রজিৎ পৌরুষদর্পী মধুসূদনের মানস-সন্তান—কবির নিজের মানস-প্রকৃতি এই চরিত্রের আগাগোড়া সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে; তাই মেঘনাদ-চরিত্র শৌর্যে ও শিষ্টাচারে, বীরত্বে ও ব্যক্তিত্বে এমন দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মেঘনাদ-চরিত্র-সৃষ্টির স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমাদের প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে সন্ধানী দৃষ্টিতে বিচরণ করিতে হয়। এই তিনটি সর্গের মধ্যে যদিও এক ষষ্ঠ সর্গেই মেঘনাদের সকল শ্রেষ্ঠ গুণের পরিচয় আছে, তথাপি মেঘনাদ-নামধারী পরিপূর্ণ মানুষটিকে চিনিবার জন্য প্রথম ও পঞ্চম সর্গে লিখিত মেঘনাদ-বৃত্তান্তও বিশেষ মূল্যবান্। মেঘনাদ সম্পর্কে সবচেয়ে বড়কথা যদিও তাঁহার মহান বীরত্ব, তথাপি সর্বপ্রকার সজাগ অনুভূতির সুষমতায়, কর্তব্যের ঔচিত্যে, আচরণের সৌষ্ঠবে ও পবিত্র গার্হস্থ্যজীবনের বিচিত্র আদর্শের সামঞ্জস্যে, তিনি যে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের অধিকারী, ইহা না বুঝিয়া লইয়া এই চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ করা নিরাপদ নহে।

যে আত্মপ্রত্যয়ী ও পৌরুষ-দর্পী মধুসূদনের মনের মানুষ বলিয়া আমরা ইন্দ্রজিতকে চিনিয়াছি, সেই মধুসূদনেরও কি আত্মপ্রত্যয় ও পৌরুষ ছাড়া আর কোন চারিত্রিক বিশিষ্টতা ছিল না? যদি জীবনে না ফুটিয়া থাকে, তাঁহার অন্তরের মণি-কোঠায় সযত্নে রক্ষিত ছিল অন্য যত রত্ন তাহা দিয়াই তো গঠিত তাঁহার মানস-পুরুষ ইন্দ্রজিৎ। জীবনে যাহা ফুটে না, কাব্যে তাহাই বিকশিত ও লীলায়িত হয়; বহির্জগৎ ব্যক্তিসত্তাকে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু কবিসত্তা সকল বঞ্চনা তুচ্ছ করিরা আপন মানস-পুরুষের মাধ্যমে জীবনকে সাধ মিটাইয়া উপভোগ করিয়া যায়। ইন্দ্রজিৎ যে সর্ববঞ্চিত মধুসূদনের মানস-পুরুষ তাহা বুঝিবার ও প্রমাণ করিবার ইহাই হইল মূলসূত্র। ইন্দ্রজিতের মধ্যে কবি সকল সাধ মিটাইয়াছেন; একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের শাখায় শাখায় স্বচ্ছন্দে ও সগৌরবে বিহার করিয়া সর্বত্র এক নির্দোষ, কমনীয়, মহনীয় ও বরণীয় পরিচয় দিয়া, জীবন-বিহারের মধ্যাহ্নেই সকলের মধ্যে আপনার অভাব-বোধ মুদ্রিত করিয়া সকলকে কাঁদাইয়া লোকসমাজে অবিস্মরণীয়, মনোমন্দিরে নিত্যসেব্য হই৷ নরকুলে ধন্য হওয়ার সাধ মিটাইয়াছেন।

প্রথম সর্গে দেখা যায়, লঙ্কার প্রমোদ-উদ্যানে সুখসম্ভোগে মত্ত থাকা অবস্থায় যে মুহূর্তে মেঘনাদ শুনিলেন, যুদ্ধের মোড় ফিরিয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার অবর্তমানে আদরের ছোটভাই বীরবাহুকে হইতে হইয়াছে সেই সমরের কালাগ্নির নির্মম আহুতি, অমনি—'ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী মেঘনাদ।' তাঁহার সোনার লঙ্কা যখন বৈরিদলবেষ্টিত তখন তিনি বামাদল-মাঝে সম্ভোগরত? যদিও ইতঃপূর্বে দুইবার প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া তিনি বিশ্রামের জন্যই এই প্রমোদ-উদ্যানে আসিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার এই সাময়িক বিভ্রান্তিতে তিনি সংকুচিত হইয়া পড়িলেন। আত্মধিক্কারের বহ্নি-শলাকায় প্রজ্বলিত হইল যে প্রচণ্ড শৌর্য-তেজ, মৃত্যুর পূর্বে তাহা আর কখনও নির্বাপিত হইল না। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয়, এরূপ উত্তেজনায় সাধারণতঃ যে যোদ্ধসুলভ কঠোরতা গোটা জীবনকে শুষ্ক ও কঠোর করিয়া ফেলে, এক্ষেত্রে তাহা হইল না; এক প্রচণ্ড-মধুর সংযমের পেটিকায় ঐ রুদ্রতেজ পোষিত হইতে থাকিল, বাহিরে চলিল ধীর-মস্তিষ্কের আচরণ ও আয়োজন। তাই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে যখন ঘৃণা-ধিক্কারের কশাঘাতে জর্জরিত, রথারোহণে উদ্যত মেঘনাদের সম্মুখে প্রমীলা সুন্দরী

আসিয়া বিরহব্যথা নিবেদন করিলেন, তখন অন্তরে রণদামামা বাজিলেও প্রেমের মর্যাদা রাখিবার জন্য

"হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ?"

কিন্তু এইটুকু মাত্র ; কারণ এই সংকট-মুহূর্তে ইনাইয়া-বিনাইয়া নারী-মনোমোহন বীরের কর্ম নহে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে দেখি পিতৃচরণে প্রণত, অপরাধী পুত্রের ন্যায় কুণ্ঠা-পীড়িত ; কেবল অনুমতির অপেক্ষা—রাঘবকে তিনি বাঁধিয়া আনিয়া রাজপদে উপহার দিবেন। আত্মপ্রত্যয়ে কি অসাধারণ দৃঢ়তা থাকিলে পুত্রের পক্ষে পিতার নিকট এই জাতীয় অনুমতি প্রার্থনা সম্ভবপর তাহাই ভাবিবার বিষয়।

পঞ্চম সর্গের পট-পরিবর্তনে আমাদের দৃষ্টিপথে জাগিয়া উঠে বীরর্ষভ দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস যোদ্ধ-কুল-তিলক মেঘনাদের শান্ত মধুর ঘরোয়া-জীবনের এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। মেঘনাদ কেবল বীর-চূড়ামণি নহেন, প্রেমিকেরও চূড়ামণি। বহির্জগতের প্রয়োজনে সংগ্রামে দুর্ধর্ষ মূর্তি ধারণ করিতে হয়, কিন্তু যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানেও ঐ দুর্ধর্ষতার ছায়া আসিয়া পড়ে, ইহা হইল সাধারণ মানুষের কথা, কিন্তু মেঘনাদকে কবি কখনও আদর্শের সংঘর্ষে বিচলিত হইতে দেন নাই। বীরত্বের আদর্শ রণক্ষেত্রে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রিয়-সম্ভাষণে যেখানে প্রেমিকের আদর্শ বাঞ্ছনীয় সেখানে কেন ত্রুটি থাকিবে ? তাই পঞ্চম সর্গে প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ-দৃশ্যে মেঘনাদের কথা শুনিয়া আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, এই পুরুষটি আবার পৃথিবীর কোন প্রয়োজনে মরণ-বিধ্বস্ত সমরাঙ্গনে পদার্পণ করিতে পারে। এখানে ফুটিয়াছে মেঘনাদের পুষ্পস্তবকসদৃশ কোমল-পেলব-মধুময় পরম প্রেমিক-মূর্তি। আমাদের মনে পড়িয়া যায় বৃন্দাবনের সেই কুঞ্জ-ভঙ্গ-লীলা :

"প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন !
উঠ, চিরানন্দ মোর ! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা ; তুমি রবিচ্ছবি,—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার। নয়নতারা ! মহার্ঘ রতন !
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু-কুঞ্জবনে
কুসুম !"

এক বৃন্দাবন ব্যতীত এত প্রেম, এত আদর আমরা আর কোথায় দেখিয়াছি? কবির প্রেম-বুভুক্ষু হৃদয় এখানে যে মেঘনাদের ভূমিকায় আকণ্ঠ প্রেমসুধা পান করিয়াছে, তাহা কে না বুঝিবে? যেমন হেনরিয়েটার উদ্দেশে তাঁহার মনের কথা ছিল:

"তুমি যে আমার কবিতা,
মোর মানস-শতদলে তুমি যে বীণাপাণি
প্রতিমাসম বিরাজিতা।"

তেমনি তাঁহার মেঘনাদকেও বলিতে শুনা যায়, "তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।" হেনরিয়েটা ও প্রমীলা উভয়েই প্রেমবল্লরী, মধুসূদন ও মেঘনাদরূপ রসালদ্বয়ের ঐ বল্লরীবেষ্টনের বড়ই প্রয়োজন। উভয়েরই জীবনে দারুণ সংগ্রাম, কিন্তু ঐ সংগ্রামে শক্তি ও প্রেরণা যোগায় প্রেমময়ী নারী। তাই বড় দরদ দিয়া মধুসূদন আঁকিয়াছেন তাঁহার প্রিয়তম চরিত্র মেঘনাদ। অথচ এই প্রেমের আবেদন অদ্ভুত-ভাবে পরিমিত। প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হইলেই আসিল কর্তব্য-পালনের আহ্বান 'চল, প্রিয়ে, এবে বিদায় হইব নমি জননীর পদে!' কী অভাবনীয় এই সামঞ্জস্য! প্রেমের আহ্বান হইতে না হইতেই তাহার বিদায়! ইহাতে অবশ্য মেঘনাদের আমাদের মত বিচলিত হইবার কথা নহে, কারণ উত্তুঙ্গ আশাবাদের প্রভাবে তিনি ছিলেন পুনর্মিলনে বিশ্বাসী। তাহা ছাড়া সকলের উপরে তাঁহার আত্মশক্তিতে ছিল অটল আস্থা, যাহার বলে যুদ্ধগমনের প্রাক্কালে রোদনরতা প্রেয়সীকে স্বচ্ছন্দে বলিয়াছিলেন, "এখনি আসিব, বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি।"

মেঘনাদ কেবল মন্দোদরীর আদরের দুলাল নহে, তিনি ছিলেন খাঁটি মাতৃভক্ত। পিতৃভক্তির পরিচয় আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এই মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির আদর্শ মধুসূদনেরই হৃদয়-কন্দর হইতে উদ্ভূত। জীবনে তাঁহার এই ভক্তি দেখানো সম্ভব হয় নাই। নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পড়িয়া অনেক আদর্শই তিনি অবহেলা করিয়াছেন। সেই যে সমাধিস্তম্ভের জন্য লিখিত কবিতায় অনুতপ্ত কবি শেষবারের মত মাতা-পিতার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়াছেন:

"দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

আর কখনও তাঁহার ঐ পার্থিব দেব-দেবীকে আপন হৃদয়-বার্তা জানানো হয় নাই; তাই এই মানস-পুরুষ মেঘনাদের মধ্যে জীবনের অকর্তব্যজনিত ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বংশগৌরবে মেঘনাদের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে:

"হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে শুনিলে এ কথা
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল?"

যে বংশ-গৌরব মধুসূদন জীবনে গ্রাহ্য করেন নাই, তাহাই তাঁহার কাব্যে আদৃত হইয়াছে। আর মাতৃভক্তি? মেঘনাদের দৃঢ়বিশ্বাস :

"ও পদ-প্রসাদে,
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস!"

পিতার আজ্ঞা পাওয়ার পর এখন তাঁহার প্রয়োজন মাতৃ-আজ্ঞা, কারণ মাতাই সন্তানের নিকট শ্রেষ্ঠ দৈবশক্তি, মাতাই মেঘনাদের পার্থিব দেবী, তাই প্রার্থনা :

"দেহ আজ্ঞা তুমি—
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?"

এইভাবে বিচার করিলে আমরা মেঘনাদবধের শ্রেষ্ঠচরিত্র মেঘনাদের মধ্যে একই সঙ্গে পাই এক আদর্শ স্বামী, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা ও সর্বোপরি এক আদর্শ দেশভক্ত বীরপুরুষ। কিন্তু তাঁহার আরও যে উচ্চাঙ্গের পরিচয়, তাহার জন্য আবশ্যক ষষ্ঠ সর্গের বিশ্লেষণ। সেখানে ইন্দ্রজিতের প্রথম দর্শনে আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই—'নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন যোগীন্দ্র—'; কোথায় গেল সেই প্রেমময়ীর কর্ণকুহরে প্রেম-কূজন—সেই পিতার উৎসাহবর্ধনমূলক আপন শৌর্যের বিন্যাস—সেই অবোধ মায়ের প্রাণের উপযোগী আশাবাদী মধুর প্রগল্‌ভতা,—তৎপরিবর্তে কোথা হইতে আসিল এই কঠোর তপশ্চরণ, নিবিড় নির্লিপ্ততা, গভীর যোগ-সমাধি! রথীন্দ্রের এই যোগীন্দ্ররূপ, একমুহূর্তে মেঘনাদকে এমন এক উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়া দেয়, যাহার নাগাল পাওয়া সাধারণ সংসারী মানুষের দুঃসাধ্য। আমাদের বুঝিতে হয়, এই অধ্যাত্ম-শক্তিই ইন্দ্রজিতের সাফল্যময় জীবন-রহস্যের মূল সূত্র। জীবনের সর্বত্র আদর্শস্থাপন ও বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান বুঝি তাহারই পক্ষে সম্ভব, যাহার আছে এই আধ্যাত্মিক বন্ধন। তবে যদি অতি-মানবীয় শক্তির চক্রান্ত মানুষকে বিকল করিতে থাকে, মানুষকে যদি যন্ত্রমাত্র করিয়া নিয়তি হয় যন্ত্রী, তবে আর সাফল্যের অবসর কোথায়? কিন্তু তবু সেই নিষ্ঠুর নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের যে আন্তর-ঐশ্বর্য মেঘনাদ-চরিত্রে স্ফুরিত হইয়াছে তাহা চরিত্র-স্রষ্টার অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। দৈবনিষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ কিরূপে বিশ্বাস করিবেন যে, দেবতাদের মধ্যে হীন রেষারেষির ফলে তাঁহার নিজস্ব উপাস্যকে শক্তিহীন হইতে হইবে? তাই লক্ষ্মণকে তিনি ছলনাময় বিভাবসু ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারেন নাই। কিন্তু পরে যখন লক্ষ্মণের আত্মপরিচয় পাইলেন, তখন যে-হৃদয় কখনও ভয় বলিয়া কোন বস্তুকে গ্রাহ্য করে নাই তাহাতেই লাগিল প্রথম ভয়ের শিহরণ! 'সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া।' এ শিহরণ শত্রুকে গৃহমধ্যে দেখিয়া নয়, দৈবশক্তির শৈথিল্য দেখিয়া। কিন্তু তবুও নিবীর্য আত্মসমর্পণ নহে; চরম দৈব-দুর্গতির মধ্যেও সংগ্রামের বীরোচিত প্রয়াস। লক্ষ্মণের সেই উদ্ধত অমার্জিত আস্ফালন—"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!" ইত্যাদির পরেও অভাবনীয় সংযম ও প্রশস্ত ঔদার্যের বশবর্তী মেঘনাদের মুখে যে কথাগুলি আমরা শুনিতে পাই, এবং যে শিষ্টতা, সৌজন্য, নীতিবোধ ও সমাহিত-চিত্ততা উহার ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হয় তাহা রিপুতাড়িত পার্থিব মানব কেন সর্বগুণাধার দেব-বীরের পক্ষেও সু-দুর্লভ :

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ, সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ! আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুল-প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;—কি আর কহিব ?"

ইহা ভীরুর কোমলতা নহে, শক্তিমানের ঔদার্য। লক্ষ্মণ বলিয়াছেন, 'দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে।'—কিন্তু এ কিরূপ আহ্বান ? অঙ্গে যাহার কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী, চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে, কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া যে ইষ্টদেবের ধ্যানে নিমগ্ন,—তাহাকে অকস্মাৎ একজন সশস্ত্র প্রহারোদ্যত প্রতিপক্ষ যদি তৎক্ষণাৎ রণে আহ্বান করে, তবে কি তাহা বিদ্রূপের ন্যায় শুনায় না ? রণই যাহার রঙ্গ, যুদ্ধই যাহার লীলা, তাহার নিকট রণের আহ্বান তো উল্লাসকর; কিন্তু পূজার সাজে কি যুদ্ধ হয়! তাই লক্ষ্মণের মূঢ়তায় ও বর্বরতায় বিচলিত না হইয়া প্রশান্ত স্বরে ইন্দ্রজিৎ কেবল বীরসাজে সজ্জিত হওয়ার সময় চাহিলেন। নচেৎ 'বিরত কি কভু রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ?'—ইহা অপেক্ষা বড় সত্য আর কি আছে ? তবে যে সময়ে তিনি রণসাজ করিবেন সে সময়টুকু লক্ষ্মণের কিরূপে কাটিবে ? তিনি কি হিংস্র পশুর ন্যায় কেবলই গর্জাইতে থাকিবেন ? না; হিংস্রতা ব্যতীত আর কোন মনোভাব তখন হয়ত লক্ষ্মণের পক্ষে ধারণাতীত, কিন্তু সংযমের প্রতিমূর্তি ও পরম বিজ্ঞ মেঘনাদের পক্ষে তাহা নহে। তাঁহার নিকট লক্ষ্মণ রক্ষোরিপু হইলেও সর্বাগ্রে অতিথি; সুতরাং লক্ষ্মণ ততক্ষণ মেঘনাদের আয়োজিত আতিথেয় সেবা গ্রহণ করুন—ইহাই হইল সেই পুরুষসিংহের বিনীত প্রস্তাব। ইহাতে মাননীয় অভ্যাগত লক্ষ্মণেরও মর্যাদা রক্ষিত হইবে, মেঘনাদেরও যুদ্ধসাজ সম্পন্ন হইবে,—তুল্যাবস্থায় দুই বীর যোদ্ধা বীরের ন্যায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। কত মহৎ, কত বীরোচিত এই প্রস্তাব। নচেৎ তাঁহার মাননীয় প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মণ নিরস্ত্র অরিকে আঘাত করিয়া রথিকুল-প্রথা-লঙ্ঘনের কলঙ্ক গায়ে মাখিবেন, ইহা যে মেঘনাদকে ব্যথিত করে। তিনি যেন লক্ষ্মণকে এই কলঙ্ক-স্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্যই এই প্রস্তাব করিলেন; তাও প্রস্তাবের মধ্যে কোন উদ্ধত ওস্তাদী নাই; লক্ষণকে উপদেশ দেওয়ার স্পর্ধা তাঁহার নাই, লক্ষ্মণ যে এই রথিকুল-প্রথা ভালই জানেন, ইহাই মেঘনাদের বিশ্বাস; কারণ অপরের ছিদ্রানুসন্ধানের নীচতা তাঁহার নাই; তবে হয়ত পারিপার্শ্বিকের চক্রান্তে লক্ষ্মণের সাময়িক মোহ দেখা দিতে পারে, তাই মেঘনাদ সহৃদয় বন্ধুর ন্যায় কেবল তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন সেই পরিচিত প্রশস্ত বীর-পন্থা।

এইখানেই আমরা মেঘনাদের চারিত্রিক সমুন্নতির তুঙ্গ-শৃঙ্গে আসিয়া পৌঁছিলাম। এ সমুন্নতি, এক কথায়, অতিমানবীয়। যে এই মাত্র অকারণ 'দুরন্ত', 'মদে মত্ত', 'মূঢ়', 'দুর্মতি', ইত্যাদি বর্বর ভাষা ব্যবহার করিল, তাহাকেই, তিরস্কারের পর্যাপ্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও, 'ভীমবাহু লক্ষণ', 'শূরশ্রেষ্ঠ', 'বীরবর'

ইত্যাদি সসম্ভ্রম ভাষণে আপ্যায়িত করা একমাত্র মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু 'মারি অরি, পারি যে কৌশলে।'—এই নীচমন্ত্রে দীক্ষিত লক্ষ্মণকে সহ্য করাও তো ক্লীবের লক্ষণ; আর ওদিকে পরপদলেহী স্ব-জাতি-দ্রোহী কাপুরুষ খুল্লতাত বিভীষণকে সহ্য করাও মেঘনাদের পক্ষে সম্ভব নহে; তাই শেষাংশে আমরা পাই তীব্র ভৎর্সনা ও নীতিবাদের এক সুদীর্ঘ অগ্ন্যুদ্গীরণ। লক্ষ্মণের বেলা যেমন, বিভীষণের বেলাতেও তেমনি; প্রথমে মেঘনাদ খুল্লতাতের অন্তরে স্বাজাত্যবোধ ও দেশাত্মবোধ পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বিনয়-নম্রতাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাব ও প্রার্থনা নিবেদন করেন। কিন্তু নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়।

যাহা হউক, এই সর্বগুণাধার পুরুষোত্তমকেও যে কেবল মায়ার মায়ায় বিকল হইতে হইল, এইখানেই মেঘনাদের tragedy সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও অপরিমেয় শক্তির শেষ বহর প্রয়োগ করিবার জন্য যখন এই বীর-কেশরী ভীমনাদে গর্জন করিয়া লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ সশস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও কি ঘটিত বলা যায় না, কিন্তুঃ

"মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে;
* * *
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে, মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে।"

এত বড় বীরের এই নিষ্ফলতা সকলেরই অন্তর করুণরসে ভরাইয়া দেয়। শমন-জয়ী মেঘনাদ যদি বুঝিতে পারিতেন, কেন তাঁহার এই পরাজয়, তবে কোন আক্ষেপ থাকিত না, কিন্তুঃ

"কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?"

এইখানেই tragedy। হয়ত কবির নিজের জীবনেও এই জাতীয় ব্যর্থতা-জনিত ছিল এক পর্বতপ্রমাণ আক্ষেপ, তাই তাঁহার হাতে এত সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে মেঘনাদ-চরিত্রের পরিণতি, আর, তাই তিনি নিজেও বলিয়াছেন :—"It was a struggle whether Meghnad will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed, He is dead. * * * It cost me many a tear to kill him,"

লক্ষ্মণ

"লক্ষ্মণ" এই কাব্যের প্রতিনায়ক। মেঘনাদবধের লক্ষ্মণ বাল্মীকির লক্ষ্মণ হইতে স্বতন্ত্র। কবির একান্ত পক্ষপাতিত্বের জন্য তিনি প্রতিনায়কের চরিত্র এমনভাবে আঁকিয়াছেন, যাহাতে নায়কের তুলনায় প্রতিনায়ক আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও দুর্বল বলিয়াই মনে হয়। মনে হয় রক্ষোবংশের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগবশতঃই কবি ইহা করিয়াছেন।

রামচন্দ্রের অনুমতি লাভ করিয়া লক্ষ্মণ, "গুল্মাবৃত ব্যাঘ্রের এবং নদীগর্ভস্থিত নক্রের" ন্যায় মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য, বিভীষণের সঙ্গে চলিলেন। অদৃশ্যভাবে মায়াদেবী তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যাত্রার পূর্বে রামচন্দ্রকে প্রবোধদানের সময় মুহূর্তের জন্য লক্ষ্মণের বীরোচিত দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে। মনে হইতে পারে, দেবরাজপ্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াও লক্ষ্মণের আশঙ্কা যায় নাই, তাই মায়াদেবীকে প্রয়োজন হইয়াছে এবং এইখানেই লক্ষ্মণের বীরত্ব ও সাহস একেবারেই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। যেন এই মায়ার অবতারণা করিয়া কবি লক্ষ্মণ-চরিত্রে যে শিশুসুলভ দুর্বলতা ও কাপুরুষতার আরোপ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের চরিত্রের মহিমা বৃদ্ধি করিবার জন্যই; নহিলে মহাকাব্য-রচয়িতার পক্ষে এইরূপ নির্বোধ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন সম্ভব হইত না।

মায়াদেবীর অনুগ্রহে লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। ধ্যাননিরত মেঘনাদ তাঁহাদের পদশব্দে চোখ খুলিয়া ইষ্টদেবভ্রমে লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মণ, আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক, যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। তিনি, মেঘনাদের ভ্রম নিরসন করিয়া, উলঙ্গ কৃপাণ উত্তোলন করিলেন। ইন্দ্রজিতের ভ্রম দূর হইল। লক্ষ্মণকে অসি উদ্যত করিতে দেখিয়া, মেঘনাদ প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায়, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন এবং তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিলেন। কবি, এ পর্যন্ত লক্ষ্মণকে মেঘনাদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু এখন হইতে তাঁহার চরিত্রে কালিমালেপ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর হইতেই লক্ষ্মণ ক্ষুদ্রমতি তস্কর, কাপুরুষ ও নৃশংস। লক্ষ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বীর বীরোচিত প্রার্থনায় সম্মত ত হইলেনই না, উপরন্তু তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থাতেই হত্যা করিলেন। কবি যে কেবল বীরোচিত ঔদার্যে ও মহত্ত্বে লক্ষ্মণকে কাপুরুষবৎ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয়; শারীরিক বলেও তিনি তাঁহাকে শিশুর অপেক্ষা হীনবল করিয়াছেন। ক্রুদ্ধ মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতেও আত্মরক্ষায় তিনি অসমর্থ। সেখানেও মায়াদেবীকে প্রয়োজন হইয়াছে। এমন কি, মেঘনাদ যখন শূন্যহস্তে লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর, তখনও সেই দেবাস্ত্রধারী বীরকে রক্ষার জন্য দেবমায়ার প্রয়োজন হইল।

বস্তুতঃ, মেঘনাদবধের লক্ষ্মণ চরিত্রটি বড়ই বিভ্রান্তিজনক। রামায়ণের লক্ষ্মণ দৈব-সহায়তা পাইলেও উহা খাঁটি বীরের চরিত্র। কিন্তু মাইকেলের লক্ষ্মণ-চরিত্রে বীরত্ব ও নৈতিক দৃঢ়তার যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও ষষ্ঠ সর্গে উহা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে—ইহাই সাধারণ সমালোচকের অভিমত। এই হীনতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যজ্ঞাগারে প্রবেশকালেও মাইকেল এতখানি মায়ার প্রভাব আমদানি করিয়াছেন। এইখানে মধুসূদন স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাল্মীকির অঙ্কিত চিত্রটিকে একেবারে বিপরীত আঁকিয়াছেন। মধুসূদনের জীবনচরিতকারের মতে মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গই সমস্ত কাব্যের মধ্যে নিকৃষ্ট, এবং তাঁহার এইরূপ অভিমতের প্রধান কারণই হইল, এই সর্গে অঙ্কিত রাম ও লক্ষ্মণ-চরিত্রের চরম অবনতির চিত্র। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, চরিত্র-সন্নিবেশ-ব্যাপারে মধুসূদন যে এক মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ হইল, বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া হোমরকে অনুসরণ করার চেষ্টা। ক্ষুদ্রমতি ট্রয়বাসিগণ মহাপ্রাণ গ্রীকদিগকে ন্যায়যুদ্ধে বিনাশ করিবে, ইহা যেমন ইলিয়াডের কবি সহ্য করিতে পারেন নাই, তেমনি "ক্ষুদ্র নর" লক্ষ্মণ যে ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদকে ন্যায়-যুদ্ধে বধ করিবে, মধুসূদনও ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই অনুকরণ বা অনুসরণের ঝোঁকে

পড়িয়া কবি লক্ষ্মণ-চরিত্রটিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং এই সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ এ মন্তব্যও করিতে ছাড়েন নাই যে, নায়কের গৌরব বাড়াইতে হইলে প্রতিনায়কেরও যে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়—এ বিষয়ে কবি একবারও অবহিত হইলেন না।

কিন্তু আবার এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের বিশ্লেষণে এই লক্ষ্মণ-চরিত্র-চিত্রণের অনেক যৌক্তিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন: "লক্ষ্মণ ধর্মভীরু নয়,—বরং ধর্মবলদৃপ্ত; দেবতাদের আনুকুল্য তাহার নিকট দয়া বা অনুগ্রহ নয়, সে যেন তাঁহাদেরই অবশ্যকর্তব্য কর্ম। লক্ষ্মণের দেবভক্তি ন্যায়-নিষ্ঠারই নামান্তর; সে একমাত্র এই ন্যায়ধর্মের বিশ্বাসেই বলীয়ান্ —ইন্দ্রজিৎ যেমন একমাত্র বীরধর্মের সেবক; অন্যায়ের দণ্ডবিধান করিয়া এই ন্যায়ধর্মের উদ্ধার করিতে সে দৃঢ়পণ ও একাগ্রমনা। মধুসূদন তাঁহার কাব্যে সর্বত্র লক্ষ্মণকে এই বিশিষ্ট গৌরব দান করিয়াছেন। এই লক্ষ্মণ এ-কাব্যে প্রায় সর্বত্র 'সৌমিত্রি কেশরী' ও 'দেবাকৃতি রথী' প্রভৃতি নিত্য-বিশেষণে কবিকর্তৃক ভূষিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ-চরিত্রের এই বিশিষ্ট গৌরব যেমন মূল রামায়ণেই কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এজন্য লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার একটা সহজ সহানুভূতি আছে, তেমনই লক্ষ্মণের এই গৌরবরক্ষা তাঁহার এই কাব্যের জন্যও প্রয়োজন হইয়াছিল। যে মেঘনাদকে বধ করিবে, তাহাকে সাধারণ বীর হইলে চলিবে না; নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল সমকক্ষ নয়, কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর না হইলে নায়কের গৌরব বৃদ্ধি হয় না—এ-নীতি বা রীতি অতিশয় সাধারণ কবিকেও মানিতে হয়। কিন্তু এই গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া—বিশেষতঃ আর্য-রামায়ণ-বর্ণিত লক্ষ্মণ-চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ত্যাগ করিতে না পারিয়া, মধুসূদন বড় বিপদে পরিয়াছেন। একদিকে এই শ্রদ্ধা ও লক্ষ্মণের গৌরবরক্ষার প্রয়োজন, অপরদিকে তাঁহার কল্পনার মুখ্য অভিপ্রায়সাধন—এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সংগতি রক্ষা করিতে পারেন নাই—বরং তিনি যে নিরুপায় হইয়াই লক্ষ্মণকে এমন কলঙ্কের ভাগী করিয়াছেন, যাহা তাঁহারই কল্পিত চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী—সে বিষয়ে কবিও পূর্ণ সজ্ঞান। কবিকে যে মানস সংকটে পড়িতে হইয়াছিল তাহা এইরূপ: ইন্দ্রজিতের নিধন লক্ষ্মণের হাতেই হইতে হইবে, অথচ ইন্দ্রজিৎ অজেয়—একরূপ অমর বলিলেই হয়। স্বর্গে, মর্ত্যে কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করে না। সেই ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্মণ মারিবে কেমন করিয়া? বাল্মীকির রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ দুর্জয় হইলেও অজেয় নয়; নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ নামক একরূপ যাদু বা মায়াঘটিত প্রক্রিয়ার দ্বারাই সে বারবার অজেয় হইয়া উঠে। মধুসূদনের মেঘনাদ অত ছোট নয়; সে তাহার নিজশক্তিতেই দুর্জয়—অতএব এই ইন্দ্রজিতকে যে বধ করিবে, তাহার কেবল অসাধারণ বীরযোদ্ধা হইলেই চলিবে না, কারণ সম্মুখ যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহার বধসাধন অসম্ভব। কবি মেঘনাদ সম্বন্ধে যদি এই ধারণা শেষ পর্যন্ত বজায় না রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার কল্পনারই অঙ্গহানি হয়। অতএব লক্ষ্মণকে কাপুরুষের মত কাজ করিতেই হইবে। * * * মেঘনাদের এই হত্যা-ব্যাপারটিকে দুরূহ ও দুঃসাধ্য করিবার জন্য কবি-কল্পনা সর্বাধিক আয়াস স্বীকার করিয়াছে। ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধে পরাস্তক রিবার জন্য নয়—হত্যা করিবার জন্যও দেব-অস্ত্র চাই; লঙ্কার পুর-প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া অদৃশ্যভাবে রাবণের পুরীতে ও মেঘনাদের যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিবার জন্যই নয়—হত্যাকালে মেঘনাদকে মোহিনীমায়ায় অবশ ও বিমূঢ় করিবার জন্যও শক্তীশ্বরী মায়ার সাক্ষাৎ ও সহায়তা চাই; এবং সর্বশেষে হত্যাকারী হইবার

জন্যও লক্ষ্মণের মত 'দেবাকৃতি রথী'কে চাই, এবং সেই মহারথী 'তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশমালী' হইলেই চলিবে না, তাহাকে তাহার চরিত্রের শুচিতা, সংকল্পের দৃঢ়তা ও ধর্মবিশ্বাসের অটলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে—চণ্ডীর দেউলে পূজা দিয়া লক্ষ্মণকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। শেষোক্ত ঘটনাটি উদ্ভাবনায় কবি যেন লক্ষ্মণ-চরিত্রে কলঙ্ক-লেপনের পূর্বে তাঁহার চরিত্র-বল ও হৃদয়-বলের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন সৃষ্টি করিয়া আত্মদোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন। * * * লক্ষ্মণের এই কীর্তি যেন মেঘনাদকে হত্যা করার অপকীর্তিকে কতকটা সহনীয় করিবে।"

এখানে দেখা যায়, মোহিতলাল নূতন দৃষ্টিতে লক্ষ্মণ-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া মধুসূদনকে যে ত্রুটি হইতে অনেকখানি অব্যাহতি দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আর্য-রামায়ণের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ ও কিঞ্চিৎ রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য যোগীন্দ্রনাথ সে ত্রুটি একেবারে অমার্জনীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, কবি যে কেবল প্রয়োজনানুরোধেই লক্ষ্মণ-চরিত্রের পরিবর্তন অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নহে, পাঠকের মনে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া অনুমান করিয়া চরিত্রটিকে বাঁচাইবার মত যথেষ্ট উপকরণও তাঁহার কাব্যের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। একথা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য যে ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণ নহে, মেঘনাদই কবির প্রধান লক্ষ্য। লক্ষ্মণের প্রাপ্য তিনি পঞ্চম সর্গেই মিটাইয়া দিয়াছেন। এখানে ঘটিবে কবির মানসপুত্র মেঘনাদের মৃত্যু—"death of my favourite Indrojit," সুতরাং নায়ক-চরিত্রের চরম বিকাশই তাঁহার মূল লক্ষ্য; আর যা কিছু, সমস্তই হইবে ঐ বিকাশের সহায়ক। তবে প্রতিনায়কের চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নায়কের মহিমাবৃদ্ধির চেষ্টার মধ্যে কবির যে দুর্বলতার সন্ধান অনেকেই খুঁজিয়াছেন, তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে, এখানে, বিশেষতঃ ষষ্ঠ সর্গে, প্রতিনায়ক কেবল রামানুজ লক্ষ্মণ নহেন,—কেবল 'দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী'ও নহেন,—দৈব-নির্দেশের অধীন, দৈব-চালিত প্রাক্তনের যন্ত্রস্বরূপ, মহামায়ার প্রত্যক্ষ পরিচালনায় যাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত—এমন লক্ষ্মণ। সুতরাং, প্রতিপক্ষ বলিতে দৈবশক্তিই মুখ্য, লক্ষ্মণ গৌণ। কেন কবি এরূপ করিলেন, সে প্রশ্ন অবান্তর। স্রষ্টা যে হয়, সে তাহার প্রতিভাবলে কিছু নূতনই করিয়া থাকে—তা যাহাই বর্জন করুক, আর, যাহাই অনুসরণ করুক। আমাদের দেখিতে হইবে কোন্ চরিত্র কি সূত্র অনুযায়ী—নির্মিত হইয়াছে, এবং সেই সূত্র অনুসারে, কোন অসংগতি আছে কি না, ইহাই বিচার্য।

রাবণ

আর এক সমস্যাপূর্ণ চরিত্র হইল মাইকেলের "রাবণ"। তবে লক্ষ্মণ-সমস্যা ও রাবণ-সমস্যা একেবারেই ভিন্নপ্রকৃতির। প্রথমটিতে কবির পর্যাপ্ত শ্রদ্ধার অভাবে পাঠক ক্ষুণ্ণ; আর দ্বিতীয়টিতে পাঠকের শ্রদ্ধার অভাবে কবি-হৃদয় ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা। মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ রামায়ণের রাবণ হইতে বহুলাংশে বিভিন্ন। রামায়ণের রাবণ পরম অধর্মাচারী দুর্ধর্ষ রাক্ষসবিশেষ। সেখানে তাহার পাপী-চিত্রই সমধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং কবির যত কিছু প্রয়াস সবই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত। রামায়ণ-ভক্ত বাঙালী পাঠক যুগ যুগ ধরিয়া রাবণ সম্বন্ধে এই ধারণাই পোষণ করিয়া আসিয়াছে যে, সে হইল পাপ ও অধর্মের মূর্তি, তাহার পথে চলিলে মানুষের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। রাম

ধর্ম, রাবণ অধর্ম ; সুতরাং 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'। এ-হেন রাবণের মধ্যে যে শ্রদ্ধার যোগ্য কিছু থাকিতে পারে ইহা সাধারণের ধারণাতেই আসে না ; তাই মাইকেলের রাবণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকিলেও পাঠক তাহার অনুসন্ধান না করিয়া, উহাকে রামায়ণের রাবণ হইতে অভিন্ন মনে করিয়া উহার মধ্যে মিলটনের শয়তান, সেক্‌সপীয়রের ম্যাকবেথ, আবার কেহ বা, নেপোলিয়ন, হিটলার প্রভৃতিরও ছবি আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ স্পষ্টই মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন ঃ "ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়—রাবণ-চরিত্রের ইহাই শিক্ষা এবং সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যেরও এই উপদেশ ও পরিণাম।" কোথাও আবার দেখিতে পাই রাবণ সম্বন্ধে কিছু ঘোরালো মন্তব্য করিবার জন্য 'বিশ্ব-বিধানকে বিচলিত করিলে বিশ্বনিয়ন্তার হস্তে দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়'—ইত্যাদি রকমের কথা বলিয়া কেবলমাত্র রাবণের বীরত্বের উপর কিয়ৎক্ষণ ঢক্কা-নিনাদ করিয়াই তাহার সম্বন্ধে বিচার শেষ করা হইয়াছে।

কিন্তু কেবল ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যের মানদণ্ড দিয়া এই রাবণের সঠিক পরিমাপ সম্ভব নহে। মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্ঠচরিত্র মেঘনাদ হইলেও রাবণই উহার মূল আশ্রয়। কাব্যখানির মূল প্রেরণার উৎস মেঘনাদ নহে, রাবণ। তার নয়টি সর্গে বিস্তারিত কাব্যখানির মাত্র তিনটিতে মেঘনাদকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, আর, রাবণ ইহার সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত,—রাবণেই ইহার আরম্ভ, রাবণেই ইহার পরিসমাপ্তি। এই কাব্যের মূল প্রেরণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বিশেষ মূল্যবান্ ঃ "মেঘনাদবধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। * * * তিনি [মধুসূদন] স্বতঃস্ফূর্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। * * * এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য ; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে ; ইহার রথ-রথি-অশ্বে-গজে পৃথিবী কম্পমান ; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। * * * যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্ত মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

"এই 'অটল শক্তি'-ই রাবণ, এবং মেঘনাদবধে ইহারই বন্দনা গীত হইয়াছে, ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যের বিচার ইহার লক্ষ্য নহে।" মাইকেল-বর্ণিত রাবণ অসভ্য বর্বর রাক্ষস নহে, এক বিশেষ সংস্কৃতিসম্পন্ন বীর রাক্ষসজাতির শক্তিশালী অধিনায়ক। তাহার রাজসভার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, সে কেবল অতুল ঐশ্বর্যেরই অধিকারী নহে, সভ্য মার্জিত রুচি ও উন্নত কৃষ্টিরও অধিকারী। তাহার রাজপুরী স্বর্ণ-লঙ্কা—এককথায় অমরাবতী তুল্য। রামায়ণের রাবণও কাঁদিয়াছে, কিন্তু সে কান্না পাঠক আনন্দে উপভোগ করে, কারণ সে দেখে পাপী তাহার সমুচিত ফল পাইতেছে। কিন্তু এই কাব্যের রাবণকে এক কথায় কেবল পাপী বলিবার উপায় নাই। এ রাবণ কেবল রাজা নহে,—সুকৌশলী শাসক, বাৎসল্যময় পিতা, স্নেহার্দ্র ভ্রাতা, দৈব-বিনীত মর্ত্যের মানুষ, নৈষ্ঠিক গৃহস্থ ও সর্বোপরি এক অমিত-শক্তিশালী পুরুষ। মধুসূদন রাবণকে কাঁদাইয়াছেন, কিন্তু ইহা অনুতপ্ত পাপীর বিলাপ নহে,—ইহা

নিয়তি-পীড়িত ভাগ্যহত মানুষের ক্রন্দন। তাহার শক্তি ও পৌরুষের সীমা নাই; কিন্তু অনন্ত সম্ভাবনা থাকিতেও তাহাকে দিন দিন হীনবল হইতে হইয়াছে—চোখের উপর তাহার সাজানো বাগান শুকাইয়া যাইতেছে"—। যে ত্রিভুবন-বিজয়ী রক্ষকুলপতি, তাহার কি না ভিখারী রাঘবের নিকট পরাজয় ঘটিবে—ইহা কি সে সহ্য করিতে পারে? তাই দেখা যায় এই অমিততেজা ব্যক্তিপুরুষ ব্যথাহত হইয়া নিষ্ফলভাবে তাহার পতন হইতে রক্ষার উপায় খুঁজিয়া ফিরিতেছে,—এবং ইহা যে সবই নিয়তির লীলা ইহা বুঝিতে বাধ্য হইয়া বারবার সেই অদৃশ্য নিষ্ঠুর বিধি-বিধানকে গভীর দীর্ঘশ্বাসে জর্জরিত করিতেছে! রাবণের এই ব্যর্থতাজনিত ক্ষোভ, তাহার এই নিদারুণ ট্রাজেডি, বহিঃশক্তির নিষ্ঠুর প্রতিকূলতায় ব্যক্তিপুরুষের শক্তির অবমাননামূলক যে চিরন্তন ট্রাজেডি, তাহারই প্রতিরূপ।

রাবণের যে পাপ, ন্যায় ও নীতির বিচারে গুরুতর, রাবণের নিজের নিকট তাহার কোন গুরুত্বই ধরা পড়ে না, সে যেন তাহার দর্পিত পৌরুষের লীলামাত্র। ইহাকে শক্তি-মদ-মত্ততা বলিলেও ইহার প্রতি অবিচার করা হয়, সূক্ষ্মবিচারে ইহা কেবল শক্তিমানের স্বধর্মানুসরণ; এবং এই অনুসরণের পথ সাধারণ মানুষের পথ হইতে ভিন্ন। কারণ সাধারণ মানুষকে ন্যায়-নীতির বিধি-বিধান মানিয়া চলিতেই হয়, কিন্তু রাবণের ন্যায় শক্তিমান্ পুরুষের পথও যেমন একান্তরূপে ঋজু ও নিষ্কণ্টক হইতে পারে না, এই পথের পথিকের পক্ষেও তেমনি সাময়িক উন্মার্গতা আদৌ অস্বাভাবিক নহে।

যে সীতাহরণ রাবণের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক, এবং যাহাতে তাহার উন্মার্গ-গমনের এক জঘন্য রূপই প্রকটিত, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, উহা নিছক পরস্ত্রী-হরণের পৈশাচিক লালসার ফলে ঘটে নাই। ভগ্নী সূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই শক্তি-সম্রাট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শক্তি-সাগর উদ্বেলিত হইয়াছিল। তাই দেখা যায়, পরাভবের ধাপে ধাপে নিক্ষিপ্ত হইবার সময়, রাবণ সূর্পণখাকেই তাহার সর্বনাশের জন্য দায়ী করিতেছে:

"হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে?"

নচেৎ সীতার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা বা কোনরূপ কুৎসিত মনোভাব রাবণের অতি বড় শত্রুও খুঁজিয়া পাইবে না। সীতা রাবণের চোখে 'পাবক-শিখা-রূপিণী জানকী'; অর্থাৎ তাহার চোখে জানকীর কেবল অগ্নিশিখাসদৃশ রূপ, অথবা তাহার মনে কেবল ঐ শিখার দাহিকাশক্তির ন্যায় সীতাস্পর্শের সর্বনাশা পরিণামের কথাই জাগে নাই, অগ্নিশিখার ন্যায় সীতার সতীত্বের তেজ ও পবিত্রতার কথাও জাগিয়াছে। সরমার নিকট বর্ণনার সময়ে সীতাদেবীর মুখে রাবণের যে চরম কলঙ্ক বর্ণিত হইতে দেখি, তাহার মধ্যেও বিশ্লেষণ করিলে রাবণের লম্পট-মূর্তি অপেক্ষা স্বীয় পরাক্রম-মুগ্ধ পুরুষের রূপই বড় হইয়া উঠে;

"কহিল রাঘব-রিপু; 'ইন্দীবর-আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম! জগত বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!

নিজদোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন !
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে ?"

এই বচনগুলি বিশেষতঃ ইহার প্রথমাংশ যে রাবণ চরিত্রের কলঙ্ক এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথম কথা, এ জগতে সম্পূর্ণ অকলঙ্ক কে? দ্বিতীয় কথা, রাবণের এই কার্যের মূল লাম্পট্য নহে, শক্তির উন্মাদনা—ইহাকে অন্য ভাষায় Chivalry বলিলেও বলা যায়; কারণ বক্তার এই মুহূর্তের মনোভাবের মধ্যে আছে শক্তি-পরীক্ষায় এক অদ্বিতীয় বরাঙ্গনার প্রশংসা-অর্জনের স্পৃহা, আর ইহার অন্তর্নিহিত মহত্বটুকু ফুটিয়াছে উক্তিটির শেষাংশে যেখানে রাবণ প্রকৃত বীরের ন্যায় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সম্ভ্রমও দেখাইয়াছে, আবার তাহার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশও করিয়াছে। মোহিতলালের মন্তব্য হইল, মেঘনাদবধের রাবণের মধ্যে এই সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ যত বড় শক্তিমান্ হউক, নিয়তির হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই; সে-নিয়তি তাহার নিজের মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাই সে পরাজয় এত মর্মভেদী। এই শক্তির মহিমায় কবিহৃদয় যে আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনই মানুষের যে দুর্ব্বলতা তাহার মনুষ্যত্বের নিদান তাহাও তাঁহাকে সমধিক ব্যাকুল করিয়াছে; এমন কি, ইহাই যেন এ কাব্যের মূল গীতিসুর।

বস্তুতঃ, পাপ বা অধর্মের পরিণাম দেখানোই এ-কাব্যের অভিপ্রায় নহে। 'রাবণেরও একটা ধর্ম আছে, কেবল সে-ধর্ম রামের ধর্ম হইতে পৃথক। রাবণেরও ইষ্টদেবতা আছে; সে রামের চেয়ে বড় ভক্ত। সে নিজে যেমন সরল-অবোধ ও অবাধ প্রাণশক্তির আধার, তাহার ইষ্টদেবতা মহাদেবও তেমনই আত্মভোলা, আশুতোষ—ক্রোধে রুদ্র, স্নেহে অন্ধ। সে সেই দেবতার নিকটে কোন গোপন সাহায্য বা ষড়যন্ত্রের আশ্বাসে নিজের ভয় ও দুর্বলতা দমন করিতে চায় না; দারুণ দুর্যোগের দিনেও তাঁহার প্রতি রাবণের বিশ্বাস অটল। এ ভক্তি বীরের ভক্তি, ইহার মধ্যে দীনতা বা কাঙালপনা নাই।'

এইভাবে সংস্কারমুক্ত মন লইয়া রাবণের বিশাল ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ করিলে এমন সমস্ত মানবীয় ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যেগুলির নিকট ঐ এক সীতাহরণের পাপ লঘু হইতে বাধ্য। এই পাপস্পর্শের মূল কারণ যে রাবণের স্বীয় পৌরুষাস্বাদনের দুর্বার আগ্রহ, ইহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। এই একটি কলঙ্কের কথা বাদ দিয়া রাবণকে দেখিলে তাহার যে মহিমময় মূর্তি আমাদের চোখে পড়ে, মেঘনাদবধের কবি তাহাকেই আপন কাব্যের কেন্দ্রস্থলে রাজসিংহাসনে বসাইয়া মৃণালভুজে সুচারু চামর-ধারিণী চন্দ্রাননা চারুলোচনা কিঙ্করী, কন্দর্প-কান্তি ছত্রধর ও পাণ্ডব-শিবিরদ্বারে রুদ্রেশ্বর-সদৃশ দৌবারিকের নিত্যসেবায় আপ্যায়িত করিয়াছেন। পারিবারিক জীবনেও তাহার সৌভাগের তুলনা নাই। সেখানে কেবল চিত্রাঙ্গদাই সৃষ্টিছাড়া; নচেৎ 'ভক্তভৃত্য, পতি-কুল-গরবিনী মূর্তিমতী জয়শ্রীর মত পুত্রবধূ, ভক্তিমান বীর্যবান আদর্শ পুত্র, এবং সমদুঃখভাগিনী সাধ্বী পত্নী—এই সকলকে লইয়াই রাবণ; ইহারাই তাহার জীবন-মুকুটের রশ্মিচ্ছটা।'—এই রাবণকে, তাহার যত দোষই থাকুক, কিরূপে আমরা দুর্ধর্ষ রাক্ষস বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে পারি, ইহাই মধুসূদনকে বিচলিত করিয়াছিল। আর, এই চরিত্রের প্রতি কবির আকর্ষণের আরও যে বড় কারণ রহিয়াছে, তাহা হইল, ইহার মর্মান্তিক ট্রাজেডি। পৃথিবীর সমস্ত ট্রাজেডির ন্যায় ইহারও মূলে আছে এক প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। একদিকে অটল শক্তি, অসীম তেজ, অপরিমেয় পৌরুষ,—যাহার প্রভাবে ত্রিভুবন কম্পিত—যাহার

নিকট অসাধ্য বলিয়া কিছু নাই—এবং যাহা ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় চিরকাল দুই তটের বন্ধনে থাকিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে তটরেখা নিমজ্জিত করিয়া উদ্দাম প্লাবনের মধ্যে আপন শক্তির এক উদ্‌ভ্রান্ত রূপ রচনা করে,—অপরদিকে স্নেহ-বাৎসল্য-প্রেম-প্রীতি-দয়া-দাক্ষিণ্য লইয়া, আর দশজনের ন্যায়, সুখ শান্তির নীড়-রচনা। এ দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য মানুষের ভাগ্যে ঘটে না, ঘটিতে পারে না। যদি শক্তিদন্ত পৌরুষ চাও, তবে আবার স্নেহ-দৌর্বল্য কেন? অজস্র শক্তি অর্জন করিয়াছ, তাহারই চর্চা কর, সংগ্রামের পর সংগ্রাম চালাও, কে মরিল, কে বাঁচিল সেদিকে তাকাইও না,—মিল্টনের Satan-এর ন্যায় হুংকার দাও "To be weak is miserable doing or suffering,"—তাহাতে যদি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হয়, তাহাতে তো পরাজয় নাই, tragedy তোমার কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না, দম্ভের জয়জয়কারে Satan-এর ন্যায় তোমার জীবনও successful হইবে! কিন্তু রাবণ তো Satan হইতে পারিল না! তাহার বহির্জীবন দুর্দান্ত সাফল্যে মণ্ডিত, কিন্তু অন্তর্জীবনে সর্বদাই ঝড় বহিতেছে। বীর-পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুর পর সপ্তম সর্গে তাহার অদ্ভুত বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও জয়জয়কার দেখিয়া কে বলিবে রাবণের মধ্যে tragedy আছে? অমন সাফল্যের জীবন কি ট্রাজিক হইতে পারে? কিন্তু যে অন্তর্জীবনের ঝড় হৃৎকন্দরে রুদ্ধ রাখিয়া সপ্তম সর্গে রাবণ যুদ্ধ করিল, নবম সর্গে দেখা যায়, তাহাই উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া দশানন-মহীরুহকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ঝড়ে-ভাঙা রাবণকে আমরা দেখি তাহার শেষ উক্তির মধ্যে:

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে—
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর! কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার!' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষকুলপতি?—
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি ক'য়ে?"

রাবণ-চিত্তের এই বক্ষোভেদী হাহাকারকে লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : 'কবি সেই ধর্ম-বিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।' তবে এই পরাভবের স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমরা পূর্বে যে দ্বন্দ্বের কথা বলিয়াছি তাহা স্মরণ করিতে হইবে। কেবল রাবণের অনেক আশা ছিল, সবই ব্যর্থ হইল, ইহাই এ হাহাকারের পূর্ণতম ব্যঞ্জনা নহে ; যে শক্তিমান্ পুরুষ শক্তিদম্ভে মত্ত ও আপন শক্তিসাফল্যে বিভোর থাকিয়া পুত্র-পুত্রবধূর বিয়োগ, পত্নীর মনোবেদনা ইত্যাদি তুচ্ছ করিতে পারিত, সে যে স্নেহ-দৌর্বল্যে তাহা পারিল না, এবং এই সমস্ত আশাভঙ্গের মূলে রহিয়াছে যে বিধি-বিধান তাহাকে সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না—এইখানেই রাবণ-চরিত্রের আসল ট্রাজেডি, আর ইহাই চরিত্রটির প্রকৃত স্বরূপ-আত্মা।

রাম

মধুসূদনের রাম, এক কথায়, "ভিখারী রাঘব"। সমগ্র রামায়ণের যিনি নায়ক সেই রামচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণে কবি আদৌ নিরপেক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। মাইকেলের রামচন্দ্র বাল্মীকির রামচন্দ্র নয়, কৃত্তিবাসের রামচন্দ্রও নয়। বাল্মীকির রাম স্থির, ধীর, বীর ; একটি বজ্রসার, নির্ভীক, শক্তিমান পুরুষ। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্রেও বীরত্ব আছে ; কিন্তু তাহা বাঙালী-জীবনের স্বাভাবিক কোমলতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া ফুটিয়াছে। সাধারণ পাঠকের অভিমত, মেঘনাদবধ কাব্যের কবি রামচন্দ্রকে মসীলিপ্ত করিয়া আঁকিয়াছেন। তাঁহার রামচন্দ্র ভীরু, কাপুরুষ, অধীর এবং এক হিসাবে গুপ্তহত্যার প্রশ্রয়দাতা। সামান্য কারণেই ইনি অধীর হইয়া পড়েন। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া, সীতাকে উদ্ধার না করিয়াই ইনি যেন পৈতৃক প্রাণ কয়টি লইয়া পলাইয়া যাইতে চাহেন। শুধু লক্ষণ ও বিভীষণই তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরিয়া রাখিয়াছেন। এত বড় বীর তিনি—যে, প্রমীলার নারী-সৈন্যদের দেখিয়াই ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। প্রমীলা যে নারী-যোদ্ধাটিকে হনুমানের সহিত দূতীরূপে রামশিবিরে পাঠাইয়াছিলেন, সে শিবির ত্যাগ করিয়া যাইবার পর রাম স্বস্তি বোধ করেন।

তাহার পর লক্ষ্মণ যখন মায়াদেবীর স্বপ্ন-নির্দেশে সশস্ত্র একাকী লঙ্কার বনগহনে প্রবেশ করিয়া দেবী-মন্দিরে দেবীপূজা করিতে যাইবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন তখন তিনি গলদশ্রুলোচনে তাঁহাকে যে-ভাবে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহা কোন ক্রমেই বীরোচিত নহে, সে যেন অদৃষ্টবাদী কাপুরুষের অনুমতি প্রদান।

এইভাবে দেখিতে আরম্ভ করিলে এই কাব্যের রাম-চরিত্রের প্রশংসনীয় কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে। একদিকে ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের বীরত্ব ও মহত্ত্ব ফুটিতেছে, আর একদিকে রামের প্রতিটি কথায় আচরণে দুর্বলতাই বড় হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে সাধারণ বাঙালী পাঠকের অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবারই কথা, এবং খুব বেশীর ভাগ পাঠক ইহার জন্য বিধর্মী মধুসূদনের খেয়ালী পক্ষপাতিত্বকেই দায়ী করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা হইল ধর্মত্যাগী মধুসূদনের হিন্দুর এই দেবতাবৎ চরিত্রটির প্রতি এক মজ্জাগত বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই তিনি রাম-চরিত্র এমন কলঙ্কিত করিয়া আঁকিয়াছেন। কিন্তু সমালোচককেও নিরপেক্ষ ও সমাহিত হইয়া মন্তব্য করিতে হইবে। রামের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গী

প্রসঙ্গে ডাঃ সুকুমার সেন ঠিকই বলিয়াছেন, 'যে সকল সমালোচক মধুসূদনের কথা—I hate Ram and his rabble—ধরিয়া মনে করিয়া থাকেন যে রামের উপর মধুসূদনের বিদ্বেষ ছিল, তাই তিনি রামকে কাব্যের নায়ক করেন নাই, এবং সেই হেতু রাম-চরিত্রের অবমাননা করিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করেন'। * * * সত্য বটে যে লঙ্কার যুদ্ধরত রামের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল না এবং যতটুকু ছিল তাহাও বন্দিনী সীতার খাতিরে। কিন্তু তাহার কারণ বাল্মীকির মহাকাব্যে অঙ্কিত রাম-চরিত্রের কোন দৌর্বল্যের জন্য নহে, তাহার কারণ রামের বানর-কাহিনী, * * * সুতরাং মধুসূদন যে লিখিয়াছেন, 'I despise Ram and his rabble' তাহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে,—'I despise Ram because of his rabble.'

তাহা ছাড়া, এই কাব্যে কবির যত কিছু কল্পনার নবীনত্ব প্রায় সবই রাবণ, ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার জন্য। তাঁহার কাব্যের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য এইগুলিকে তিনি মনের মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন ; আর রাম-পক্ষীয়ের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহাকে যা একটু নজর রাখিতে হইয়াছে, নচেৎ রামকে তিনি যেমনটি পাইয়াছেন তেমনটিই রাখিয়াছেন, এবং এ ব্যাপারে তাঁহার রামের আদর্শের যোগানদার যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাহা নিতান্তই সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রভাবিত কৃত্তিবাসের হাতে রামের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, মধুসূদন যে তাঁহার রামকে তদপেক্ষা দুর্বল-চরিত্র প্রদান করিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। তবে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের হীনতা আমাদের চোখে পড়ে না তাহার কারণ রামচন্দ্র সেখানে আমাদের চোখে দেবতাতুল্য এবং রাবণ প্রভৃতি হইল অসভ্য নীচ জাতীয় রাক্ষস মাত্র, আর এখানে রামের হীনতা চোখে ফুটিবার কারণ, রাম এখানে রীতিমত মানুষ, যে মানুষ এক বিরাট যুদ্ধের এক পক্ষের নায়কত্ব করিতেছেন ; সুতরাং বীরত্বপূর্ণ মনুষ্যত্বই তাঁহার নিকট সকলেই আশা করে ; অথচ এখানে রামের প্রতিপক্ষকেই কেবল মহত্তর করা হইয়াছে,—রাম সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণে যা ছিলেন তাই আছেন। নচেৎ, রাম কেন বীরের ন্যায় পত্নী-উদ্ধারের সংকল্পে দৃঢ় থাকিয়া নির্ভীক বীরত্বপূর্ণ উক্তিতে সকলকে সর্বদা উৎসাহিত করার পরিবর্তে এমনভাবে পদে পদে ভীত, কণ্টকিত, সামান্য বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিভীষণের শরণাপন্ন হন,—এমন প্রশ্ন তুলিয়া কেবল অনর্থক কবির উপর দোষারোপ করা হয়। রামের এইরূপ কোমল-পেলব-কাতর মূর্তিই আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে দেখিতে পাই। যাঁহারা মনে করেন, নিরস্ত্র পূজারত ইন্দ্রজিতকে সাপের মত খোঁচাইয়া মারিবার পরিকল্পনা সমর্থন করায় রামের মনুষ্যত্ব এখানে নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের ভুলিলে চলিবে না, "রাম-লক্ষণ প্রভৃতির চক্ষে মেঘনাদ একটা দুর্ধর্ষ রাক্ষস মাত্র, সে যেন 'দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস' একটা কালান্তক পুরুষ—কালিদাসের ভাষায় 'উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিত'।" [মোহিতলাল]। সুতরাং এমন মেঘনাদকে যে কোন উপায়ে বধ করিবার কল্পনায় যুক্তি থাকিতে পারে না এমন নহে।

বাস্তবিকই রাবণ ও ইন্দ্রজিতের পাশে রাম-চরিত্রটি ম্লান হইতে পারে, কিন্তু কবি স্বেচ্ছায় ইহার অবমাননাই করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। রাম এ কাব্যে দেব-নির্ভর মানুষ। রাম নিষ্পাপ, রাম ধার্মিক। দেবদূত চিত্ররথের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার উপায় জানিতে চাহিলে তিনি যখন বলেন, 'দেব-প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র পালন, ইন্দ্রিয় দমন, ধর্মপথে সদা গতি, নিত্য সত্য-দেবী-সেবা'—

তখন আমাদের বুঝিতে হয় স্বয়ং রামচন্দ্রই এই সমস্ত গুণে ভূষিত। সুতরাং দেবদূতের মুখে রামচরিত্রের এই ইঙ্গিতদানের মধ্যে কবিহৃদয়ের পরোক্ষ শ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইয়াছে।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার দূতী নৃমুণ্ডমালিনী ও রামচন্দ্রের কথোপকথনের মধ্যেও আমরা কবিমনের এমন একটি পরিচয় পাই যাহাতে মধুসূদনকে রামের প্রতি একান্তই বিরূপ ও বীতশ্রদ্ধ এমন কথা বলা চলে না। এখানে দূতীও যেমন 'প্রণমি আমি রাঘবের পদে', 'বীর-শ্রেষ্ঠ তুমি রঘুনাথ' ইত্যাদি কথায় পর্যাপ্ত শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে, 'বীর দাশরথি'ও তেমনি প্রথমেই আশীর্বাদ করিয়া শিষ্ট আচরণ ও ঔদার্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মহাপুরুষোচিত উদারতার বশবর্তী হইয়া তিনি যে কেবল প্রমীলা-বাহিনীকে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা নহে, প্রমীলার পতি-ভক্তি, শক্তি ও বীরপণার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাও করিয়াছেন। তাঁহার পরিমিত সময়োচিত ভাষণের উপসংহারে শক্তিমান পুরুষের সনাতন পদ্ধতিতে দূতী ও তাহার মাধ্যমে প্রমীলাকে "সুখে থাক, আশীর্বাদ করি!" এইরূপ বরদানের মধ্যে এবং সর্বশেষে হনূমানের প্রতি 'দেহ ছাড়ি পথ, বলি; অতি সাবধানে শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।'—এই নির্দেশের মধ্যে আর কিছু না থাকুক, কবি যে রামকে সর্বদাই কলঙ্কিত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া ছিলেন, এমন ধারণাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিবার শক্তিশালী উপকরণ রহিয়াছে।

এইবার আমাদের এই আলোচনার প্রথম অনুচ্ছেদে লিখিত মন্তব্য—অর্থাৎ 'এত বড় বীর তিনি যে, প্রমীলার নারীসৈন্যদের দেখিয়াই ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল,'—এই কথাটি আর একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই ধরণের মন্তব্যকারিগণ ছিদ্রানুসন্ধী মন লইয়া কেবল কোথায় রামচরিত্রের দুর্বলতা আছে, তাহা দেখাইয়াই মধুসূদনের রাম-চরিত্র-বিশ্লেষণ শেষ করিয়াছেন। যেখানে রাম ঐরূপ ভয় প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে তাঁহার উক্তির মধ্যে প্রকৃত ভয় অপেক্ষা কৌতুক ও বিস্ময়গর্ভ প্রশংসাই বড় হইয়াছে।

এই রামের আর একটি অনপনেয় কলঙ্ক বলিয়া যেটি বহুস্থানে উদ্ধৃত হয় সেটি হইল রামের বহুবার কথিত উক্তি, "নাহি কাজ প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি।" অর্থাৎ অভিযোগটি হইল, এত বড় একটা যুদ্ধের যিনি নায়ক, তিনি কোথায় দুঃখ, আঘাত, ধ্বংসের বিভীষিকা ইত্যাদি অগ্রাহ্য করিয়া সর্বদা অটল থাকিবেন, তা না হইয়া, তিনি কি না বন্দিনী স্ত্রীকে ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে চাহেন? কিন্তু এই উক্তির এইরূপ ব্যঞ্জনা যেমন অনুদার, তেমনি অসমীচীন। শক্তিশেলে আহত প্রাণ-প্রিয় লক্ষ্মণের জীবন-সংশয় দেখিয়া যখন রাম তাঁহার বিলাপের মধ্যে এই কথা বলেন তখন কি কেবল তাঁহার যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাইবার কাপুরুষতাই আমাদের মনে জাগে? ইহার মধ্যে তাঁহার যে একটা ট্রাজিক মনোবেদনা রহিয়াছে তাহা কি আমাদের স্পর্শ করে না? নবীন যৌবনের সমস্ত সুখ-সম্ভোগ বিসর্জন দিয়া যে লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ-প্রেমকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া ধরিয়াছেন, যিনি যুবতী স্ত্রীর প্রথম প্রেমাস্বাদন তুচ্ছ করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের জন্যই চতুর্দশ বৎসর বনে বনে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন, সেই লক্ষ্মণই আজ যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, তখন ভ্রাতৃভক্ত অনুজের সেই অসামান্য ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার বিলাপের মধ্যে স্বীয় পত্নীর প্রতি যে উপেক্ষা দেখাইয়াছেন তাহা কি এতই বিসদৃশ হইয়াছে? প্রিয়তম সীতার বিসর্জনের মধ্যে যে একটা বিরাট ত্যাগ ও লক্ষ্মণকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ফিরিয়া পাওয়া ও বিমাতাকে তাঁহার নয়নমণি ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যাকুলতার মধ্যে যে ভ্রাতৃপ্রেম ও কর্তব্যবোধ

রহিয়াছে তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন? অন্যত্রও যেখানে যুদ্ধের ধ্বংসের কথা মনে আসিতেই রাম এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, সেখানেও দেখা যাইবে তাহার মূলে আছে অপরের প্রতি অর্থাৎ তাঁহার পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিতে গিয়া যাহারা প্রাণ হারাইবে, তাহাদের প্রতি অপরিসীম দরদ, সহানুভূতি ও মমতাবোধ। সীতা-উদ্ধার একান্তই রামের স্বার্থ; সুতরাং সেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেন অপরে প্রাণ হারাইবে, এই কুণ্ঠাই রামকে সর্বদা পীড়িত করিয়াছে। ইহাতে বীরত্ব ফুটিতে পারে না সত্য, কিন্তু মনের নীচতা যে নাই ইহাও অসত্য নহে।

তবে এই আলোচনা হইতে কেহ যেন একথা মনে না করেন যে, মধুসূদনের রাম-চরিত্র-চিত্রণ নির্দোষ প্রমাণ করাই এখানকার উদ্দেশ্য। আমরা কেবল বিরুদ্ধপক্ষের চূড়ান্ত মতবাদকেই খণ্ডন করিতে চাহিয়াছি। নচেৎ মধুসূদন যে এই চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই ইহা অনস্বীকার্য। স্থানে স্থানে রামকে এত অধিক মাত্রায় দুর্বল করা হইয়াছে যে, সেখানে নারীসুলভ ভীরুতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক হইতে রামকে বাঁচাইবার কোন উপায় নাই। দৈব সহায়তার প্রতিশ্রুতি, দেব-অস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত-কিছু রক্ষাকবচে মণ্ডিত করিয়াও লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধ-যাত্রায় অনুমতি দিতে গিয়া রাম যখন "হায় রে, কেমনে—যে কৃতান্তদূতে হেরি ঊর্দ্ধশ্বাসে……কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে, প্রাণাধিক?"– ইত্যাদি উক্তি করিয়া বিলাপে প্রবৃত্ত হ'ন, তখন কোন স্নেহ বা ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়া তাঁহার এই দুর্বলতাকে সমর্থন করা যায় না। রামের দেব-নির্ভরতার চিত্র আঁকিতে গিয়াও কবি বড় বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন। পদে পদে দৈব সাহায্যের বলে যে লক্ষ্মণ তস্করের ন্যায় যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া অন্যায়যুদ্ধে বা একপ্রকার বিনাযুদ্ধে মেঘনাদকে বধ করিলেন, তিনি শিবিরে ফিরিয়া আসিতেই রাম যে ভাবে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমাদেরই লজ্জা বোধ হয়; শুধু তাই নয়, তাঁহার যেন সেই মুহূর্তে মনে পড়িয়া যায়, ইহা তো সবই দেবতার কাজ, অতএব সমস্ত বাহাদুরী মানুষে নিলে দেবতা চটিতে পারেন; তাই অমনি,—

"পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্বল সতত
মানব; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে!"

এই বলিয়া যেন অপরাধ ক্ষালন করিলেন। একজন যুদ্ধ-নায়কের মুখে সর্বদা এইরূপ দৈব-তোষণ-বাণী কেবল অশোভনই নয়, নিতান্তই গ্লানিকর। 'দেব-প্রতি কৃতজ্ঞতা' একটা গুণ হইতে পারে, কিন্তু পদে পদে দৈব-মুখাপেক্ষিতা অবশ্যই পৌরুষের হানিকর, আর যুদ্ধনায়কের পক্ষে মর্মান্তিকভাবে লজ্জাকর।

তবে রামের এই দুর্বলতার চিত্রকে কবি তাঁহার কাব্যোদ্দেশ্য-সাধনে নিপুণভাবে কাজে লাগাইয়াছেন। এই কাব্যের নায়ক যে রাবণ, রাম-চরিত্রটি তাহারই এক বিপরীত চিত্র (foil) স্বরূপ। 'মমতা-জনিত' দৌর্বল্য উভয়ের মধ্যেই যোজনা করিয়া কবি দেখাইয়াছেন, রাবণের মধ্যে কেমন ভাবে 'মমতার সহিত পৌরুষের মিলনে বীরহৃদয়ের এক অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছে,' আর রামের মধ্যে এই মিলনের অভাবে পৌরুষের অবমাননা ঘটিয়াছে। রাম-সম্পর্কে মোহিতলাল বলিয়াছেন, "এ দুর্বলতার চিত্র—রাবণেরই বিপরীত দিক; * * * শুধু কাহিনীর প্রয়োজনেই

নয়, রাবণের চরিত্রকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই, অন্যান্য সকল উপকরণের মত, রামের চরিত্রও কল্পিত হইয়াছে। রামের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য রামকেই শোভা পায়; এতখানি হৃদয়-দৌর্বল্য রাবণের চরিত্রে অসম্ভব। এই দুর্বলতার চিত্র আঁকিতে গিয়া কবির বাঙালী-প্রাণ স্থানে স্থানে আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই—রামের কাহিনীতে এ কাব্যের সেই সকল অংশই সর্বাপেক্ষা কবিত্বময়, কবির হৃদয় যেন কারুণ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

৮। মধুসূদন ও অর্বাচীন কালের সাহিত্য

প্রাচীন সাহিত্যের সহিত অর্বাচীন কালের সাহিত্যের একটি প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে বুঝিতে পারা যায়,—কিন্তু কোথায় সেই প্রভেদটা, কেন সেই প্রভেদ দেখা দিল বুঝিয়া ওঠা সহজ নহে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অনুভব করিতে থাকেন, কোথায় যেন একটা পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচীন সাহিত্যের আবহাওয়া অর্বাচীন সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নির্দিষ্টভাবে দুই সাহিত্যের প্রভেদ বোঝা এবং বোঝানো কঠিন।

কালিদাসের 'শকুন্তলা' আর মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' দুই-ই মহৎ কাব্য, কিন্তু দুই-এর আবহাওয়া কি স্বতন্ত্র নয়? সোফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটক ও সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' দুই-ই মহৎ কাব্য, কিন্তু দুই-এর আবহাওয়া স্বতন্ত্র। আবার একদিকে কালিদাসের মেঘদূতের কাব্য লওয়া যাক্, আর একদিকে রবীন্দ্রনাথের যে কোন একটি দীর্ঘাকার কবিতা, মনে করা যাক্, 'মানস সুন্দরী,' দুই-ই মহৎ—কিন্তু এই দুইটি কাব্য-জগতের এক দেশের অধিবাসী নয়। প্রাচীন সাহিত্যের প্রধান গুণ পূর্ণতা বা নিখুঁত ভাব। অর্বাচীন সাহিত্যে তাহারই অভাব অনুভব করি। প্রাচীনকালের যে কেবল মহাকবিগণের রচনায় বা মহাকাব্যেই এই পূর্ণতার ভাব বিদ্যমান, এমন নয়, অতি অকিঞ্চিৎকর রচনাতেও এমন একটি নিখুঁত নিটোলতা আছে, যাহা অর্বাচীন কালের সাহিত্যে নিতান্ত বিরল।

'রেবা রোধসি বেতসতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে মে'

বা স্যাফোর সেই বিখ্যাত অনায়ত্ত আপেল সম্বন্ধীয় কবিতায়—

'As the sweet apple reddens on a bough's end,
at its very end ;
The gatherers have forgotten it ;
Nay, they did not forget but could not reach it."

প্রকৃতিদত্ত যে পূর্ণতা দেখা যায়, অর্বাচীন কালের মহাকবিগণের কাব্যেও তাহা সহজপ্রাপ্য নয়।

পূর্ণতা ও পূর্ণতার অভাব দুই ভিন্নকালের সাহিত্যে এতই স্বাভাবিক, প্রাচীনকালের সাধারণ কবির রচনাতেও সুলভ আর একালের মহাকবিগণের রচনাতেও এমন দুর্লভ যে—এই দুইটি লক্ষণকে ভিন্নকালের কবিদের প্রতিভার লক্ষণ না বলিয়া দুই ভিন্নকালেরই লক্ষণ বলিতে ইচ্ছা হয়। বস্তুতঃ,

প্রাচীনকালের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক পূর্ণতার ভাব ছিল অর্বাচীন কালে যাহা বিরল হইয়া পড়িয়াছে। আর এই দুইকালের কাব্যে এই দুই ভিন্ন লক্ষণ যেন স্বতঃই সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের সীমারেখাটা কোথায়? কালের পরিবর্তন সূক্ষ্ম সীমানা মানে না, স্থূলভাবেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের বিশ্বাস দান্তেকে এবং তাঁহার মহাকাব্যকে দুই কালের সীমান্তে ফেলা যাইতে পারে। 'ডিভাইনা কমেডিয়া'তে প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের ভিন্ন লক্ষণ—উভয়ই বর্তমান। ডিভাইনা কমেডিয়ার নিখুঁত পূর্ণতা প্রাচীনকালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যদিকে অর্বাচীন কালের কাব্যের প্রধান লক্ষণটিও এখানে সুস্পষ্ট। 'ডিভাইনা কমেডিয়া'তে দান্তেকে পাই, কেবল কবিরূপে নয়, কাব্যের নায়করূপেও। প্রাচীনকালের কাব্যে এমন কখনই ঘটিতে পারিত না। সেখানে আমরা আর সকলকেই পাই, কবিকে ছাড়া; আর এ কালের কাব্যে আর কাউকে পাই বা না পাই, কবিকে পাইব-ই। কবিকে কাব্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া দান্তে অর্বাচীন কালের ও অর্বাচীন কালের কাব্যের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অর্বাচীন কালের সঙ্গে তবু একটু প্রভেদ দেখা যায়। দান্তে নিজেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, কবি-দান্তে ও কাব্যের নায়ক-দান্তে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অর্বাচীন কালের কবিদের হাতে এমন সংযত আত্ম-অস্বীকৃতি পাওয়ার আশা নাই।

আগেই বলা হইয়াছে, অর্বাচীন কালের সাহিত্যে অপূর্ণতার ভাব বিদ্যমান, আবার এখন বলা হইল, এই কালের সাহিত্যে কবির ব্যক্তি পুরুষ অনুস্যূত। এবারে বিচার করা আবশ্যক—এ দুইয়ের মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে কিনা। এখানে মধুসূদনের কাব্য আমাদের প্রধান সহায়, কারণ তাঁহার কাব্যে অর্বাচীন কালের বলিয়া কথিত এই দুইটি লক্ষণই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। মধুসূদনের কাব্য এবং গদ্যরচনা স্বকীয় মহত্ত্বসত্ত্বেও (সনেটগুলি ছাড়া) পূর্ণতার অভাবেই যেন বিশিষ্ট, আবার তাঁহার সমস্ত রচনাই মাইকেলের ব্যক্তিত্বের দ্বারা আবিষ্ট। যে দুইটি লক্ষণকে আমরা অর্বাচীন কালের লক্ষণ বলিয়াছি—মধুসূদনের কাব্যে তাহাদের প্রকাশ আত্যন্তিক। এ বিষয়ে মধুসূদনের রচনা অর্বাচীন সাহিত্যের সব চেয়ে বড় শিক্ষার ও সতর্কতার স্থল। মধুসূদন অর্বাচীন সাহিত্যের চরম দৃষ্টান্ত।

অর্বাচীন কালের কবিগণ জগতের মানদণ্ড হিসাবে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিংবা এই ধারণাটাকে আর এক আকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। জগৎ-পরিধি মাপিবার সূত্ররূপে তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করিয়াছেন। এইখানেই, প্রাচীন ও অর্বাচীন কালের কবিগণের মধ্যে প্রভেদ (কালিদাসের কাব্য ও মধুসূদনের কাব্য একত্র মিলাইয়া পড়িলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে): প্রাচীনকালের কবিগণের জগৎ-পরিধি পরিমাপের সূত্র ছিল দৈববিধান। কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তাহার নিকষ ছিল দৈববিধান। প্রাচীনকালের সাহিত্যে যে পূর্ণতা দেখা যায়, আধুনিকালের সাহিত্যে যে অপূর্ণতা দেখা যায়—এইবার তাহার হেতু বুঝিতে পারা যাইবে। ব্যক্তিত্ব যত বিশালই হউক না কেন জগৎ-পরিধি পরিমাপের পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়, সূত্র খাটো হইবেই, আর যে পরিমাণ খাটো হইবে, সেই পরিমাণে জগদংশ কবির অনায়ত্ত থাকিয়া যাইবেই—ইহাই অপূর্ণতার মূল কারণ। এই প্রসঙ্গে, 'ভবিষ্যতের কাব্য' (Future Poetry) শীর্ষক

একটি প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য : "খণ্ড জীবনকে অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিতে বাধা নাই, কিন্তু খণ্ডতার মধ্যেও পূর্ণতার আভাস স্থাপন করিতে হইবে, কিন্তু পূর্ণতার রূপ যদি কবির অপরিচিত হয়, তবে কিরূপে সে পূর্ণতার আভাস দান করিতে সমর্থ হইবে? অর্বাচীন কালের খণ্ডকাব্য নিতান্তই খণ্ড, শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রকলার উজ্জ্বলতা যেমন সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলকে আভাসে প্রকাশ করে, অর্বাচীন কালের খণ্ডকাব্য তেমন করিয়া আভাসে পূর্ণতাকে দেখাইতে অসমর্থ ; এই অসামর্থ্যেরই অপর নাম অপূর্ণতা। এই অপূর্ণতার দৃষ্টান্ত গ্যেটের 'ফাউষ্ট,' আর মাইকেলের 'মেঘনাদবধ'।"

প্রাচীনকালের কবিগণ নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিশ্বাস করিতেন না ; তাহারা দৈববিধানরূপ সূত্র হাতে লইয়া জগৎ-পরিধি পরিমাপে অবতীর্ণ হইতেন। দৈববিধান ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা অনেক প্রশস্ততর, বাস্তবিক তাহা অপেক্ষা অন্য কিছু বড় কল্পনা করা যায় না। এই কারণেই প্রাচীনকালের কবিরা জগৎ-পরিধি পরিমাপে সমর্থ ছিলেন—তাঁহাদের কাব্যের পূর্ণতার ইহাই প্রকৃত কারণ। এইজন্যই প্রাচীনকালের অধিকাংশ কাব্যের নায়ক দেবতাগণ। যেখানে দেবতাগণ প্রত্যক্ষতঃ নায়ক নহেন সেখানেও তাঁহারা অন্যতম প্রধান পাত্র-পাত্রী। অর্বাচীন কালের কাব্যের নায়ক মানুষ। আধুনিক-কালের মানুষ মর্ত্য হইতে দেবগণকে নির্বাসিত করিয়াছে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের নায়কও দেবতা নহেন, মানুষ—রাক্ষসরূপী মানুষ অর্থাৎ অহং-সর্বস্ব মানুষ।

দুই কালের মধ্যে আরও একটু প্রভেদ আছে। ইতিমধ্যে জগৎ অনেক জটিল, অনেক বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। হোমর যে জগৎকে ও জীবনকে জানিতেন, গ্যেটের জগৎ ও জীবন তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর, জটিলতর ; দান্তে যে জগৎকে ও জীবনকে জানিতেন, রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবন তাহা অপেক্ষা জটিলতর, বৃহত্তর ; তাহাতে সূত্রের ন্যূনতা আরও বেশী ধরা পড়িয়াছে। কালিদাস বা ভবভূতি যে জগৎ ও জীবনকে জানিতেন, মধুসূদনের জগৎ ও জীবন তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর, জটিলতর। হোমরের জগৎ-পরিমাপের পক্ষে কবির ব্যক্তিত্ব যদি অযথেষ্ট হয়, তবে গ্যেটের জগৎ-পরিমাপের পক্ষে তাহা আরও অযথেষ্ট। তেমনি কালিদাসের জগৎ-পরিমাপের পক্ষে কবির ব্যক্তিত্ব যদি অযথেষ্ট হয়, তবে মাইকেলের জগৎ-পরিমাপের পক্ষে তাহা আরও বেশী অযথেষ্ট। অথচ কবির হাতে তাহাকে পরিমাপের আর কোন সূত্র নাই, ফলে অপূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রসঙ্গে দুই কালের শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। দুই কালের শিল্পাদর্শে কিছু ভেদ ঘটিয়া গিয়াছে। অর্বাচীন কালের শিল্পের লক্ষ্য বা আদর্শ সৌন্দর্যসৃষ্টি ; প্রাচীনকালের শিল্পের লক্ষ্য বা আদর্শ ছিল পূর্ণতা সৃষ্টি। প্রাচীনেরা পূর্ণরূপ সৃষ্টি করিতেন বলিয়া তাহা আপনিই সুন্দর হইয়া উঠিত ; অর্বাচীন কবিগণ পূর্ণতাকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে চান বলিয়া তাহা পূর্ণ হয় না, সুন্দরও হইয়া উঠে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন : "পূর্ণতাই সুন্দর, অপূর্ণতাই অসুন্দর।" আবার শ্রীঅরবিন্দের কথায় : "পূর্ণতাই সত্য।" কাজেই পূর্ণতা বলিতে আমরা সত্য ও সুন্দর, দুই-ই বুঝিব। অর্বাচীন কালের অনেক কবি তত্ত্বতঃ একথা জানেন, কিন্তু কার্যতঃ এই আদর্শকে অনুসরণ করিতে পারেন না আবার অনেকে আদৌ এ কথাকে স্বীকার করেন না।

এতক্ষণে আমরা তিনটি পর্যায় পাইলাম ; প্রাচীনকালের কবি, দৈববিধান যাঁহার জগৎ-পরিমাপ সূত্র ; পূর্ণতা যাঁহার শিল্পের লক্ষ্য ; তত্ত্বতঃ ও কার্যতঃ যিনি এই আদর্শকে অনুসরণ করেন। অর্বাচীন-

কালে পাই দুইটি পর্যায়। ব্যক্তিত্বের বিধান যাঁহার জগৎ-পরিমাপ সূত্র; সৌন্দর্য সৃষ্টি যাঁহার লক্ষ্য; অথচ পূর্ণতার সংবাদও তিনি রাখেন, কিন্তু যে-কারণেই হউক তাহাকে অনুসরণ করিতে অসমর্থ। তৃতীয় পর্যায়ে আছে সেই দল, ব্যক্তিত্বের বিধান ছাড়া আর কিছুই যাঁহারা মানেন না, জানেন না; পূর্ণতাকে যাঁহারা তত্ত্বতঃ ও কার্যতঃ অস্বীকার করেন।

মাইকেল দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। নিঃসন্দেহে তিনি অর্বাচীন কালের কবি, অর্বাচীন কালের কাব্যের লক্ষণ অপূর্ণতা তাঁহার কাব্যের প্রধান গুণ বা দোষ। কবি মধুসূদন, নাট্যকার মধুসূদন, আইনজীবী মধুসূদন, সংস্কার-সমর্থক মধুসূদন জানেন জগৎ কী বৃহৎ, জীবন কী জটিল। এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি তাঁহার সমকালীন অধিকাংশ লোক অপেক্ষা অনেক অধিক। এ হেন জগৎ-জীবনের পরিমাপে তিনি উদ্যত, কিন্তু বিষম সঙ্কট এই যে, একমাত্র ব্যক্তিত্বের সূত্র ছাড়া অপর কোন সূত্র তাঁহার হাতে নাই।

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ কি মেঘনাদ—বলদর্পী রাক্ষস। রামচন্দ্র মানুষ। তাঁহার কাব্যে দেবতা আছেন, দেবদূত আছেন; এমন কি কাব্যের একস্থানে দৈববাণীও শ্রুত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় মনে করা অসম্ভব নয় যে, দৈববিধানকেই এই কাব্যের পরিমাপসূত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু রাবণের কাঁধে ভর করিয়াছে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব। মেঘনাদবধের ট্রাজেডি কি? জগৎ-পরিমাপের পক্ষে মানুষের ব্যক্তিত্বই যথেষ্ট নয়—ইহাই কি তাহার ট্রাজেডি নয়? মধুসূদন ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তবে আবার মাইকেলকে অর্বাচীন কালের কবি বলি কেন? বলি এই জন্য যে, ব্যক্তিত্বের দম্ভ যে যথেষ্ট নয় তিনি জানিতেন, কিন্তু অপর কোন বিধান, দৈববিধান, তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। এইখানেই কবির ট্রাজেডি, আর সে ট্রাজেডি মেঘনাদের অপেক্ষাও গুরুতর। রাবণ কিংবা মেঘনাদ ক্ষমতার দম্ভকেই, পৌরুষের প্রতাপকেই যথেষ্ট ও একমাত্র বলিয়া জানিতেন। মাইকেল জানিতেন, ইহা যথেষ্ট নয়; কিন্তু অপর কোন বিধানও তাঁহার জানা ছিল না। যে-কালে তিনি জন্মিয়াছিলেন সে কাল দৈববিধানের চূড়ান্ত মহিমায় বিশ্বাস করিত না। এখানে কালের ধর্ম মধুসূদনের ধর্ম।

এইজন্যই আগে মাইকেলের জীবন ও কাব্যকে অর্বাচীন কালের শিক্ষা ও সতর্কতার দৃষ্টান্ত বলিয়াছি। তিনি ব্যক্তিত্বের বিধানকে জানিতেন, অথচ জানিতেন যে, ইহা যথেষ্ট নয়; তিনি পূর্ণতার তত্ত্ব জানিতেন অথচ সৌন্দর্যসৃষ্টিকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি সত্যের সংবাদ রাখিতেন অথচ বিপুলা পৃথিবীর সমস্ত তথ্যকে কুড়াইয়া লইয়া সত্যের পূর্ণ মূর্তিতে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না (এইজন্য শ্রীঅরবিন্দ মেঘনাদবধ কাব্যকে বলিয়াছেন—'half done')। তত্ত্বে ও কার্যে সমন্বয় করিতে না পারিলে যে পরম দুঃখ অনুভূত হয়, সেই দুঃখ ছিল মাইকেলের জীবনের, আর সেই দুঃখের সমষ্টিই তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য।

পরবর্তী কালের সাহিত্যের উপরে মধুসূদনের প্রভাব সম্বন্ধে একটি কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক যুগে একখানি মহাগ্রন্থে আপনার ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমস্ত সম্ভাবনাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়া থাকে। সে যুগের অন্য সমস্ত রচনা ঐ মহাগ্রন্থের খসড়া ভিন্ন আর কিছু নয়। কিংবা শাখানদীসমূহ যেমন মূল নদীতে মিলিত

যেন কোথায় একটা মূলগত শৈথিল্য রহিয়া গিয়াছে। সমালোচকগণ রাবণের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন কবির ব্যক্তিজীবনের তথা সমকালীন বাঙালীজীবনের ব্যর্থতার প্রতিফলন। সার্থক এই আবিষ্কার। কাব্যের মধ্যে কবির নিজস্ব স্পর্শটি লাভ করিবার পথ ইহাতে সহজ হইয়াছে; রাবণের মধ্যে কবিরই হাহাকার ধ্বনিত হওয়ায় কাব্য সহজেই রস-পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা তো একটা আকস্মিক মিল ছাড়া আর কিছু নহে, কোনো বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র ইহাদের মধ্যে আসিতে পারে কি? কবির পক্ষে কি কোনক্রমে রাবণের ভিন্নতর পরিণতি অঙ্কন করা সম্ভব ছিল? যে রামায়ণ তাঁহার কাব্যোপাদানের মূল উৎস সেখানকার রাবণই যে যথেষ্ট করুণ জীবনের অধিকারী! তাহাকে বিকৃত করিয়া দেখাইলে কখনই সে সৃষ্টি সার্থক বা সুন্দর হইত না। সুতরাং যখন আমরা বলি কবির প্রস্তাবিত বীর-রস রাবণের করুণ-রসে ভাসিয়া গেল, তখন যেন ভুলিয়া না যাই, এই চরিত্র-সৃষ্টি ব্যাপারে কবির স্বাধীনতা দেখাইবার অবসরও বিশেষ ছিল না; অথবা, মেঘনাদবধ-এর রাবণ-চরিত্রটির পরিণতিভাগ বহুলাংশে রামায়ণেরই ছাঁচে গড়া, এক বিষাদ-করুণ মূর্তি। ইহার মধ্যে আমরা কবি-মানসের কোনো শক্তি-জীবন্ত রূপ দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম যদি কাব্যের সমগ্র কাহিনী ও চরিত্রাবলী পুরাণ-প্রদত্ত না হইয়া কবির স্বাধীন কল্পনা-প্রসূত হইত। সুতরাং প্রতিবাদের ভয় থাকিলেও এ কথা বলা যাইতে পারে, রাবণের ব্যর্থতা, কবির ব্যর্থতা ও যুগের ব্যর্থতা সবই একটা আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র। যুগের সহিত কবির একটা স্থূল সংযোগ থাকিলেও, রাবণের সহিত উহার কোনো সংযোগ নাই। রাবণ যদি রামায়ণের চরিত্র না হইয়া সেই যুগেরই কোনো ব্যক্তি-চরিত্ররূপে কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি হইত তবেই বলা যাইত রাবণের মধ্যে মধুসূদনের কবি-মানস উজাড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

আমাদের প্রতিপাদ্য, মধুসূদনের কবি-মানস রাবণ অপেক্ষা অনেক বড়ো, রাবণ তাহার একটি আঙ্গিকের চিত্র-রূপ মাত্র। সুতরাং মেঘনাদবধ-কাব্যই মধুসূদনের কবি-মানস-এর একমাত্র আধার নহে, এবং সে কবি-মানস কোনো যুগ বিশেষের মার্কামারা নহে। তিনি যদি যুগ-জয়ী কবি না হইবেন, তবে বীরাঙ্গনা-ব্রজাঙ্গনা-চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মত কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব হইল কিরূপে? কাব্যহিসাবে এগুলির স্বরূপ চিনিবার জন্য কোনো যুগের দর্পণের প্রয়োজন হয় কি? অথচ কে বলিবে মধুসূদনের সৃষ্টিরাজ্য হইতে এগুলিকে নির্বাসন দিলে কোনো ক্ষতি নাই? মেঘনাদবধ-কাব্য যদি মধুসূদনকে যুগন্ধর করিয়া থাকে, তবে উহার সহিত মিলিত হইয়া এই কাব্যত্রয়ী তাঁহাকে করিয়াছে যুগজয়ী। যখন কবি-মধুসূদনের আলোচনা উঠিবে, তখন মেঘনাদবধ-কাব্যে তাঁহার ব্যক্তিজীবনের সুর ফুটিয়াছে বলিয়া অথবা তদানীন্তন বাঙালী-জীবনের ব্যর্থতার প্রতিফলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা যদি একমাত্র উহারই পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র কবি-মানস সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ধারণা গঠন করি, তবে হয়তো বাঙালীর নিকট মধুসূদন প্রিয়তর হইয়া উঠেন কিন্তু তাঁহার কবি-মানসের প্রতি সুবিচার করা হয় না। কারণ মধুসূদন যে ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যকে জয় করিয়াও কালজয়ী কাব্য-সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত, ইহার প্রমাণ তাঁহার অপরাপর কাব্যে। সুতরাং মধুসূদনের কবি-মানসের আলোচনায় আমাদের উচিত মেঘনাদবধ-কাব্যের কবি-মানসটিকে সমগ্র কবি-মানস হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা। ইহাতে অবশ্যই এই কথাটি ধরা পড়িবে, নৈর্ব্যক্তিক কাব্য-সৃষ্টিতে

যাঁহার এমন অধিকার ছিল, তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ আমরা দেখিতে পাইলাম না,—'যে অমূল্য সম্ভাবনার অনুপম ইঙ্গিত রূপায়িত হইয়াছে, মেঘনাদবধের প্রবল প্রতাপে তাহা ছায়াচ্ছন্ন'। তাই সহজেই আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে কবির কবি-মানস সম্পর্কে। স্বভাবতই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মেঘনাদবধ-কাব্যের সুর হইতে আমরা নির্ণয় করিতে চাই তাঁহার কবি-মানসের স্বরূপধর্ম। ইহাতে লাভ-লোকসান দুইই আছে। লোকসান এই যে, সর্বকালের কবি হইবার শক্তি ও সম্ভাবনা থাকিতেও তাঁহার সেই মহনীয় রূপটি আমাদের চোখে ফুটিল না, পক্ষান্তরে, মেঘনাদবধ-এর কবি হইয়া মধুসূদন যে অজস্র বৈদেশিক ও বিজাতীয় প্রভাব সত্ত্বেও একান্তরূপে বাংলার ও বাঙালীর প্রিয় কবি হইয়াছেন, ইহাই পরম লাভ।

(গ)

মধুসূদনের কবি-মানসের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ অতি সহজেই উদ্ধার করা যাইতে পারে নূতন ঢঙে, নূতন ছন্দে, নূতন ভাষায় ও নূতন সুরে কাব্য রচনার কঠিন ব্রত লইয়া তিনি সুরু করেন তাঁহার কাব্যসাধনা। নূতনত্বের প্রতিষ্ঠাই তাঁহার সংকল্প। এই সংকল্প যে কার্যে পরিণত হয় নাই তাহাও নহে; কিন্তু পরম কৌতূহলের সহিত আমরা লক্ষ্য করি, প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই দুর্দান্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় কবিটি যেন যতখানি প্রগতিশীল, ঠিক ততখানিই সনাতনী। উগ্র অভিনবত্বের হুমকির তলদেশে যেন এক প্রশান্ত সনাতনী মন প্রবলভাবে সক্রিয়। তাই হোমর-দান্তে-ভার্জিল-মিলটনের ভক্ত হইয়াও কবি ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-কৃত্তিবাসের প্রতি শ্রদ্ধাবনত; ধর্মান্তরিত ও পুরাপুরি অ-হিন্দু হইয়াও হিন্দুর দেব-দেবী ও হিন্দু সংস্কারাদির সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণে নিয়ত পুলকিত; গ্রীক পুরাণের কাহিনী-গৌরবে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিলেও তাঁহার সমস্ত কাব্যকলা লীলায়িত হইল ভারত-পুরাণেরই কাহিনী-রূপায়ণে; আর regular Iliad রচনার সদম্ভ ঘোষণা সত্ত্বেও করুণরস-প্রধান খাঁটি ভারতীয় রীতির পরিচর্যাতেই কবি বিভোর হইয়া রহিলেন।

কবি-মানসের এই রহস্যটির সমাধানে মোহিতলাল প্রমুখ সমালোচকগণ কবির প্রকৃতিগত খাঁটি বাঙালীত্বের প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা যেমন মূল্যবান তেমনই উপভোগ্য। তবে মনে হয়, এই সম্পর্কে আরও কিছু বলিবার আছে। যে কবি বীররসে ভাসিয়া মহাগীত গাহিবার সংকল্প রক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার কাব্যে করুণরসের প্লাবন ঘটাইয়াছেন, সেই কবিই কিন্তু 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' বা 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'র মত কবিতায় এমন রসের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার সন্ধান ঐ ঐ চরিত্রের উৎস-গ্রন্থে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে কবি সতী-শিরোমণি সীতার চরিত্র-বন্দনায় সনাতন সতীত্বাদর্শের আরতি করিয়াছেন, সেই কবিই 'সোমের প্রতি তারা' রচনায় সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সকল সৃষ্টির একেবারে গোড়ার কথাটি হইল, তিনি কবি, নব নব সৃষ্টির নেশায় যিনি পাগল। বাঙালীত্বের বা বাঙালী আদর্শবাদের দ্বারা তাঁহার কাব্যসৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত, এমন কথা নহে, সৃষ্টি-পাগল কবির বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে একটা বাঙালী স্পর্শ-মাখানো দেখা যায়, এই কথাই গ্রাহ্য। অভিনব কিছুর জন্য মধুসূদনের কবি-মানসটি ছিল প্রতিনিয়ত আন্দোলিত, এবং এইরূপ সৃষ্টিমাত্রেই তিনি গর্ব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যখানি

হইয়া তাহাকে স্ফীতকায় করিয়া তোলে প্রত্যেক যুগের মহাগ্রন্থের সহিত অন্যান্য গ্রন্থের সম্বন্ধ সেইরূপ। গ্রীকজগতের এই মহাগ্রন্থ হোমরের কাব্যদ্বয়। ইউরোপে খৃষ্টীয় মধ্যযুগের মহামন্ত্র দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া', ভারতবর্ষের 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'রামচরিত-মানস' সেই সেই যুগের মহামন্ত্র!

পরবর্তী কালের পক্ষে কালিদাসের 'শকুন্তলা', 'রঘুবংশ' এইরূপ মহাগ্রন্থ। তাহার বহুকাল পরের মহাগ্রন্থ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। 'ইলিয়াড', 'ওডিসি', ডিভাইনা কমেডিয়া', কিম্বা বাল্মীকির 'রামায়ণ' বা কালিদাসের 'শকুন্তলা'র সহিত তুলনায় 'মেঘনাদবধ' নিশ্চয়ই দীনতর ও অপূর্ণতর। কিন্তু সে দীনতা ও অপূর্ণতার কারণ মাইকেলের যুগের মধ্যেই নিহিত। রেনেসাঁস বলিতে বাংলার যে মনোভাব ও যে পর্বকে বোঝায়, মাইকেলের মেঘনাদবধ তাহারই মহাকাব্য। মেঘনাদবধ মানব-মনের চিরন্তন ও বৃহত্তর অতৃপ্তির মহাকাব্য। দম্ভ ও পৌরুষই এই কাব্যের প্রাণ, সেই দুর্মর প্রাণের পরিচয় দিবার চেষ্টাই মাইকেল করিয়াছেন। মাইকেলের পরবর্তী কালেও হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেই শ্রেণীর মহাগ্রন্থ লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা চেষ্টামাত্র অপেক্ষা অধিক নহে। মাইকেলের মৃত্যুর শত বৎসরের মধ্যে যুগসম্বিৎপূর্ণ মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁহার "সাবিত্রী" যুগন্ধর মহাগ্রন্থ। মাইকেলের পর শ্রীঅরবিন্দকে অর্বাচীন কালের মহাকবি বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই।

৯। মধুসূদনের কবি-মানস

(ক)

মধুসূদনের কবি-মানস সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কাব্য-আলোচনার পক্ষে কবির মানস-প্রকৃতির বিশ্লেষণ অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "শিল্পীর কাজ শুধু অঙ্কনকুশল হওয়া নয়, শিল্পীর কাজ তাঁহার বর্ণনার বিষয়-সম্পর্কে প্রধান ও অপ্রধানের বিচার করা।" বলা বাহুল্য, ইহারও যোগ কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই; নিজে এক মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হইলে জীবনের ব্যাপারে, কাব্য-সৃষ্টির ব্যাপারে এমন প্রধান-অপ্রধানের বিচার সম্ভবপর নয়। রস এবং ব্যক্তিত্ব এই দুইটি হইল কবি-মানসের অবলম্বন। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, রসই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কবির প্রধান নির্ভরের ব্যাপার হইয়াছে; তাহাতে প্রাচীনকালের সাহিত্য সহজেই হইয়াছে সুখপাঠ্য। কিন্তু রস যত মনোহর হউক, একালের সাহিত্যে আমাদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে ব্যক্তিত্বের দ্বারা। কাব্যের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশী সত্য। কবিতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকু আবিষ্কার করিতে না পারিলে আমাদের রস-উপভোগ আজ আর পূর্ণাঙ্গ হয় না। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই অতি গভীর ব্যাপার। গজে গজে যেমন মৌক্তিক হয় না, তেমনি এই ব্যক্তিত্ব সকল কবির মধ্যে সুলভ নয়। কবির ব্যক্তিত্ব বাংলা সাহিত্যে আমরা প্রথম উপলব্ধি করিতে পারিলাম মধুসূদনের কবি-মানসের মধ্যে।

কাব্যে ও সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ কি এই প্রশ্ন লইয়া বিস্তর আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু আলোচনার ফলে যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এইরূপ দাবী করা যায় না। তবে এই

আলোচনা যে আমাদের সাধারণ ধারণা পরিষ্কার করিতে কতকটা সাহায্য করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্য ছিল, মোটামুটি আবেগ-প্রধান। বাস্তব জীবনের সমস্যা, জীবনের সামগ্রিক আলোচনা ও মননশীলতা তখনও কবি চিত্তকে বিশেষভাবে অধিকার করে নাই। হয় মুহূর্তের আবেগ ও ভাবানুভূতি, না হয় স্থির ধর্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনদর্শন কাব্যের উপজীব্য ছিল। গীতি-কবিতাতে তীব্র হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি, মহাকাব্যে সাধারণ-লক্ষণান্বিত, একই আদর্শের অনুবর্তী জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, দার্শনিক কবিতায় চিরপ্রচলিত ধর্মসংস্কারের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিরচনা—কাব্যসাহিত্য এই ত্রিধারা অবলম্বন করিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। শেষ দুই জাতীয় কাব্যে চিৎপ্রকর্ষ বা মননশীলতার যে পরিচয় তাহা চিরপ্রথাগত জীবনবাদ ও অধ্যাত্মনিষ্ঠাপ্রসূত, তাহাতে বর্তমান জীবনের নূতন ছন্দকে অঙ্গীভূত করার, সদ্যোদ্ভূত সমস্যাসমূহের উদার স্বীকৃতির কোন প্রচেষ্টাই দেখা যায় না। ব্যাস-বাল্মীকি-হোমর-ভার্জিল-মিলটন-ট্যাসো প্রমুখ মহাকাব্য-রচয়িতাগোষ্ঠী যে জীবনদর্শন রূপায়িত করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের নিজস্ব আবিষ্কার বা অনুভূতির ফল নহে, সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্বজন-স্বীকৃত নীতি ও আদর্শবাদের কাব্যসৌন্দর্যভূয়িষ্ঠ অনুস্মৃতি মাত্র। তাঁহাদের মানস-সত্তা বা মানস-প্রকৃতি প্রতিবেশের সহিত নিবিড় সংশ্লেষপুষ্ট হইয়াই নিজ সক্রিয়তার নিদর্শন দিয়াছে। তাঁহাদের মানসমুকুরে জাতীয় সংস্কৃতি বা সম্প্রদায়গত মনোভাবই অখণ্ড সমগ্রতার ও সুদীর্ঘ পরিচয়সঞ্জাত ভাব-গভীরতার সহিত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

এই বহুশতাব্দীব্যাপী ধারার একমাত্র ব্যতিক্রম পাওয়া যায় দান্তের মহাকাব্যে। দান্তের কবি-মানস সাহিত্যের আকাশে স্বমহিমায় দীপ্যমান। তাঁহার মহাকাব্যে ব্যক্তিগত তীব্র অনুভূতির সহিত মহাকাব্যের চিরপ্রথানুযায়ী সার্বভৌম ভাব-সংস্কৃতির এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। মহাকাব্যের ঘটনাবিন্যাস, গঠনবৈশিষ্ট্য ও অখণ্ড ভাবসংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহার চিরনির্দিষ্ট আধারে সমসাময়িক ইতিহাসের তীব্র মানসবিক্ষোভ ও আদর্শসংঘাত, দ্রবীভূত গৈরিক প্রবাহের ন্যায় প্রবৃত্তির ধূমায়িত উষ্ণ উচ্ছ্বাস, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষোদ্গার—এক কথায়, বাস্তবতার তপ্তকটাহে আবর্তিত মানবাত্মার আর্ত আক্ষেপ ও অস্বস্তি আশ্চর্য কলাকৌশল ও সংগতিবোধের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহাকাব্যের প্রশান্ত, নিস্তরঙ্গ বেষ্টনীরেখার মধ্যে হৃদয়াবেগের, আত্মনিষ্ঠ অনুভূতির কী উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস! বাহিরে বিড়ম্বিত কিন্তু অন্তরে আদর্শলোকের স্থির জ্যোতিতে সমুজ্জল সার্থক প্রেমের কী মহিমামণ্ডিত, মর্মভেদী আনন্দ-বেদনা! মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস ও যাজকতন্ত্রের মধ্যে এক বিরাট আত্মার অধ্যাত্ম আকূতি, স্বর্গনরকের রহস্যভেদী দিব্যদৃষ্টি, দৈববিড়ম্বিত মানবিকতার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা যে কেমন করিয়া সংকীর্ণ বোতলের মধ্যে ধূমপুঞ্জাকৃতি দৈত্যদেহের ন্যায় অবলীলাক্রমে বিধৃত হইল তাহা শিল্পপ্রতিভার এক অপূর্ব বিস্ময়। এই মহাকাব্যে মননশীলতা, দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনার প্রাচুর্য আছে, কিন্তু ইহাতে বিশ্ববিধানকে নূতন করিয়া দেখিবার কোন চেষ্টা নাই, প্রচলিত ধর্ম সংস্কারকেই আত্মানুভূতির আলোকে উজ্জল করিয়া দেখান হইয়াছে। তাই দান্তের মৌলিক প্রতিভা পুরাতনকেই নবসৌন্দর্যমণ্ডিত, নবপ্রাণোচ্ছলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে,—সংস্কারমুক্তি ও চিত্তের উদার অগ্রগতির প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক হয় নাই।

ইহার পর আসিয়াছে নবজাগৃতির যুগ (Renaissance)। এই যুগে মানবচেতনায় আসিয়াছে

নবভাবপ্লাবন, নূতন আলোক ও অনুভূতির জোয়ার। মধ্যযুগের ধর্মতন্ত্রশাসিত সীমা অতিক্রম করিয়া মানব-মন এক নূতন জীবনবাদ ও সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—জীবনপরিধি সুদূর অপরিজ্ঞাত দিগন্তরেখা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। মানুষ নিজেকে দৈবের ক্রীড়নক, এক অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থার অঙ্গরূপে বিবেচনা না করিয়া আত্মশক্তির অনন্ত সম্ভাবনার প্রতি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে; মানবের দুঃসাহসিকতা ভৌগোলিক রাজ্যে ও চিন্তারাজ্যে নব নব দেশ আবিষ্কার ও জয়ের অভিযানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এত অভূতপূর্ব উল্লাস ও উদ্দীপনা তাহার সমস্ত সৃষ্টির ভিতর দিয়া স্ফুরিত হইয়াছে—আত্মকেন্দ্রিকতায় আবর্তিত চিত্ত মুক্তি ও অগ্রগতির আকর্ষণে বিশ্বকেন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। মানবমনের আধুনিকতার মন্ত্রদীক্ষায় নবজাগৃতি-যুগের দানের মূল্য অপরিসীম। তথাপি এ যুগেও কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক মনোভাবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই—সংস্কারমুক্তির উৎকট আনন্দ, শিশুসুলভ মনের বিস্ময়প্রত্যাশী উত্তেজনা প্রজ্ঞাবোধসঞ্জাত সামগ্রিক জীবনবিচারকে বিচলিত করিয়াছে। সেক্সপীয়রের রচনায় মানবহৃদয়ের চমকপ্রদ বিচিত্র বিকাশের স্বরূপ নিরূপণের ভিতর দিয়া যে জীবনদর্শন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার প্রশান্ত গভীরতা—ক্ষমা-স্নিগ্ধ ঔদার্য ও আকস্মিক ব্যতিক্রমের সমীকরণ-নৈপুণ্য মানবপ্রজ্ঞার চরম উৎকর্ষরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু এই জীবনদর্শন ধীর, অপ্রমত্ত বিচারবুদ্ধির আলোচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নহে; ইহা দিব্যদৃষ্টির ধ্যানলব্ধ আবিষ্কার।

অষ্টাদশ শতকে সমগ্র ইউরোপের কাব্য সাহিত্যে কবিকল্পনা অপেক্ষা যুক্তিবাদ ও মননশীলতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এযুগের ইউরোপীয় কাব্য সাহিত্য বহির্জীবনের কয়েকটি অগভীর দিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যুক্তিবাদ ও তার্কিকতা এযুগের সাহিত্যের সাধারণ গুণরূপে প্রকটিত হয়। ইহা জীবনের সূক্ষ্ম, সুকুমার, রহস্যমণ্ডিত, অধ্যাত্মাভিমুখী বিকাশগুলিকে নিজ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে নাই—একটি সমগ্র জীবনদর্শন গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় না। প্রাচীন জীবনের ঠাস্‌বুননি, বিজ্ঞানের প্রভাবে আল্‌গা হইয়াছে, কিন্তু ইহার শূন্যস্থানগুলিকে নূতন উপাদানে পূর্ণ করিবার কোন ব্যবস্থা দেখা যায় নাই। জীবনদর্শনের অগভীর একদেশদর্শিতা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অনিবার্য প্রাথমিক ফলরূপে দেখা দিয়াছে।

এই পটভূমিকায় মধুসূদনের আবির্ভাব ও তাঁহার কাব্য-রচনার পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাঁহার কবি-মানসের প্রকৃত পরিচয় আমরা পাইব। তিনি বাঙালী এবং ভারতীয় কবি হইলেও তাঁহার কবি-মানস গড়িয়া উঠিয়াছে প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত ও ইউরোপীয় মহাকাব্যের সংমিশ্রণে। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে যে জীবনদর্শন প্রতিফলিত, তাহার লেশমাত্র মাইকেলের সাহিত্যে নাই—যদিও তিনি এই সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। দুইশত বৎসরের জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান-সাধনা ও স্বাধীন মননশীলতা যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব আহরণ করিয়াছে, মানবের চিত্তক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে যে অভিনব ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে, সে সমস্তই যে মাইকেলের কাব্যে কেন্দ্রীভূত ও সংহত হইয়া এক নূতন জীবনবেদের ভিত্তিরচনা করিয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার সংশয়ক্লিষ্ট উদ্‌ভ্রান্তি, প্রাচীন সংস্কারের প্রতি মোহ অথচ নূতনের জন্য আকূতি, সর্বোপরি তাঁহার বহু বিচিত্র বিভ্রান্তিকারী অভিজ্ঞতার সামান্যমাত্রই মধুসূদনের অনুভূতি ও সৃষ্টিশক্তির মধ্যে ধরা দিয়াছে। তাঁহার কবি মানসের

অপূর্ণতার জন্য তাঁহার প্রতিভার পরিণতি অর্ধপথেই সমাপ্ত হইয়াছে। গৌড়জন চিরকাল সুখে পান করিবে এমন একটি মধুচক্র রচনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার কাব্যজীবনে তাঁহাকে এমন ভাবেই পাইয়া বসিয়াছিল যে, কবি সেই ইচ্ছার উর্ধ্বে আর কিছুতেই উঠিতে পারিলেন না। যদি পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' আধুনিকতার জীবনবেদরূপে অনন্যসাধারণ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হইত, যেমন হইয়াছে গ্যেটের 'ফাউষ্ট'।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠার জন্যই মধুসূদন বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে চিরন্তন প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কবি-মানসের মধ্যে জীবনের অপরিমেয় রহস্যের উপলব্ধি নাই বলিয়া সেই প্রভাব পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী হইল না। প্রজ্ঞাময় দৃষ্টির অভাবেই মধুসূদনের প্রতিভা কোন সার্বভৌম আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

তবে এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠার অক্ষমতা হইল কবি-মানসের একদিকের পরিচয় মাত্র। ইহার যে বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক লক্ষণীয় তাহার মূলে আছে এক বিরাট যুগ-প্রভাব বা যুগ-প্রবৃত্তি। যেযুগে মধুসূদনের আবির্ভাব, তাহাকে এক কথায় বাংলার নব-জাগরণের (Renaissance) যুগ, বাঙালীর জাতীয় জীবনের এক যুগ-সন্ধি বলিতে হয়। একদিকে যেমন প্রাচীন সংস্কারের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ সেই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী জীবনে এক উৎকট রক্ষণশীল মনোভাবের সংবর্ধনা চলিতেছে, অপরদিকে সমুদ্র-পারের পাশ্চাত্ত্য হাওয়া হুহুশব্দে আসিয়া সমাজের প্রগতিশীল অংশকে মুক্তিপাগল করিয়া তুলিতেছে। আমাদের সমাজের বদ্ধঘরে জীবন-রস তখন অবসিতপ্রায়। তাই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষিগণ মৃতপ্রায় সমাজের স্বাস্থ্য ফিরাইবার জন্য হাওয়া পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে 'ইংরেজী সাহিত্যের মারফতে এক মুক্ত স্বাধীন বলিষ্ঠ জীবনযাত্রা ও আত্ম-প্রত্যয়শালী মানব-সমাজের পরিচয়' এমন শ্রদ্ধা লাভ করিতে থাকে যে, শিক্ষিত বাঙালী তরুণ সম্প্রদায় একেবারেই বিপ্লবী সাজিয়া বসে, জেহাদ ঘোষণা করে আপন জীর্ণ সমাজের বিরুদ্ধে। এই বিপ্লব কেবল ধর্মে ও সমাজে নহে সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইতে সুরু করে। মধুসূদন ছিলেন এই নব-যুগের মানস-সন্তান ; মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত এক রুদ্র সাধক। কবি আপন ভাব-সাধনায় বিদেশীয় চিন্তাধারার উৎকর্ষ রূপায়িত করিবার—বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর বিবেক ও যুক্তিকে, নীতিবাদ ও আদর্শবাদের উপর অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার—দুরূহ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যের অবিসম্বাদিত নায়ক রাবণের মধ্যে পাওয়া যায় এক দুর্বার স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি-লীলার মাহাত্ম্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, আর মেঘনাদের মধ্যে পাওয়া যায় সে যুগের সেই নবজাগ্রত দেশাত্ম-বোধের স্বর্ণচূড় তুঙ্গ-মহিমা।

তবে যে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের দুর্জয় শক্তির জয়গানকে স্তিমিত করিয়া তাহার নিয়তিপীড়িত আত্মার করুণ বিলাপকেই বড় হইতে দেখি, ইহার উত্তরে আসিয়া পড়ে কবির নিজস্ব ব্যক্তি-জীবনের কথা। আমাদের **কবিমানস-বিশ্লেষণে ইহাই হইল রহস্য-কুঞ্চিকা।** মহাকাব্যের রচয়িতা হইবার জন্য কবি আপন ব্যক্তি-সত্তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া জাতির ও যুগের নবোন্মেষের চিত্র, এবং মানব-জীবনের নবীন ভাষ্য রচনা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ চেষ্টা তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ফলবতী হয় নাই। কবি তাঁহার নিজের ব্যক্তিজীবনকে কবি-কল্পনার

কবি যখন বিদ্যাসাগরের নামে (যাঁহাকে তিনি বলিয়াছেন, the first man among us) উৎসর্গ করেন, তখন উৎসর্গ-পত্রে কাব্যের "অভিনব"ত্বের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে পরম তৃপ্তিলাভ করিতে দেখা যায়। তাঁহার হাতে 'ব্রজাঙ্গনা'র মত কাব্য রচিত হইতে দেখিয়া ঐ বাঙালীত্ব বিষয়ে সকলেরই উল্লসিত বোধ করার কথা, কিন্তু কবি-মানসের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঐ কাব্যখানি তাঁহার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য শক্তির একটি কুতূহলী পরীক্ষারূপেই জন্মলাভ করে,—পরীক্ষা,—অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছাড়াও মিত্রাক্ষর ছন্দের নূতন ধরণের কবিতা রচনার পরীক্ষা, পশ্চিমী ঢঙের Ode বা গীতিকবিতা-রচনার পরীক্ষা, ওদেশের মত এদেশেও Bard জাতীয় poet কোনো উপযুক্ত বিষয়বস্তু লইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে কিনা তাহারই পরীক্ষা। বিষয়বস্তু বা ধর্মাধর্ম এখানে গৌণ, মুখ্য হইল নব নব সৃষ্টির সাফল্য। এ বিষয়ে কবির মনের খবর আমরা কবির নিজেরই মুখের কথা হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। ব্রজাঙ্গনা সম্পর্কে রাজনারায়ণকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলিতেছেন, "When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad Woman after all. If she had a "Bard" like your humble servant from the beginning, she would have been a very different Character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours." সুতরাং 'খাঁটি বাঙালীমন' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ঠিক তাহা হইতেই ব্রজাঙ্গনার সৃষ্টি হয় নাই। যদিও প্রত্যেকটি কবিতার শেষে "মধু কহে ব্রজাঙ্গনে" ইত্যাদি ভঙ্গিতে পদাবলীর মত ভণিতার ছাঁচ গঠিত হইয়াছে, তথাপি কবি-মানসের দিক দিয়া এখানকার কবি ঠিক জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের মত বাঙালী ভক্ত মহাজনশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবার নহেন, রচনাও পদাবলী-শ্রেণীর নহে! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ব্রজাঙ্গনা কাব্যের যুগ্ম সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য: "কবি মধুসূদন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বহুবিধ নূতন পদ্ধতির প্রবর্তক, ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের রচনারীতিও বাংলা দেশে সম্পূর্ণ নূতন; এগুলি সুরে গেয় মহাজন-পদাবলীও নয়, আবার পালায় বিভক্ত কবি বা পাঁচালিগানও নয়। মধুসূদন স্বয়ং এগুলিকে Ode আখ্যা দিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দশপদী কবিতার মত মধুসূদন বাংলায় এই শ্রেণীর গীতিকবিতারও জন্মদাতা। তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার অবিসম্বাদিত প্রাধান্য এই সকল নূতন রীতির উপর স্থাপিত।" বস্তুত যে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক ও তাহার গৌরবময় প্রতিষ্ঠার অধিকারী তিনি যে কেন মিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনায় মাতিলেন ইহা অনুসন্ধানের বিষয়। কেবল আর এক দফা বাঙালীস্পর্শ লাভ করিয়া মুগ্ধ হওয়াই কবি-কৃতির সম্যক পরিচয় লওয়া নহে। মধুসূদনের পত্রাবলী হইতে বুঝা যায় তিনি এই "ছন্দোবদ্ধ গাথাগুলি" রচনা করিয়া বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদীর মোহ এড়াইয়া তিনি নিজের আবিষ্কৃত (নানা ছন্দের সংমিশ্রণে) ছন্দ-স্তবক-পদ্ধতির পরীক্ষায় ব্রজাঙ্গনা-কাব্য ফাঁদিয়াছিলেন: "I have made up my mind to do something in rhyme ; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you. No ! I mean to construct a stanza like the Italian *Ottava Rima* and write a romantic tale in it".

ইহাই হইল মধুসূদনের কবি-মানসের খাঁটি পরিচয়। তিনি সৃষ্টি-পাগল—বৈচিত্র্যের সৃষ্টি, অভিনবত্বের সৃষ্টি। তাই Epic-এর আদর্শে সৃষ্টি হইয়াছে 'মেঘনাদবধ-কাব্য' ; Heroic Epistles-এর আদর্শে 'বীরাঙ্গনা-কাব্য' ; Ode, Lyric এবং Ottava Rima'র আদর্শে ব্রজাঙ্গনা-কাব্য, Tragedy'র আদর্শে 'কৃষ্ণকুমারী' ইত্যাদি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশপদী কবিতা, মহাকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, প্রহসন, প্রতিক্ষেত্রেই মধুসূদন প্রথম স্রষ্টা, মধুসূদন পথপ্রদর্শক। তিনি যে religious bias এড়াইবার কথা বলিয়াছেন তাহা যেমন পাঠকের পক্ষে প্রযোজ্য তেমনি কবির সৃষ্টি-মানস-সমীক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ un-biased না হইলে তাঁহার পক্ষে এত বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইত না। তাঁহার শুধু একটিমাত্র bias (শিথিল ব্যঞ্জনায়)—বৈচিত্র্যের কবি হওয়ার ; ইহা তাঁহার অন্তরকে অনুদার না করিয়া অভাবনীয় রূপ উদার করিয়াছে। পদে পদে তিনি নমুনা বা আদর্শ লইয়াছেন বিদেশী কাব্য হইতে আর সহর্ষচিত্তে সেগুলিকে স্বদেশীয় ভাষায় স্বদেশীয় উপকরণের সাহায্যে নবভাবে রূপায়িত করিয়া কবি-চিত্তের আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যোপাদানের উৎস আমাদের খুঁজিতে হইবে কেন, রচনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডাকিয়া হাঁকিয়া উল্লাসভরে সকলকে জানাইয়াছেন তাঁহার ঋণের কথা। বন্ধুবিশেষকে রচনাংশ উপহার দিয়া বলিতেছেন, 'You will at once see whom I imitate'. কখনও হোমার, কখনও মিলটন, কখনও সেক্‌স্‌পীয়ার, কখনও বা আর কেউ। শুধু কি তাই? এ যেন একটা Challenging spirit-এ কাব্য লইয়া লীলাখেলা। লিখিলেন,

* * * সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা।—

আর সঙ্গে সঙ্গে জানাইলেন যে এখানে পাঠকের মিলটনের কয়েকটি লাইন মনে পড়িয়া যাইতে পারে ;

"And whisper whence they stole
Those balmy spoils"—

অথবা Shakespeare-এর—

"Like the sweet south,
That breathes upon a Bank of Violets
Stealing and giving odour"—

কিন্তু শুধুই নিরীহের মত বিনয় প্রদর্শন নহে, কবি যে বায়ুকর্তৃক ফুলের গন্ধ 'অপহরণ'-এর পরিবর্তে চুম্বনের রূপক ব্যবহার করিয়াছেন, সে সম্পর্কে মন্তব্য : "Is not the "চুম্বন" a more romantic way of getting the thing than "stealing" ?"

ইহাতেই কবির আনন্দ। পূর্বসূরীদের নিকট হইতে লইয়াছেন তিনি প্রচুর ; লইয়াছেন আনন্দে, ঋণ স্বীকারও করিয়াছেন আনন্দে ; কিন্তু সৃষ্টি তাঁহার মৌলিকতার মহিমায় সমুজ্জল। কি ভাষণ-ভঙ্গিতে, কি চরিত্র-সৃষ্টিতে, কি পরিবেশ রচনায়,—সর্বত্র কবি-মধুসূদন আপন স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর। দোষত্রুটির কথা স্বতন্ত্র ; সে বিষয়ে কবি নিজেও সচেতন ও মুক্তকণ্ঠ :

উপর ছায়াপাত করিতে দিবেন না, এই সংকল্পে দৃঢ় থাকিতে পারেন নাই। সংসারের অজস্র প্রতিকূলতায় ব্যথাহত কবির আত্মা, মনে হয়, কখন আসিয়া আসর জুড়িয়া বসিয়াছে, কবি তাহা জানিতেও পারেন নাই। বীর-রসে কাব্যরচনার এমন গুরুগম্ভীর সংকল্প করুণ রসের বন্যায় ভাসিয়া গেল, কবি কোথাও বাঁধ দিতে পারিলেন না। বীরত্ব ও শক্তি-মন্ত্রের রুদ্র সাধক রাবণ যে কেবল দুর্জয় শক্তির মহিমায় বিভোর থাকিতে না পারিয়া আর দশজনের ন্যায় স্নেহ-মমতাময় পারিবারিক জীবনের জন্যও কাতর হইয়া পড়িলেন, ইহার কারণ, কবি রাবণের মধ্যেই তাঁহার নিজের ট্র্যাজিক জীবনকে প্রতিফলিত করিবার আগ্রহ দমন করিতে পারেন নাই। এই সম্পর্কে মোহিতলালের সুচিন্তিত অভিমতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"মেঘনাদবধ কাব্যের কবির চিত্তে একটা বড় দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব ছিল—কবির মন যাহা চাহিয়াছিল, প্রাণ তাহা স্বীকার করে নাই। তাই এপিক-আকারের তলে তলে অন্তঃসলিলা হইয়া লিরিকের ফল্গুস্রোত বহিয়াছে। এই লিরিক সুর কবির সুপ্ত আত্মারই ক্রন্দনধ্বনি, ইহাকে নিবারণ করা কবির পক্ষে অসাধ্য ছিল। নিজ জীবনের যে নিষ্ফলতা ও নৈরাশ্য তিনি জাগ্রত চৈতন্য হইতে দূরে রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তাহার কাতর ক্রন্দন মহাকাব্যের গীতোচ্ছ্বাসকেও প্রতিহত করিয়াছে। যে কামনা সফল হইবার আশা ছিল না, যে আদর্শকে সারা প্রাণ দিয়া বরণ করিয়াও জীবনে জয়ী করিতে পারেন নাই, তাহাই কবি-মানসে অশ্রুর উৎসরূপে বিরাজ করিতেছিল। * * * তাই মনে হয় মেঘনাদবধ কাব্যের কবি-মানস-বিশ্লেষণে আধুনিক মনঃসমীক্ষ বিজ্ঞান বিশেষ কাজে লাগিতে পারে,—এরূপ কাব্যসৃষ্টির দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আজ আমরা যখন দূর হইতে তাঁহার সেই কীর্তিকে পর্যবেক্ষণ করি, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারি, এই কাব্যরচনায় সেই যুগপ্রবৃত্তিই যেমন তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তেমন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের গূঢ়তম অনুভূতিই মধুসূদনের কবি কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। যুগদেবতার সেই প্রবল প্ররোচনা যেমন একদিকে তাঁহার হৃদয় বিস্ফারিত করিয়াছিল—তিনি নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তেমনি জাতি ও সমাজের অতি প্রাচীন দৃঢ়মূল সংস্কার—যাহার বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবন বিদ্রোহ করিয়া সর্বপ্রকারে বিড়ম্বিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন—তাহার প্রভাবও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। একদিকে নবযুগের নববাণীর বিপুল আশ্বাস, অপরদিকে এক অতিশয় জরাজীর্ণ অথচ অতিশয় করুণ-মধুর জীবনযাত্রার মমতাময় আহ্বান তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্য' সেইযুগের সেই বাণী এবং তৎসহ এক কবিহৃদয়ের সমগ্র উৎকণ্ঠা রূপকের আকারে ঘোষণা করিতেছে।"

(খ)

মধুসূদনের কবি-মানস লইয়া নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ইদানীং কালের অত্যুৎসাহী গবেষকদের ইহার প্রতি যেন একটা লোলুপতা দেখা দিয়াছে। বুঝিতে হইবে, নানাজনকে নানাভাবে আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা ইহার আছে; কিন্তু সেই সঙ্গে এরূপ বুঝিলে চলিবে না যে, কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে এই যুগ-প্রহরী কবির যাহাই ধরা পড়িবে তাহাই আত্যন্তিক

মূল্যের দাবী রাখে; আবার বড়ো পরিসরের বড়ো 'লেবেল'-মারা গবেষণায় যাহার স্থান হয় নাই তাহাই যে অপাঙক্তেয় এমন সিদ্ধান্তও অনুদার ও অসমীচীন।

প্রথমত, আমরা অনেকেই ভুলিয়া যাই যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ছাড়াও মধুসূদন আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন; ভুলিয়া যাই যে তিনি 'বীরাঙ্গনা-কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' এবং 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'-রও কবি। ইহার প্রমাণ, মধুসূদনের কবি-মানসের আলোচনায় সর্বত্র দেখা যায়, এক মেঘনাদবধ কাব্যই আসর জুড়িয়া আছে। অথচ উক্ত কাব্য-ত্রয়ের মধ্যে কবি-প্রতিভা ও কবি-মানসের যে পরিচয় আছে তাহাকে বাদ দিলে আমরা কখনও সম্পূর্ণ মধুসূদনকে পাইব না; আর যদি কেহ মনে করেন সেই পরিচয় সমস্তই এক মেঘনাদবধ-কাব্যে নিঃশেষিত, তবে তাঁহাকে অভ্রান্ত বলা কঠিন। মেঘনাদবধ-কাব্যই মাইকেলের শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং এই একটি মাত্র কাব্য মাইকেলকে বিশ্ববিশ্রুত করিবার পক্ষে যথেষ্ট, ইহা অবিসম্বাদিত; কিন্তু মাইকেলের কবি-প্রতিভা ও কবি-মানসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য অপর কাব্যগুলির প্রসঙ্গ অপরিহার্য। এক 'গীতাঞ্জলি'তেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু অবশ্যই উহা তাঁহার প্রতিভার বা কবি-মানসের পূর্ণ পরিচায়ক নহে।

মাইকেলকে প্রায়ই একটা যুগ-বিশেষের কবি বলা হইয়া থাকে; **যুগন্ধর মধুসূদন** সত্যই মধুসূদনের এক গৌরবময় পরিচয়। আবার এই যুগ-প্রতিনিধিত্বের স্বরূপটিও বিভিন্ন আলোকে চিত্রিত হইতে দেখা যায়। কেহ দেখাইয়াছেন তাঁহাকে শুধু বাংলার নব-জাগরণের (Renaissance) যুগের অথবা বাঙালীর জাতীয় জীবনের এক যুগ-সন্ধির কবি-রূপে, আবার কেহ ঐ সমকালীন জাতীয় জীবনের স্বরূপব্যাখ্যায় সমগ্রভাবে তদানীন্তন বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জটিলতার খুঁটি-নাটি বিশ্লেষণের সাহায্যে মাইকেলকে দেখাইয়াছেন সেই সর্বপ্রকারে দ্বন্দ্ব-মথিত জীবনের প্রতীক **যুগন্ধর** রূপে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমালোচনায় বলা হইয়াছে, "বাংলাদেশে উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বই জটিল আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাই ট্র্যাজিডির জন্ম দিয়াছিল। এই ট্র্যাজিক চেতনার কাব্যিক প্রকাশ মেঘনাদবধ মহাকাব্যে। * * * মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্য তৎকালীন বাঙালীর জীবনের মহাকাব্য—সেই জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনার ও সেই সম্ভাবনার বাস্তব অপরিপূর্তির।" এই যে মধুসূদনের সমকালীন যুগ-চেতনার মোটামুটি দ্বিবিধ পরিচয়, একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকস্পর্শ-মুক্ত ব্যক্তি ও সমাজের, প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব, অপরটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জটিলতা-সমন্বিত ব্যাপক জীবনদ্বন্দ্ব, এই দ্বিবিধ পরিচয়যোগে মধুসূদনের কবি-মানসকে সেই যুগ-চেতনার প্রতিভূরূপে দেখাইবার প্রচেষ্টা যেমন সার্থক তেমনি অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু আমাদের কথা হইল, এ সমস্তই শুধু কবিকে যুগের মধ্যে ধরিয়া রাখার আয়োজন। তিনি যুগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ইহা খুবই কৃতিত্বের কথা, সন্দেহ নাই; কিন্তু যুগাতীত হওয়ার কোনো দাবী যদি তাঁহার থাকে তবে যেন 'যুগন্ধর মধুসূদন'-এর প্রতিষ্ঠার সমারোহে যুগ-জয়ী বা যুগাতীত মধুসূদন আচ্ছন্ন হইয়া না পড়েন সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা দরকার বৈকি? দ্বিতীয় কথা, যে 'ব্যর্থতা'র নিরিখে মেঘনাদবধ-কাব্যের রাবণের পরিণতির বিচার করা হইয়া থাকে, তাহাতে

"I am sure the poem has many faults. What human production has not ?" দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক,—তাঁহার সীতা-চরিত্র, তাঁহার নরকবর্ণন বা তাঁহার যোগাসন-শৃঙ্গে উমা-মহেশ্বরের সাক্ষাৎকার। যখন বাল্মীকির নিকট ঋণ করিলেন, তখন কবির সর্বশক্তি নিয়োজিত হইল চিরবন্দিত সীতা-চরিত্রটির উন্নততর উজ্জ্বলতর মহত্তর রূপায়ণে। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে কবি সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। নরকবর্ণনায় তিনি দান্তের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহার সাফল্য সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকিলেও কবিমুখে আমরা শুনি তাঁহার সমকালীন সমালোচকদের কথা "some are quite prepared to prove that it is quite Puranic"। তৃতীয় প্রসঙ্গে আসিয়া কবি বলেন যে পাঠককে ইহা ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে: "I am not ashamed to say that I have, intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible"। এগুলি ছাড়া ছন্দ সম্পর্কেও তিনি বিভিন্ন সর্গের কথা অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ যোগে জানাইয়াছেন কোথায় কোন্ পূর্বসূরীর অনুকরণ বা অনুসরণ রহিয়াছে। মোটামুটি ভাবে মিলটনের শিষ্য হইলেও সর্গ বিশেষে (৮ম) কবি লিখিয়াছেন: "I fancy the versification more melodious and Virgilian and the language easy and soft".

এই আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে, কাব্যিক প্রকাশ কৌশলের নব-নবত্বের যে এক অফুরন্ত সম্ভার লইয়া আসিয়াছিলেন কবি মধুসূদন, তাহারই সদ্ব্যবহারে ছিল তাঁহার এক দুরন্ত মানস-প্রবণতা। আপন প্রতিভা-সচেতন কবি স্বীয় প্রবণতা ও প্রতিভাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য উপযুক্ত আধার খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন এক দুর্দম আবেগে! যেন উহার আয়ুষ্কাল বা স্থিতিকালও ছিল তাঁহার জানা, জানা ছিল ঐ কালের চতুঃসীমায় উহাকে যথাযোগ্য আধারে বিধৃত করা দুঃসাধ্য, তাই তিনি বাংলার সাহিত্যাকাশে উল্কার ন্যায় আবির্ভূত হইয়া কতিপয় দিগন্তে বিদ্যুদ্বেগে ছুটাছুটি করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। সেই দ্রুত ধাবনের মধ্যে যে যে দিগন্ত তিনি স্পর্শ করিয়াছেন তাহাই অনির্বাণ আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বুঝি স্থিতিকালের এই অভাবনীয় সংক্ষিপ্ততার জন্য কবি-প্রতিভাকে অনেক সময়ে যুগপৎ তিন বা ততোধিক দিগন্ত আলোকিত করিতে হইয়াছে। একই সঙ্গে চলিয়াছে, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'মেঘনাদবধ-কাব্য'। রাজনারায়ণকে একটি পত্রে কবিকে জানাইতে দেখি: "How you are, old boy, a Tragedy, a Volume of Odes, one half of a real Epic poem! All in the Course of one year; and that year only half old!" অর্থাৎ মাত্র ছয়মাসের মধ্যে একখানি সম্পূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক (কৃষ্ণকুমারী) একগুচ্ছ গীতিকবিতা (ব্রজাঙ্গনা) ও খাঁটি মহাকাব্যের (মেঘনাদবধ) অর্ধেক লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত কাহিনীই কবি-মানসের প্রতি যে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তাহার অনুসরণ করিলে আমরা অবশ্যই লাভবান হইব। কোথাও যেন ইহার দুদণ্ড তিষ্ঠাইবার উপায় নাই। কোন্ এক অনির্দেশ্য অপার্থিব তাড়নায় যে ইহা অনুষ্ঠান হইতে অনুষ্ঠানান্তরে ব্যাপৃত হইয়া চলিয়াছে, বিশেষত যে মুহূর্তে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' চলিয়াছে কবির অমিত্রছন্দে কাব্যরচনার যুগান্তকারী পরীক্ষা, ঠিক সেই মুহূর্তে যে কিসের তাড়নায়, কোন্ মর্মবাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে 'ব্রজাঙ্গনার' মত

মিলবহুল সঙ্গীত মুখর কাব্য রচিত হইতে পারে, তাহা ভাবিলে শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। তবে কবি-মানসের পরিচয় গ্রহণ করিতে বসিয়া এখানে এই কথাই মনে হয়, এ নেশা শুধুই সৃষ্টির নেশা, এ তাগিদ একান্তই সৃষ্টির তাগিদ। কোনো আদর্শ বা মতবাদের প্রতিষ্ঠা নহে, এ সৃষ্টি হইল নব নব কাব্যকলার সৃষ্টি; আর সেই সৃষ্টি-সূত্রে আপন কবিত্ব-শক্তির বিচিত্র বিন্যাসে কবি যেন শুধু লীলাই করিয়া গিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে এই লীলা-মানসই মধুসূদনের কবি-মানস। তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের মধ্যে অনেকে যেন তাঁহার কবি-মানসের একটা বিশেষ কিছুর সন্ধান পাইয়া থাকেন। সেটি আর কিছু নয়, সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও কবির মন পড়িয়াছিল স্বদেশীয় বিচিত্র স্মৃতির মধ্যে; দেশের মানুষ, দেশের জল-হাওয়া, দেশের যত শোভা-উৎসব, যত নদ-নদী-গাছ-পালা-জীব-জন্তু, সর্বোপরি দেশের প্রাচীন কাব্য-কাহিনী—ইহারাই যখন গড়িয়া তোলে বাংলার প্রথম সনেট-জগৎ, তখন সেই জগতের যিনি স্রষ্টা তাঁহার মনটি অবশ্যই ছিল স্বদেশ-পাগল। আমাদের কথা হইল, এই স্বদেশ-ভাবনার জন্য কবির যাহা প্রাপ্য তাহা অর্পিত হউক পর্যাপ্ত শ্রদ্ধায় ও সমারোহে; কিন্তু এ অভিমত অভ্রান্ত নহে যে ঐ মনন-ভাবনাতেই বাংলা সনেটের জন্ম হয়। মাইকেলের জীবনতথ্য একথা প্রমাণ করে না যে ফ্রান্সের "ভর্‌সেল্‌স্"-এ (Versailles) কবির বিদেশবাস না ঘটিলে তাঁহার হাতে সনেটের সৃষ্টি হইত না। দেশে থাকিতেই তিনি সনেট-রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহার সকল সৃষ্টির মতই কোনো একান্ত তপস্যায় নহে, নানা সৃষ্টির ভিড়ের মধ্যে, 'মেঘনাদবধ' চলিতেছে, সবে মাত্র তৃতীয় সর্গে হাত দিয়াছেন, চলিতেছে হয়তো আরও কিছু কিছুর মহড়া, তাহারই মধ্যে জন্ম লইল একটি সনেট, কারণ "I want to introduce the Sonnet into our language" ;—এই অনির্ণেয় আন্তর তাগিদ ও তাহার আনুষঙ্গিক প্রচণ্ড সংকল্পই মধুসূদনের সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মূল উৎস। সংকল্পটি জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই জানানো হইল, "and some morning ago made the following"—অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তির আগেই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সেটি হইল "কবি-মাতৃভাষা" যাহাকে আমরা পরবর্তী কালে "বঙ্গভাষা" নামক সনেটে 'কিঞ্চিৎ' রূপান্তরিত ভাবে পাইয়াছি। দেশে থাকিতেই কবি ইতালীয় ভাষার চর্চা করেন, কবি তাসোর (Tasso) মূল কাব্য পাঠ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন। শুধু তাই নয়, সেই 'challenging spirit এখানেও প্রবলভাবে সক্রিয়, "In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian," তাই ইউরোপে গিয়া যেই কবি একটু সুযোগ পাইলেন অমনি আয়ত্ত করিলেন উৎকৃষ্ট সনেটের কলাকৌশল একেবারে সনেটের কবি-গুরুর নিকট হইতে। "I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet, and scribbling some sonnets after his manner. কী কঠিন এই তপস্যা! পেত্রার্ক পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া বা নিছক আনন্দ লাভ করা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সনেটে হাত-পাকানো, যেমন পাকানো হইয়াছে Blank verseএর ছাঁচে অমিত্রাক্ষর কবিতায়, Homeric Epicএর ছাঁচে 'মেঘনাদবধে', Heroic Epistles এর ছাঁচে 'বীরাঙ্গনায়' ইত্যাদি। কিন্তু কেন এই কঠিন তপস্যা? এ কি শুধুই স্বদেশ-কাতর কবি-

হৃদয়টিকে মেলিয়া ধরা, না খ্রীষ্টান হইয়াও তিনি মনেপ্রাণে বাঙালী আছেন তাহাই প্রমাণ করা? বাঙালী মধুসূদন তো বাঙালীই থাকিবেন বটে। সামান্য কয়েকদিনের জন্য ইউরোপ বাস করিলে কি কাহারও কল্প-লোক ইউরোপ-ময় হইয়া যায়? বরং স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইলেই তো স্বদেশের কথা মনে দ্বিগুণ আবেগে জাগিতে থাকে। মধুসূদনেরও তাহাই হইয়াছে। ইহাতে বৈশিষ্ট্য কোথায়? আসল কথাটি অন্যত্র। সনেট-রচনায় যে বস্তুটি কবি-মানসে আবেগের তরঙ্গ জোগাইয়াছে তাহা হইল প্রতিভার নবতর লীলা, যাহা শুধু সনেট নহে, মধুসূদনের সমগ্র সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মূল উৎস। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিভা-লীলার কেন্দ্রে আছে কবির মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন-জনিত আত্মপ্রসাদ। চতুর্দশপদীতে কবির যেই হাত পাকিল, অমনি তিনি জানাইলেন, "I dare say the sonnet "চতুর্দশপদী" will do wonderfully well in our language." একটু বাদেই লিখিতেছেন, "Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up." সর্বত্রই কবির এই একই কথা,—আপন প্রতিভাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় ঢালিয়া দেওয়া। ভালোবাসিয়াছেন তিনি এই ভাষাকে, এর সাহিত্যকে, এমন ভালোবাসা বুঝি আর কেহই বাসে নাই; তাই তাঁহার স্বল্পকালীন প্রতিভাকে শত সূর্যের তেজে জ্বালাইয়া তাহারই প্রাণদ রশ্মিতে বিচিত্র সৃষ্টিকে বিচিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়া তাহা দিয়া সাজাইয়াছেন তাঁহার আদরের ভাষা ও সাহিত্যের আসর। "Our Bengali" এই দরদই তাঁহার কবি-মানসের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই মানস সর্বাগ্রে শিল্পি-মানস, অতঃপর অন্য কিছু। সেই শিল্প দিয়া কবি মনের মতো করিয়া সাজাইয়াছেন তাঁহার "বঙ্গভাষা"-কে 'বিবিধ রতনে', যাহার 'মণিজালে পূর্ণ খনি' তাঁহার নিজেরই আবিষ্কার।

১০। প্রশ্নোত্তর—১ম হইতে ৯ম সর্গ

১। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান অবলম্বন কোন্ রস—বীররস না করুণরস? বিশদভাবে ইহা আলোচনা কর।

উত্তর। আপাতদৃষ্টিতে মেঘনাদবধ কাব্য বীররসাশ্রয়ী মনে হইলেও, কাব্যরসবিচারের নিরিখে ইহাকে করুণরসের কাব্য বলাই সংগত। কাব্যের আরম্ভে কবি যদিও বলিয়াছেন, "গাইব, মা বীররসে ভাসি, মহাগীত।"—তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, ইহা অবিমিশ্র বীররসাত্মক কাব্য হইয়া উঠে নাই—আগাগোড়া বীররস প্রাধান্য লাভ করে নাই।

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের অংশবিশেষ লইয়া একটা 'regular Iliad' রচনা করার দুর্বার আগ্রহ কবিকে পাইয়া বসে। বহিঃশত্রু কর্তৃক দেশের অবরোধ ও সেই শত্রুর সহিত দেশপ্রেমিক বীরগণের যুদ্ধ যে বীররসাত্মক কাব্যের উপযুক্ত বিষয়বস্তু সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু বীররসের পাশাপাশি যে করুণরসের স্রোতোধারা আসিয়া গিয়াছে, তাহাকে কবি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে অনেক স্থলেই আমাদের মন উৎসাহে ভরিয়া উঠে

সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে যে কারুণ্য রহিয়াছে তাহাই যেন আমাদের চিত্তে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। এইজন্য অবশ্য কেবল কবিই দায়ী নহেন, বাঙালী পাঠকসমাজও দায়ী; বাঙালী পাঠকের মন চিরকালই কারুণ্যের সমঝদার। বীররস তাহাকে তেমন বলিষ্ঠভাবে স্পর্শ করিতে পারে না; করুণরসে তাহার স্পর্শকাতরতা এত বেশি যে, যেখানে বীরত্ব ও কারুণ্য পাশাপাশি চলিতে থাকে সেখানে সে দ্বিতীয়টির প্রভাবে প্রথমটির আবেদনে সাড়া দিতেই ভুলিয়া যায়। নচেৎ মেঘনাদবধের কবি এই বাংলা মায়ের ছেলে হইয়াও বীরছন্দে যে-পরিমাণ বীররস পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা আমাদের বাংলাকাব্যকে চিরঋণী করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে বিলাপের পরেই আমরা রাবণের মুখে শুনিতে পাই:

"কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"

বীর-পুত্রের বীর-পিতার মতই এখানে রাবণের যুদ্ধ-কাহিনী শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। অতঃপর যুদ্ধের যে সুনিপুণ চিত্রখানি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যই আমাদের অন্তরে মাঝে মাঝে রোমাঞ্চ জাগিয়া উঠে। বীরকুঞ্জর বীরবাহু মদকল-করীর ন্যায় নলবনে প্রবেশ করিবার ভঙ্গীতে অরিদল-মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; ভগ্নদূত উচ্চকণ্ঠে বুক ফুলাইয়া বলিতেছে 'পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা'; অথবা রাবণের বীরোচিত উৎসাহ বাণী:

"সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?"

—ইত্যাদি অংশে কবি যে বীররসেরই সার্থক পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাবণ পুত্রশোকে নিরতিশয় কাতর হইলেও, তাহার বীর-চূড়ামণি বীরবাহু রণক্ষেত্রে কিরূপ বীরশয্যায় শায়িত ইহা দেখিয়া সে যখন নয়ন জুড়াইতে চাহে, তখন তাহাকে নিতান্তই আমাদের ঘরের স্নেহদুর্বল পিতার সমশ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

এই রাবণের বীর-যোদ্ধরূপ আর একবার আমরা দেখিতে পাই সপ্তম সর্গে। রাবণের চক্ষে আমরা অবিরল অশ্রুধারা দেখিয়াছি, তাহার বিলাপও শুনিয়াছি অতি করুণ; কিন্তু এই কারুণ্যের শৈত্য তাহার বীরত্ব ও যুদ্ধোন্মাদনার উত্তাপকে আর্দ্র করিতে পারে নাই। তাই দেখা যায়, যুদ্ধগমনের প্রাক্কালে পদতলে পতিতা মন্দোদরীকে রাবণ বলিতেছে:

"যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!

* * *

যাও ফিরি; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি?"

এক হিসাবে সমগ্র সপ্তম সর্গের মূল সুরই যুদ্ধের সুর ; কখনও রাক্ষস-সৈন্য, কখনও দেব-সৈন্য, কখনও বা বানর-সৈন্য এবং সর্বোপরি রাবণ ও তাহার প্রধান প্রতিপক্ষ সৌমিত্রি কেশরী সকলেই এখানে বীরত্বের আস্ফালনে মত্ত! ইহা ছাড়া, ষষ্ঠ সর্গের শেষার্ধে মেঘনাদের চরিত্রে প্রকৃত বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে। মেঘনাদ সর্বত্রই বীরত্বপূর্ণ, এমনকি তাহার কুঞ্জবিলাস, প্রেমালাপ, মাতাপিতার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ সর্বত্রই তাহার আচরণ বীরত্বব্যঞ্জক। আর কিছু বীররস আমরা পাই, চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা ও নৃ-মুণ্ডমালিনী এই তিন বীরাঙ্গনার উক্তি ও আচরণের মধ্যে। প্রমীলা ও তাহার নারীবাহিনীর বীরত্বগাথারূপে সমগ্র তৃতীয় সর্গই এক হিসাবে বীররসে উদ্দীপ্ত। কারণ বীররসের মূলগত ভাব যে উৎসাহ, তাহার ব্যঞ্জনা এই সর্গে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু রস-প্রাধান্যের বিচারে এই কথাই বলিতে হয় যে, এত বড় একখানি কাব্য বীররস-প্রধান হওয়ার পক্ষে উল্লিখিত বীররসের খতিয়ান নিতান্তই অপর্যাপ্ত। আমরা কখনই ভুলিতে পারি না যে, সমগ্র চতুর্থ ও নবম সর্গের প্রতিটি ছত্র করুণরসে অভিসিঞ্চিত এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম সর্গের প্রথমার্ধ রামের সকাতর অশ্রুধারায় একেবারেই প্লাবিত। তাহা ছাড়া, এই কাব্যের নয়টি সর্গের মধ্যে এমন একটিও নাই যেখানে করুণরস প্রবেশ করে নাই। মোটকথা যে কাব্যের শুরুতেই তাহার নায়ককে দেখা যায়, 'বাক্যহীন, পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে অবিরল অশ্রুধারা—' এবং যাহার শেষে একা নায়ক নহে, 'সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে', আর যাহার দীর্ঘ কলেবরের অধিকাংশই অশ্রু-কোমল, বীরপদক্ষেপের উপযোগী কঠিন ভূমি যেখানে এতই অপ্রশস্ত,—সে কাব্যকে করুণরস-প্রধান না বলিয়া উপায় কি? মহাকাব্যরচনা সম্পর্কে মধুসূদন দণ্ডী বা বিশ্বনাথের বিধানকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই—পারেন নাই এইজন্য যে, তাঁহার কল্পনায় গ্রীক নাটক ও কাব্যের ট্রাজেডি গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। মাইকেলের কবি-কল্পনা ট্রাজেডির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি উনবিংশ শতকের কবি হিসাবে এই সত্যকেও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ট্রাজেডির মধ্য দিয়াই আমরা আমাদের চতুর্দিকে প্রসারিত সুবিশাল জগৎ ও জীবনকে সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

দণ্ডীর "কাব্যাদর্শে" মহাকাব্যের যে কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সাহায্যে মেঘনাদবধ কাব্যকে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, কাব্যরচনায় ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রসম্মত রীতিকে গ্রহণ করিয়াও মাইকেল পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সাহিত্যের অনুকরণে ইহার মধ্যে নূতনত্ব আনিয়াছেন, সজীবতা আনিয়াছেন, আর আনিয়াছেন এক নূতন গতিশীলতা। তাই তাঁহার কাব্যসৃষ্টি দুই আদর্শের মিলনে বিচিত্র রূপরসে সঞ্জীবিত হইয়া বাংলা সাহিত্যে এক নূতন দিক্-নির্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। বীররসের সহিত করুণরসের (ট্রাজেডির অবলম্বন করুণরস) মিলনে মেঘনাদবধের রসপ্রবাহ যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সে বিষয়ে সমালোচকেরা একমত।

কেবলমাত্র ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের বিচারে হয়ত কেহ বলিবে যে, মেঘনাদবধ কাব্যে রস-দোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বীররস ইহার স্থায়িভাব হইলেও সমগ্র কাব্যখানির মধ্য দিয়া করুণরস অন্তঃশীলা ফল্গুধারার ন্যায় বহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ট্রাজেডিতে পরিণত হইয়াছে—আলংকারিকগণের মতে ইহা নিন্দনীয়। কিন্তু বীররসের আশ্রয়ে করুণরসকে প্রাধান্য দিয়া কাব্যসৌন্দর্যবৃদ্ধির এই যে অভিনব এবং সার্থক পরীক্ষা—ইহাই ত মাইকেলের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য

এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ত মাইকেল—মাইকেল। সৃজনী-শক্তিসম্পন্ন প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি, কেবলমাত্র তাঁহার পক্ষেই ইহা সম্ভব ছিল। আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করিবার আছে। অনেকে বলিয়া থাকেন মেঘনাদবধ যুদ্ধের কাব্য, কিন্তু কাব্যের মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করিলে পরে আমরা বুঝিতে পারি যে, রাম-রাবণের যুদ্ধই ইহার প্রধান ঘটনা নহে, কিংবা বীরত্বের আদর্শ প্রদর্শন করাই কবির মুখ্য অভিপ্রায় ছিল না। কবি তাঁহার এই কাব্যটিতে বিভিন্ন রসের সহিত (বিশেষ করিয়া করুণরস) বীররস পরিবেশন করিয়াছেন এইমাত্র। ইহা প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসোন্মুখ লঙ্কার একটি চিত্র। রাবণ কি করিয়া ধীরে ধীরে অনিবার্য সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছেন, কেমন করিয়া নিষ্ঠুর নিয়তি দিন দিন রক্ষোরাজকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে, তাঁহার সকল গৌরব ও দম্ভ ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে—তাহারই পরিচয় সর্গে সর্গে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যুতে কাব্যের আরম্ভ এবং মেঘনাদের মৃত্যুতে ইহার পরিসমাপ্তি অর্থাৎ বিষাদে আরম্ভ এবং বিষাদেই শেষ। সুতরাং এই বিষাদকে রূপায়িত করিতে গিয়া কবিকে করুণরসের আশ্রয় লইতে হইয়াছে বেশি করিয়া। তাই বীররসের অন্তরালে নিগূঢ় করুণরস প্রবাহিত হইয়া সমগ্র কাব্যখানিকে বিয়োগান্ত কাব্যের মহিমা দান করিয়াছে।

২। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ অবলম্বনপূর্বক রাবণ-চরিত্রটির পরিকল্পনায় মাইকেলের চরিত্র-সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। অমিত শক্তি ও অতুল ঐশ্বর্য সত্ত্বেও রাবণ যেন দৈবাহত একটি পৌরুষের চিত্র। বীরবাহুর মৃত্যুতে কাতর হইয়াই তিনি কেবল পরিতাপ করিতেছেন না—অনিবার্য ধ্বংসের ধীর-মন্থর অথচ নিশ্চিত আগমনের উপলব্ধি তাঁহার চিত্তকে বিষাদগ্রস্ত করিয়াছে। তাঁহার মত বিরাট পুরুষের পক্ষে এইভাবে শোকে কাতর হওয়া শোভা পায় না—এই কথা যখন মন্ত্রী সারণ রাবণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন তখনও আমরা দেখিতে পাই যে, লঙ্কেশ্বর শোকের স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত বীরবাহুকে দেখিবার জন্য রাবণ উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিলেন, অবরুদ্ধ লঙ্কাপুরী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। শত্রুবেষ্টিত লঙ্কাকে দেখিয়া তাঁহার মন বিষাদে ভরিয়া উঠিল। তাহার পর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রশায়ী বীরবাহুকে দেখিলেন। পুত্রের মৃতদেহ দেখিয়া তিনি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, বীরবাহু বীরের মতো যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছে, ইহা তাহার পক্ষে গৌরবের কথা। যে বীর, সে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিতে ভয় পায় না। মধুসূদন গ্রীসীয় কাব্য হইতে দেশপ্রেমের আদর্শ গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্ত্য স্বাদেশিকতার বীরধর্মী আদর্শই রাবণের এই বীরবাহুর দেশানুরাগের প্রশংসার উৎস। পুত্র আপনার মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, এই অনুভূতি রাবণের হৃদয়ে গর্বের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে রাবণ অনুভব করিতেছেন যে, তাঁহার হৃদয় লৌকিক মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন। তাঁহার বীরত্বের আদর্শের মধ্যে কাঠিন্য আছে, কিন্তু সেই কাঠিন্যেরই অন্তস্তলে আছে এক পুষ্প-কোমলতা।

পুত্রশোকে কাতর রাবণের বিলাপের ভিতর দিয়া জাগতিক দুঃখে কাতর ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানবের চিরন্তন প্রশ্ন ব্যক্ত করা হইয়াছে। মধুসূদন রাবণকে বিরাট-পুরুষ হিসাবে কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু কবি তাঁহাকে অতি মহৎ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। জাগতিক দুঃখ-বেদনা তাঁহাকে স্পর্শ করে এবং

তাঁহার চিত্তকে বিমথিত করিয়া দেয়। তাঁহার জীবনে পৌরুষের প্রাবল্য আছে, কিন্তু জীবন-যুদ্ধে বারবার পরাজিত হওয়ায় তিনি দৈবের আধিপত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পুত্রের মৃত্যুজনিত যে শোক তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তিনি বিধির বিধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনদর্শন শক্তির পরিবর্তে অদৃষ্টকেই প্রাধান্য দান করিতে চাহিয়াছে।

যাহারা কেবল শক্তির লীলায় মত্ত থাকিয়া আপন পৌরুষের মোহন মূর্তি দেখিতে চায়, তাহারা অনেক সময় ধর্মাধর্ম, ন্যায়ান্যায় সম্পর্কে সচেতন থাকিতে পারে না। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, পুত্রশোকের বেদনা বক্ষে বহন করিয়া চিত্রাঙ্গদা আপনার স্বামীর অন্যায় আচরণের সমালোচনা করিয়া যখন তাঁহাকে ভর্ৎসনাপূর্বক বলিলেন যে, রাবণ নিজের দোষে আপনার ও লঙ্কার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছেন, তখন রাবণ, চিত্রাঙ্গদার এ অভিযোগ সত্য জানিয়াও ইহা স্বীকার করিতে পারিলেন না। এখানে তাঁহাকে শক্তিমদমত্ততাজনিত পাপান্ধতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিলে, ইহার হাত হইতে তাঁহাকে বাঁচানো বড় সহজ নহে।

পুত্রবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য রাবণ নিজেই যুদ্ধে যাইবেন ঠিক করিলেন। ইহা শুনিয়া মেঘনাদ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাবণ ইন্দ্রজিতকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু পুত্রের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বলিলেন যে, মেঘনাদ যদি প্রকৃতই যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যেন নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করিয়া ইষ্টদেবের নিকট বরগ্রহণপূর্বক যুদ্ধযাত্রা করেন। বাসববিজয়ী পুত্রকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া রাবণ স্বীয় দুর্বলতাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, কেবল আত্মশক্তি দ্বারা যুদ্ধজয় সম্ভব নয়, অন্তরে তিনি দৈববল কামনা করিতেছেন। ফলে, মধুসূদনের সৃষ্ট এই বিরাট-পুরুষ ক্রমেই দুর্বলচিত্ত ও দৈবনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন।

বাল্মীকি রাবণকে মহৎচরিত্র করিয়া সৃষ্টি করেন নাই—তাঁহার সৃষ্ট রাবণ-চরিত্র অনাচারী নিশাচরদের পাপপরায়ণ অধিপতি মাত্র। কিন্তু মধুসূদনের রাবণ কদাচারী রাক্ষস নহে—দেবতায় তাঁহার ভক্তি আছে, আর আছে ইষ্টে নিষ্ঠা। লঙ্কামধ্যে তিনি দেবমন্দির নির্মাণ করিয়া তাহার চূড়াদেশ হীরকে মণ্ডিত করিয়াছেন। ভাগ্য-নির্যাতিত এই মহৎ চরিত্রটির পরিকল্পনামূলে ইংরাজ-কবি মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' নামক কাব্যের শয়তান চরিত্রের ছায়া আছে। মিল্টনের কাব্যের এই চরিত্রটিকে প্রবল শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রমশঃ পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। মাইকেলের রাবণ মিল্টনের শয়তানের ছাঁচে গঠিত হইলেও, একদিকে শৌর্য-বীর্য-দম্ভ ও অপরদিকে স্নেহদুর্বলতায় উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

৩। চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের উৎস কি? এই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তর। চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র কবির নিজস্ব কল্পনা হইতে উদ্ভূত! বাল্মীকি-রামায়ণে বীরবাহুর চরিত্রের উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণেই আমরা বীরবাহুর চরিত্র দেখিতে পাই। কিন্তু সেখানেও তাহার মাতা চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভে গাঢ় করুণরস সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কবি পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদা চিত্রটি আঁকিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা রাবণের মহিষী

নহেন, এমন কি লঙ্কেশ্বরের সুবিপুল অন্তঃপুরে তাঁহার স্থান ছিল অতি নগণ্য। রাণী হইয়াও তিনি ছিলেন কাঙালিনী। বীরবাহু ছিল এই কাঙালিনীর পরম ধন।

স্বামীর নিকট হইতে মহিষীর উপযুক্ত মর্যাদালাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই স্বামীর দুঃখ বা বেদনার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। স্বামীর প্রেমে নিঃসপত্ন অধিকার তাঁহার ছিল না, তাই স্বামিপ্রেম চিত্রাঙ্গদার জীবনের প্রধানতম সূত্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। এইজন্য তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা দিনে দিনে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে বলিয়া তাঁহার কোন বেদনা ছিল না—স্বীয় পুত্রের অকালমৃত্যুতেই চিত্রাঙ্গদার চিত্তকে শোকাতুর করিয়া তুলিয়াছে। আপনার পুত্র জীবিত থাকিলে, লঙ্কাপুরী ধ্বংস হইয়া গেলেও তিনি বিন্দুমাত্র আক্ষেপ করিতেন বলিয়া মনে হয় না—একমাত্র সন্তানের মৃত্যুই তাঁহাকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে রাজসভায় টানিয়া আনিয়া রাবণকে তিরস্কারে প্রণোদিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পুত্রশোক চিত্রাঙ্গদাকে স্পষ্টবাদিনী করিয়া তুলিয়াছে। "দেশের শত্রু বিনষ্ট করিয়া বীরবাহু স্বর্গে গিয়াছে—তাহার জন্য শোক করা বীরমাতার উচিত নহে—" এই বলিয়া রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিতে চাহিলে তিনি সেই প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা মানেন নাই। তিনি রাবণকেই লঙ্কার ধ্বংসের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। "নিজ কর্ম্মফলে, মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি"—সমগ্র রাক্ষসপরিবারের মধ্যে একমাত্র চিত্রাঙ্গদাই রাবণের দুষ্কার্যের সমালোচনা করিতে সাহসী হইয়াছেন।

[এই সঙ্গে "মেঘনাদবধ কাব্যে চরিত্রসৃষ্টি" নিবন্ধে চিত্রাঙ্গদা-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।]

৪। মেঘনাদবধ কাব্যে দ্বিতীয় সর্গের উৎস কি? কাব্যের মধ্যে এই সর্গটির সার্থকতা কোথায়?

উত্তর। দ্বিতীয় সর্গের বর্ণিত ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই সমস্ত ঘটনার কোনও উল্লেখ নাই। ইন্দ্রজিৎ-বধের একটি প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র বর্ণনাই দ্বিতীয় সর্গের বিষয়। তবে এই সর্গের পরিকল্পনা কবি অংশতঃ হোমরের ইলিয়াড হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের নিধন-ব্যাপারে দেবগণের সক্রিয় সহায়তার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে, মধুসূদন দেবগণকে ইলিয়াডের মতো প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামক্ষেত্রে নামাইয়া না আনিলেও, মেঘনাদের বধ-সাধনে তাঁহাদেরও অংশ গ্রহণ করাইয়াছেন।

দ্বিতীয় সর্গের মূল বক্তব্য ইন্দ্রজিতের বধের জন্য অস্ত্রসংগ্রহ। এইজন্য দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং উদ্যোগী হইয়াছেন। রক্ষকুলরাজলক্ষ্মী রমার আদেশে ইন্দ্র কৈলাসে শিব ও দুর্গার কাছে গিয়াছেন। শিব ও দুর্গাকে শ্রেষ্ঠ দেবদেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মাইকেলের এই কল্পনার মূলে গ্রীসীয় কাহিনীর দেবরাজ জিউস ও তাঁহার রাণী থেরার চরিত্রের ছায়াপাত হইয়াছে। মাইকেলের কৈলাস-পর্বত হোমরের ওলিম্পস্ পর্বতের ভারতীয় সংস্করণ মাত্র। ইলিয়াডে দেখি যে, থেরা গ্রীসীয়দের পক্ষপাতিনী এবং তাঁহাদের প্রতি জিউসের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া জিউসকে ভুলাইয়াছেন। মধুসূদনের কাব্যেও দেবী ভবানী রাঘবের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্না এবং মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া তিনি শঙ্করের নিকট মেঘনাদবধের উপায় জানিয়া লইয়াছেন।

কবি এই প্রসঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে একটি সুপ্রসিদ্ধ ভাব-কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

মদনের সাহায্যে মহাদেবের তপোভঙ্গের পরিকল্পনাটি কালিদাসের কুমারসম্ভব হইতে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য কাহিনীর বিশিষ্ট প্রয়োজনের জন্য মধুসূদন এই ঘটনাটিকে একটি নূতন রূপ দিয়াছেন। মদনভস্মের পূর্বকাহিনীরও উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে কালিদাসের ভাবগাম্ভীর্য মেঘনাদবধে আদৌ রক্ষিত হয় নাই। মাইকেলের শিব আর কালিদাসের শিবে পার্থক্য বিস্তর। মধুসূদনের "প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী" ভারতচন্দ্রের কামাতুর শিবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মেঘনাদ অজেয় বীর। তাহাকে বধ করিবার জন্য দেবপ্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রয়োজনের পরিকল্পনাটি ইলিয়াড হইতে গৃহীত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া মেঘনাদকে বধ করিবার উদ্যোগ পরোক্ষে মেঘনাদের অসীম বীরত্বেরই পরিচয় দান করে। মেঘনাদ মাইকেলের কবি-কল্পনার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাঁহার মানস-সন্তান। তাই তাহাকে তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। কোন যোদ্ধা কেবল নিজশক্তির সাহায্যে তাঁহার প্রিয় বীর মেঘনাদকে বধ করিবে ইহা কবির কল্পনার বাহিরে। তাই তাহার বধের জন্য তিনি বহুবিধ আয়োজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দিব্যাস্ত্র-সংগ্রহ অন্যতম। ইহাই দ্বিতীয় সর্গটি রচনার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। দেবগণও রামচন্দ্রের পক্ষ গ্রহণ করিয়া রাবণের দৈবকে প্রতিকূল করিয়া তুলিয়াছেন, এই সর্গেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

৫। "প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!"—এই উক্তি দ্বারা মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেল মহাদেবের চরিত্র কতখানি ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দাও। দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত ঘটনাটির গল্পগত প্রয়োজনই বা কি?

উত্তর। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শিব-চরিত্রের যে পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে তাঁহার অতুলনীয় ত্যাগ, নিঃস্পৃহতা ও বৈরাগ্যের প্রতি আসক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্যে মহাদেব তো যোগিশ্রেষ্ঠ। কুমারসম্ভব কাব্যের যোগারূঢ় মহাদেবের যে চিত্রটি তিনি আঁকিয়াছেন, তাহার ভাবগাম্ভীর্য আমাদের সহজেই অভিভূত করিয়া দেয়। তপস্যার বিঘ্ন হওয়ায় মদনকে তিনি স্বীয় তৃতীয় নয়নের অগ্নি দিয়া ভস্মীভূত করিয়াছেন।

সেই মহাদেব প্রেমামোদে মাতিবেন, এই কল্পনা আমরা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি না। কাজেই দেখিতেছি যে, মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গে দেবাদিদেব মহাদেবের চরিত্রমহিমা এখানে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। মাইকেলের শিব তপোভঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া মদনকে ভস্মীভূত করা দূরে থাকুক, সম্মুখে মোহিনী বেশধারিণী ভবানীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহার পর কবি তাঁহাদের প্রেমামোদের উল্লেখ করিয়াছেন। তপস্যা হইতে বিরত হইবার পরই এইভাবে কামগ্রস্ত হওয়া শিব-চরিত্রের পক্ষে গৌরবজনক নহে; যোগিশ্রেষ্ঠ স্বামীকে এইভাবে প্রলুব্ধ করার কল্পনা কুমারসম্ভব কাব্যের তাপসী উমার পক্ষে অমর্যাদাকর। মধুসূদনের মহাদেব এখানে ভারতচন্দ্রের শিব হইয়া পড়িয়াছেন।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু-দেবদেবীর প্রতি মাইকেলের অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার ভাব জন্মিয়াছে। শিব-চরিত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কুমারসম্ভবে ধ্যানমগ্ন, জিতেন্দ্রিয় দেবাদিদেব মহেশ্বরের যে বিরাট কল্পনা আছে, তাহা ইলিয়াডের কল্পনা অনুসরণ করিবার ফলে, মধুসূদন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

সেইজন্যই মাইকেলের মহাদেব হোমারের কামাতুর জীউসের প্রতিরূপ হইয়া পড়িয়াছেন এবং ভবানী থেরার মত কলাকৌশলময়ী নারীতে পর্যবসিত হইয়াছেন।

একথা সত্য যে, মধুসূদন গ্রীসীয় কাব্যের ছাঁচে ফেলিয়া তাঁহার কাব্যটি রচনা করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু বিধর্মী বলিয়াই যে তিনি শিব-চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, একথা বলা চলে না। কালিদাসের কাব্যের শিব-চরিত্রের মহত্ব তিনি যে একেবারেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এমন নহে। ধ্যান-নিরত মহাদেবের যে সৌম্য মূর্তিটি আমরা তাঁহার কাব্যে পাই ঃ

> "দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তাপস,
> বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
> তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান হত।"

তাহার মধ্যে অশ্রদ্ধা কোথায়? শিব-চরিত্রের মহত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলে মধুসূদন দুশ্চর তপস্যারত মহাদেবের এই ভাবগম্ভীর ছবিটি আঁকিতে পারিতেন না। আসল কথা, মধুসূদনের মনোভঙ্গির বিচারে কোনো ছত্রবিশেষ বা চিত্রবিশেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে আমরা ভুল করিব। কাব্য মধ্যে এমন বহু চিত্র স্থান পাইয়াছে যাহার মূলে আছে কোনো বিদেশীয় বড়ো কবির অনুসরণে কাব্যের কলেবর গঠনের ঐকান্তিক প্রয়াস। বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্য ইলিয়াদ-এর ছাঁচে কাব্য নির্মাণ করিবেন, কবির জীবনের একটি বড়ো সাধ। ইহাতে যাঁহারা কবির অহিন্দু মনটাকেই বড়ো করিয়া দেখেন তাঁহাদের দৃষ্টি অনুদার তো বটেই, ভ্রান্তও বটে। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া তিনি খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি কথায় প্রতি পাদক্ষেপে যাঁহারা ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদের উদার বলা যায় না। এই ছিদ্রানুসন্ধিতার জন্য আমাদের অনেকেই অহিন্দু মধুসূদনের মধ্যে কবি মধুসূদনকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আলোচ্য ছত্রে মাইকেলের শিব ভারতচন্দ্রের কামাতুর শিবে পরিণত হইয়াছে বলা হয়, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে তো ঠিক মাইকেলের মত আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় না। দেব-দেবীর লীলাকীর্তনে আমাদের মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন সাহিত্যের বহুস্থানেই তো আছে বহু শৃঙ্গাররসাত্মক চিত্র ; কৈ, সেখানকার কবি বা রচয়িতাদের তো মাইকেলের মত এমনভাবে চাপিয়া ধরা হয় না? যেহেতু মধুসূদন ধর্মত্যাগ করিয়াছেন, হিন্দুর দেব-দেবী সম্পর্কে তাঁহাকে হুঁসিয়ার হইয়া মন্তব্য করিতে হইবে! অথচ মধুসূদন যে কেন তাঁহার কাব্যে কথায় কথায় ইলিয়াদ হইতে ভাব-চিত্র বা ভাষা-চিত্র আমদানী করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা চাপা পড়িয়া গেল। কবির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল হোমার, মিলটন, দান্তে প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত কবির কলা-কৌশল আপন মাতৃভাষায় আয়ত্ত করিয়া তাহাকে শক্তিশালিনী ও ঐশ্বর্যময়ী করিয়া তুলিবেন। একমাত্র এই উদ্দেশ্যে তিনি যখন যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই অনুকরণ করিয়াছেন। মহাদেবের চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করা নহে, মহাদেব অবলম্বনে জীউসের প্রতিরূপ রচনার শিল্পগত আকর্ষণই এই ছত্রটির জন্মরহস্য, ইহার অধিক আর কিছু নহে।

দ্বিতীয় সর্গের এই ঘটনাটির গল্পগত প্রয়োজনও আছে। রাবণের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অকৃত্রিম ভক্তি মহাদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, তাই রাবণ তাঁহার একান্ত প্রিয়। সুতরাং মহাদেব যে

তাঁহার প্রিয় ভক্তকে সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা স্বাভাবিক। যদি রামচন্দ্রকে যুদ্ধে জয়ী করাইতে হয় তবে মহাদেবের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইবে। এইজন্য ইন্দ্র পার্বতীর শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং পার্বতী মদনের সাহায্যে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য করিয়াছেন। কাব্যের কাহিনী-বিন্যাসের পক্ষে এই ঘটনার অবতারণা কাব্যের স্বাভাবিক ধারাপথেই আসিয়াছে। তবে ভাবগম্ভীর এই দৃশ্যে আদিরসের স্পর্শটি এড়াইতে পারিলে ভালই হইত। কবি স্বচ্ছন্দে আরও একটু সংযম ও সাবধানতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

৬। ক্লাসিক রীতির অনুসরণ করিয়া মধুসূদন সাধারণ কথাকেও অলংকার সহযোগে অনুপম করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—মেঘনাদবধ কাব্য হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট কর।

উত্তর। প্রতিপদে অলংকার সৃষ্টি করা ক্লাসিক রীতির কাব্যের বৈশিষ্ট্য, মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে এই ক্লাসিক রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের প্রায় প্রতি চরণেই অলংকারের অনুপম দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

প্রথম সর্গে মন্ত্রী সারণ যখন শোকার্ত লঙ্কেশ্বরকে সান্ত্বনা দিলেন, তখন তাহার উত্তরে রাবণ বলিতেছেন :

"হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"

এখানে রাবণ বলিতেছেন যে, মৃণালের উপর পদ্ম শোভা পাইলে তাহা গৌরবে উন্নত হইয়া জলের উপরে ভাসিতে থাকে। কিন্তু যখন কেহ সেই পদ্মটিকে ছিঁড়িয়া লয়, তখন সেই মৃণালটি জলে ডুবিয়া যায়! রাবণের হৃদয়-বৃন্তে বীরবাহু-কুসুম ফুটিয়াছিল। নির্মম কাল সেই কুসুমটিকে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। সুতরাং তাঁহার হৃদয় শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। এখানে মৃণাল, পদ্ম ও সাগর (অর্থাৎ সরসীর জল), যথাক্রমে রাবণের হৃদয়, বীরবাহু ও শোকের—উপমানরূপে বর্ণিত হওয়ায় চিত্রখানি আলংকারিক বিচারে অতিশয় সার্থক হইয়াছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত :

"দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক!"

রাবণ উন্নত প্রাচীরের উপর উঠিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তিনি দেখিলেন যে, রামচন্দ্র লঙ্কার পশ্চিম দ্বার অবরোধ করিয়া আছেন। সীতার বিচ্ছেদ-ব্যথা তাঁহার অন্তরকে বিধুর করিয়া তুলিয়াছে। ব্যথাহত হইয়া তিনি ম্লানমুখে বসিয়া আছেন। রামচন্দ্রের সৌন্দর্য চন্দ্রের

মতোই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু প্রেয়সী জ্যোৎস্নার বিরহে চন্দ্র যেমন মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া পড়েন জানকী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রাঘবও তেমনি খিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

দ্বিতীয় সর্গ হইতে এইরূপ আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে। যোগাসনে ধ্যান-নিমগ্ন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন ঃ

"পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে!"

পার্বতীর আদেশে ধ্যান-নিমগ্ন মহাদেবের প্রতি মদন পুষ্পশর নিক্ষেপ করিলেন। অকস্মাৎ তপস্থায় এই বিঘ্ন ঘটায় মহাদেবের ক্রোধের উদ্রেক হইল। তাঁহার অস্থিরতায় সারা পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল—শিবের ললাটের নয়নাগ্নি ধক্‌ধক্ করিয়া জলিতে লাগিল। মদন তখন ভীত হইয়া ভবানীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মধুস্থদন এই ঘটনাটিকে ক্লাসিক রীতি অনুসারে একটি অলংকারের সাহায্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মদনকে সিংহ-শাবক ও ভবানীকে সিংহীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ঘোর দুর্যোগের সময় আকাশ হইতে বজ্রপতনের শব্দে সারা পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে—তাহার প্রচণ্ড অগ্নি প্রলয়ের আলোর মতই উজ্জ্বল। সেই গুরুগম্ভীর মেঘ-গর্জন ও বিদ্যুৎ-অগ্নির সেই প্রোজ্জ্বল দ্যুতি সিংহ-শাবককে ত্রাসিত করিয়া তুলে। সে তখন তাহার মায়ের কোলে ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ধূর্জটির ক্রোধ ও তৃতীয় নয়নের অগ্নি বজ্র ও বিদ্যুৎ অপেক্ষা ভীষণ। মদন তাহা দেখিয়া সিংহ-শাবকের ন্যায় আতঙ্কিত হইয়াছে এবং সিংহ-শাবক যেমন মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইভাবে সে জগন্মাতার বক্ষোদেশে গিয়া লুকাইয়াছে।

৭। মেঘনাদবধ কাব্যে উল্লিখিত 'প্রমীলা' চরিত্রের সার্থকতা কি? এই নারী-চরিত্রটি গঠনের পরিকল্পনায় মধুসূদনের নিজস্ব মৌলিকতাই বা কতটুকু?

উত্তর। ("মেঘনাদবধ কাব্যে চরিত্রসৃষ্টি" নিবন্ধের যে-অংশে প্রমীলা-চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা আছে, উহা দ্রষ্টব্য।)

৮। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলা-চরিত্রের পরিকল্পনার মূল কি?—এই সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তর। মধুস্থদনের প্রমীলা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। আমাদের সাহিত্যে এই চরিত্র সম্পূর্ণ নূতন। "য়ুরোপীয় কাব্যে বীররমণীর অভাব নাই। হোমরের এথিনী ও বীরাঙ্গনা পেনথিসিলিয়া, ভার্জিলের ক্যামিলা, ট্যাসোর গিল্‌ডিপ, ক্লরিণ্ডা, এরমিনিয়া ও আর্মিড এবং জোয়ান অব আর্ক ইত্যাদি সকলেই বীরাঙ্গনা। কিন্তু ইহাদের কেহই প্রমীলার আদর্শস্থানীয়া নহেন। এই সকল বীরাঙ্গনার রুদ্রভাবের পরিচয়ই আমরা পাই। কখনো তাঁহাদিগকে অশ্বারোহণে পলায়নপরা, কখনো সমরাঙ্গনে রণোন্মত্তা দেখি, কখনো দেখি, কাহার কোমল হস্তের কঠিন শূলাঘাতে শত্রুবক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে, কখনো উন্মাদিনীর ন্যায় কেহ আত্মঘাতিনী হইতেছেন; কিন্তু গৃহবধূর কোমলতা, নারীর ব্রীড়াসংকুচিত ভাব তাঁহাদের

প্রমীলা-চরিত্রকে নিখুঁত করিয়া সৃষ্টি করিতে মধুসূদন প্রাচীন কবিপ্রসিদ্ধির ভাণ্ডার হইতে অলংকাররাজি চয়ন করিয়াছেন। যেখানে উপকরণের অভাব ঘটিয়াছে, সেইখানে তাঁহার কল্পনার তুলিকা দিয়া প্রমীলার চিত্রখানিকে সুসম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কল্পনার স্বর্গভূমি যেন নারীরূপ ধারণ করিয়া প্রমীলার মধ্যে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রমীলা-চরিত্রের যে আদর্শ-ভূয়িষ্ঠ প্রশস্ততা তাহার কথায়, তাহার সজ্জায়, তাহার গতিভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে কেবল মেঘনাদবধ-এর নায়িকা বলিয়াই মনে করি না, তাহার নারীত্বের অন্তর্নিহিত মহিমা বিকশিত হইয়া আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে।

১০। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র তৃতীয় সর্গের কাব্যোৎকর্ষ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। কাব্যবিচারের সূক্ষ্ম নিয়মানুসারে 'মেঘনাদবধ'কে হয়তো মহাকাব্য বলা যায় না, কিন্তু ইহা যে একটি মহৎ কাব্য, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদের মনে হয়, তৃতীয় সর্গটি এই কাব্যের মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ক্ষুদ্র কাব্যে চিন্তাধারার বৈচিত্র্য বা আখ্যায়িকার বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ঘটনা-সংস্থানের সম্ভাবনা থাকে না। যেটুকু একান্ত প্রয়োজন, কেবল সেইটুকুই কাব্যসূত্রে গ্রথিত হয়। কিন্তু মহৎ কাব্যে সমগ্র জীবনই প্রতিফলিত হইয়া উঠে। জীবনপ্রবাহকে অখণ্ডভাবে দেখা বা দেখানোর মধ্যে যে একটা অসামান্য কৃতিত্ব বর্তমান, যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে অবান্তর বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যে জীবনের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কারে যে মনস্বিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে—তাহাই মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গকে কাব্যরসে সঞ্জীবিত করিয়াছে।

কাব্যের ভাব যাহাই হউক না কেন, তাহার যে একটি দেহ আছে এবং দৈহিক সৌন্দর্যও কোনো কাব্যকে চিত্তহারী করিয়া তুলিবার অন্যতম কারণ, একথা অস্বীকার করা যায় না (শ্রীঅরবিন্দের কথায়: "Only the architectural beauty can make an epic magnificent; but there must be life in that architecture which is the basis of all true Poetry".)। কাব্যের মূলীভূত রসপদার্থ আপনার প্রাণচ্ছন্দে দেহকে সৃষ্টি করে; তাই কাব্যের দেহই তাহার রসকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে।

হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ হইতে মোহিতলাল প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক বহু সমালোচক যে মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গটিকে কাব্যোৎকর্ষের দিক্ দিয়া বিচার করিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, এই সর্গের কাঠামোর মধ্যে যে বলিষ্ঠ সম্পূর্ণতা আছে, তাহা অন্য কোনো সর্গে পাওয়া যায় না। সর্বোপরি, ইহার ভাষা-গৌরব ইহার ভাব সমৃদ্ধিকে একটা স্বতন্ত্র ও দুর্লভ মর্যাদা দান করিয়াছে।

সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলেন: "তৃতীয় সর্গের পরিকল্পনায় ও বাণী-নির্মাণে মধুসূদনের কবি-হৃদয় পূর্ণভাবে সাড়া দিয়াছে। পুরুষের সুস্থ পৌরুষের মধ্যেই যে দুই বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশ দেখা যায়—তাহার যৌন স্বভাবের অনুকূল সেই বৃত্তি— একদিকে কঠোর কঠিন, দুরূহ দুর্গম, ভীষণ গম্ভীরের প্রতি আকর্ষণ, অপর দিকে মধুর কোমল, দুর্বল সুন্দরের প্রতি মোহ—এই দুইয়ের মিলিত ভাবরস এই সর্গের প্রেরণা জোগাইয়াছে; তাই কবির সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে প্রমীলা-চরিত্র এমন মৌলিক ও জীবন্ত হইয়াছে। এই সর্গে বর্ণিত বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা ও তাহার আনুষঙ্গিক বর্ণনায়

রসাভাস ঘটিবার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের শান্তি মল পায়ে ঘোড়া ছুটাইয়াছে, তাহাতে রসাভাস হইয়াছে কিনা সহসা বলা যায় না—কিন্তু এখানে যে তাহা হয় নাই—তাহা নিশ্চিত; এখানে বীররসের সহিত তাহা অতি সুন্দর মিলিয়াছে; না মিলিলে—

"মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজী-রাজী
বোলিছে ঘুজ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।"

এমন অপূর্ব বাজনা বজিয়া উঠিত না।"

তৃতীয় সর্গে বীররসের সহিত আদিরসের মিশ্রণ ঘটায় অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী ইহার মধ্যে রসাভাস ঘটিয়াছে বলিয়া কোনও কোনও প্রাচীন সমালোচক নির্দেশ করিয়াছেন। মধুসূদন শক্তিধর কবি। যিনি অবহেলায় পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়া অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছেন, তিনি যে এ রসাভাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না, এমন কথা অনুমান করা অসংগত। লঙ্কা প্রবেশকালে প্রমীলার বীরসজ্জার বর্ণনাটিতে রতিভাব প্রাধান্য লাভ করিয়া শৃঙ্গার রসে পরিণত না হইয়া সঞ্চারী রসের মতো বীররসকেই বিচিত্র রসাস্বাদে মণ্ডিত করিয়াছে। অন্য কোন কবির হাতে পড়িলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সমর্থ শিল্পী মাইকেলের হাতে ইহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। প্রমীলার চতুর্দিকে যে একটি জ্যোতির্মণ্ডল বীরত্বের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সমগ্র কাব্যটিকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র তৃতীয় সর্গে প্রমীলার বীরসজ্জা হইতে লঙ্কা-প্রবেশ পর্যন্ত প্রতিটি ছত্রে কাব্যোৎকর্ষের সুবিচিত্র ভঙ্গী দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

১১। মধুসূদনের প্রমীলা-চরিত্রটি অবলম্বনপূর্বক দেখাও যে, এ চরিত্রসৃষ্টিতে নবযুগের নব সাহিত্যের সূচনা হইয়াছে।

উত্তর। অন্তঃপুরের কুলবধূকে বহির্বিশ্বের বীরাঙ্গনারূপে চিত্রিত করিয়া মধুসূদন প্রমীলা-চরিত্রে নূতনতর প্রাণধর্ম আরোপ করিয়াছেন। নবযুগের নবসাহিত্যের অবলম্বন এই প্রাণধর্ম। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের যে সর্বাতিশায়ী কল্পনা মেঘনাদবধ কাব্যের রচনার মূলে রহিয়াছে, তাহাই এই চরিত্রটিকে বিশিষ্টরূপে মণ্ডিত করিয়াছে। মধুসূদনের কাব্যাত্মাই ইহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া ইহাকে প্রাণবান্ করিয়া তুলিয়াছে। উনবিংশ শতকের প্রথম যুগের অদ্বিতীয় প্রাণধর্মী পুরুষ ছিলেন মধুসূদন। প্রমীলার চরিত্র-পরিকল্পনার ভিতর দিয়া সেই প্রাণধর্মকে তিনি জাতির সাহিত্যে সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন।

বীর্যবতী নারী প্রমীলা, অথচ তাহার চরিত্রের কোমলতা, মৃদুতা বাঙালী গৃহস্থের কুলবধূর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। শাশুড়ীর অনুরোধকে লঙ্ঘন না করার মধ্যে রহিয়াছে একটি শান্ত স্নিগ্ধ কোমলতা। কিন্তু গৃহস্থবধূর এই সংকোচ ও স্নিগ্ধতাই প্রমীলা-চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে—এ চরিত্রের মূল কথা তো নহেই। তাহার বীরসজ্জায় লজ্জাবতী গৃহবধূকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়া সে একটি রোমান্টিক ভাববিলাসের উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদনের প্রতিভা প্রমীলার চারিদিকে নিছক প্রেমগুঞ্জনের একটা পরিবেশ রচনা করিতে চাহে নাই; তাহা বীরোচিত মর্যাদাকে বরণ করিয়া তাহাকে কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে।

প্রমীলার মধ্যে এই যে কুলবধূ ও বীরাঙ্গনার দুইটি আপাতবিরোধী মূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, "প্রমীলা বীরাঙ্গনাও নয়, লজ্জাশীলা কুলবধূও নয়—সে

মধ্যে পাওয়া যায় না। কোমলের সহিত রুদ্রের মিলন য়ুরোপীয় কল্পনার অতীত। ভারতের পৌরাণিক বীরাঙ্গনা প্রমীলা, চিত্রাঙ্গদা, ঐতিহাসিক পদ্মিনী, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি ভারত রমণীর কেহই কবির মানসীকন্যা প্রমীলার প্রকৃত আদর্শ নহেন। তাঁহারা প্রত্যেকে তিল তিল করিয়া নিজ নিজ তেজ ও সৌন্দর্য দান করিয়া থাকিলেও, এমন কি প্রমীলার নাম ও তাঁহার রসনিপুণা সখীবৃন্দ এবং তাঁহাদের রণসজ্জা কাশীরাম দাসের মহাভারত ও রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান হইতে গৃহীত হইলেও,—প্রকৃতপক্ষে যিনি পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করেন, পুরাণের সেই আদর্শ সতী—পতি যাঁহার একাধারে ভোলানাথ, শিব ও মহারুদ্রকাল ; তন্ত্রের সেই জগদ্ধাত্রী এবং করালবদনা কালী ; যিনি কাব্যে সেই 'পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' কোমলাঙ্গী গৌরী, আবার তাপসগণের, আদর্শস্থানীয়া কঠোর ব্রতপরায়ণা অপর্ণা, যিনি করুণাময়ী জগন্মাতা জীবদুঃখহরা, আবার কপালমালিনী খর্পরধারিণী শূলধরা—সেই মানবীয় কল্পনার চূড়ান্ত সৃষ্টি মহেশ্বরী সতী-ই কবির মানসীকন্যা প্রমীলার উপকরণ বা আদর্শ। কবি স্বয়ং তৃতীয় সর্গে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। এমন আদর্শ পাইয়াই প্রমীলা বঙ্গীয় কাব্যকাননের পারিজাত পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।" ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা থাকিলে এই রকম একটি চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব তাহা বুঝিতে পারিলেই মধুসূদনের কবি-প্রতিভার মহত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। [এই প্রসঙ্গে "চরিত্র সৃষ্টি" পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রমীলা-চরিত্র দ্রষ্টব্য।]

৯। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তৃতীয়-সর্গের সার্থকতা কি ?

উত্তর। কর্তব্যের আহ্বানে মেঘনাদ লঙ্কায় চলিয়া আসিবার পর পতি-বিচ্ছেদকাতরা প্রমীলার লঙ্কায় আগমন এই সর্গের বিষয়বস্তু। এই সর্গের আখ্যানভাগ মধুসূদনের কবি-কল্পনার এক উজ্জ্বলতম সৃষ্টি। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই ঘটনার অস্তিত্ব নাই, এমন কি, হোমার-প্রমুখ পাশ্চাত্য মহাকবিদের রচনাতেও এইরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইখানে মাইকেল তাঁহার পূর্বসূরীদের অনেককেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

পতিবিরহিণী প্রমীলা সংস্কৃত কাব্যের ধূলিধূসরিতা সাশ্রুনেত্রা নায়িকার মত দীনবেশে লঙ্কায় প্রবেশ করে নাই; শ্রেষ্ঠ শক্তিধর মেঘনাদের সহধর্মিণীর উপযুক্ত গৌরবে সে লঙ্কায় আসিয়াছে। রক্ষঃকুলের রাজবধূর সম্মান রক্ষা করিয়া সে বীরাঙ্গনা বেশে সখীদল-পরিবৃতা হইয়া লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। লঙ্কার অবরোধ ভেদ করিয়া পুরীমধ্যে যাইবার পূর্বে সে রামচন্দ্রের নিকট হইতে অবরোধ মুক্ত করিয়া দিবার জন্য অনুগ্রহ ভিক্ষা করে নাই, পথ ছাড়িয়া দিবার দাবী জানাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। লঙ্কায় উপনীত হইয়া সে একান্ত দীনভাবে তাহার প্রিয়তমের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে নাই ; সেখানে সে রক্ষোরাজবধূর উপযুক্ত মর্যাদায় মেঘনাদ কর্তৃক যোগ্য সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছে। এমন কি, কৈলাসাধিষ্ঠাত্রী ভগবতী উমাও প্রমীলার বীরাঙ্গনা মূর্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন।

তৃতীয় সর্গের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সমগ্র সর্গটি বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বীর-রসের মূলগত ভাব যে উৎসাহ, তাহার ব্যঞ্জনা এই সর্গের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রমীলা যখন সখীদের সহিত রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে, তখন বীরত্বের

একটা আবরণ যেন তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। হনূমানের প্রতি তাহার সদর্পভাষণ তাহাকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। দূতী নৃমুণ্ডমালিনীর উক্তিতে যে দৃঢ়তা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহা বীররসকে গাঢ়তর করিয়াছে। পরিশেষে প্রমীলা লঙ্কায় প্রবেশ করিলে যে সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহা দিগ্বিজয়-প্রত্যাগত কোনো শক্তিশালী নরপতির স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনকালীন অভ্যর্থনার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। দৃপ্ত পৌরুষ প্রতিটি কথায় ও উপমায় ঝলমল করিতেছে।

'দণ্ডক অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত' এবং তাহাদের নেতা 'ভিখারী রাঘব' এই উজ্জ্বল বীরোচিত প্রকাশের কাছে একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। প্রমীলা এবং তাহার নারীচমূ যখন বীরপদভরে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতেছে, রামচন্দ্র তখন ভীরুতার চরম দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। আর বীর লক্ষ্মণ দৈব প্রসাদের কথা বারবার স্মরণ করিয়া স্বীয় অক্ষমতাকেই যেন প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন। প্রমীলা যখন প্রকৃত বীরাঙ্গনার মতো আপনার স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছে তখন সংশয়াকুল ও শঙ্কিত রাঘবসৈন্য অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত অবরোধকে দৃঢ় করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছে; একপক্ষের বীরত্ব অন্যপক্ষের ত্রাসের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

এই ব্যতিরেক চিত্রণ মধুসূদনের অভিপ্রেত ছিল। চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তী হইয়া রামচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তিনি রাক্ষস-পক্ষের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবধকে তিনি ধর্মের নিকট অধর্মের পরাজয়-রূপ নীতির প্রতিপাদক আখ্যায়িকারূপে গ্রহণ করেন নাই; প্রবল পরাক্রান্ত এক জাতির ও অপরিমেয় শক্তির অধিকারী এক বিরাট ব্যক্তিপুরুষের পক্ষে প্রতিকূল নিয়তির বশবর্তী হইয়া ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হওয়ার মধ্যে যে নিষ্করুণ ট্রাজেডি রহিয়াছে তাহা তাঁহার অন্তরকে ভাবাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। মধুসূদনের কাব্যাত্মা এই ভাববিশেষকে অবলম্বন করিয়াই মেঘনাদবধ-কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই বিরাট্ বৈভব কিভাবে নিতান্ত সাধারণ এক বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে, কিভাবে দুর্বার নিয়তি একটি সামান্য সূত্রকে অবলম্বন করিয়া ধ্বংসকে বহন করিয়া আনিতেছে, তাহা ধাপে ধাপে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই এই কাব্যের সর্গ-বিন্যাস। এই ট্র্যাজিক কাব্যখানির ট্র্যাজেডি—মেঘনাদ, প্রমীলা বা আর কাহারও তত নহে, যত রাবণের। বিভিন্ন সর্গে এই রাবণেরই ঐশ্বর্য ও তাহাদের ধ্বংসের বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। মেঘনাদ ও প্রমীলা রাবণের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যস্বরূপ। মেঘনাদের পরিচয় যেমন প্রধানত ষষ্ঠ সর্গে, তেমনি প্রমীলার পরিচয় প্রধানত এই তৃতীয় সর্গে। অতএব মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক রাবণের অন্যতম প্রধান ঐশ্বর্য—পুত্রবধূ প্রমীলার স্বরূপ-বর্ণনের মধ্যেই এই সর্গের সার্থকতা।

স্বর্ণলঙ্কার রাজবধূ প্রমীলার আকৃতির মধ্যে যে মহিমা, তাহার বেশভূষার মধ্যে যে বলিষ্ঠতা, তাহার আচরণের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গী, তাহা যেন তাহাকে একটা স্বতন্ত্র গৌরব দান করিয়াছে। তৃতীয় সর্গ পাঠকালে আমাদের মনে হয়, যেন স্বর্ণলঙ্কার রাজশ্রী প্রমীলার মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়া, মেঘনাদকে অবলম্বন করিয়া সার্থক হইতে চাহিয়াছে। প্রমীলার বীরসজ্জায় লঙ্কায় প্রবেশ বিরহ-খিন্না নায়িকার অভিসার নহে; বিজয়লক্ষ্মী যেন স্বয়ংবরা হইয়া মেঘনাদকে মাল্যদান করিতে বাহির হইয়াছেন।

পতিগতপ্রাণা নারী। সেই একই প্রেমের দায়ে সে কখনও বীরাঙ্গনা, কখনও কুলবধূ, নতুবা তাহার আসল রূপ একই। যে সর্বাতিশায়ী নারীপ্রেম কোমলকান্ত রূপ ধারণ করিয়া গৃহকোণকে দীপ্তিদান করে, আবার প্রয়োজন হইলে বহ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া বিশ্বভুবনকে আলোকে উদ্ভাসিত করে, মধুসূদন প্রমীলা-চরিত্রের মধ্যে তাহাকেই রূপদান করিয়াছেন।” মধুসূদন নারী-প্রেমের এক কামনা-বলিষ্ঠ আদর্শকে বরণ করিয়া প্রমীলা-চরিত্রে নারীর প্রেমকে এক নূতন আদর্শে উদ্বোধিত করিয়াছেন —সেই আদর্শকেই বুঝিয়া লইতে হইবে, নতুবা এ চরিত্র-সৃষ্টির রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। প্রমীলার নারীত্বে কবি সেই প্রেমকেই একাধিপত্য দিয়াছেন যে প্রেম নারীকে দুর্জয়শক্তির অধিকারিণী করে, যে প্রেম আপনার মধ্যে আপন বাসনাকে রুদ্ধ করিয়া একটা আত্মিক আনন্দেই চরিতার্থ হয় না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমীলাচরিত্র-সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করিয়া মোহিতলাল এই চরিত্রের দ্বৈধী সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ “প্রমীলার চরিত্রে স্বাধীন-ভর্তৃকা নায়িকার সঙ্গে বাঙালী কুলবধূ এবং ভারতীয় আদর্শের শক্তিরূপা নারীর সঙ্গে অভারতীয় বীরাঙ্গনামূর্তির এই যে সমন্বয়, ইহারই প্রতিভা সে যুগের বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে যে প্রতিভা য়ুরোপীয় ভাববস্তুকে দেশীয় বিগ্রহরূপে যেমন রূপান্তরিত করিয়াছিল, এখানেও সেই কীর্তিকুশলতা লক্ষ্য করা যায়। এমনই করিয়া সে যুগের কবি-প্রতিভার এই আত্মসাৎ বা স্বীকরণ শক্তির গুণে আমাদের সাহিত্য প্রাণ পাইয়াছিল। কিন্তু প্রমীলার চরিত্র-সৃষ্টিতে মধুসূদনের দুঃসাহস বিস্ময়কর। দুই সম্পূর্ণ বিরোধী সংস্কারকে তিনি এই চরিত্রে যুক্ত করিয়াছেন—সে বিরোধ এমনই অসংশয় যে, কবির সৃষ্টিতে এইরূপ চাক্ষুষ জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছাড়া, কোনো প্রকারে, তাহাকে মন হইতে দূর করা যায় না! প্রমীলার চরিত্রে কবি আমাদের দেশের মূক দাম্পত্য-প্রেমকে যে মুখরতা দান করিয়াছেন, এবং তাহারই যে দুঃসাহস, তাহাতেই নবযুগের নবসাহিত্যের সূচনা হইয়াছে।” এক কথায়, প্রমীলা বাংলার আধুনিক কথা ও কাব্য-সাহিত্যের নারী-চরিত্রের নব নব আদর্শের উৎসস্বরূপ।

১২। ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গ অবলম্বনপূর্বক রামচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও যে, মাইকেল তাঁহাকে দুর্বল ও কাপুরুষ করিয়া আঁকিয়াছেন।

উত্তর। বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে রামচন্দ্র দেবতা নহেন ; কিন্তু তিনি লোকোত্তর পুরুষ। তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব মানবত্বকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হইয়াও কুসুমাদপি কোমল, বিনয়ের অবতার! মধুসূদন রামচন্দ্রকে মানবরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে অতিমানবীয়তার আরোপ করেন নাই—ইচ্ছা করিয়াই করেন নাই। বরং, কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাববিহ্বল রামচন্দ্রের পরিকল্পনা অনুসারে রামচরিত্রে একটা বৈষ্ণবীয় দৈন্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহা আর যাই করুক রাম-চরিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করে নাই।

রামচন্দ্র স্নেহবিহ্বল। অনুজ লক্ষ্মণের জন্য তাঁহার কাতরতার অন্ত নাই ; চিত্ররথ প্রেরিত দিব্য অস্ত্র দেখিয়া তিনি বলিতেছেন ;

"বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহুবলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে !
কেমনে, লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে ?"

ইহা কি রামচরিত্রের উপযুক্ত উক্তি ? এ কোমলতা কি দুর্বলতার পরিচায়ক নহে ?

প্রমীলার দূতী নৃমুণ্ডমালিনী আসিয়া যখন তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে কিংবা যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিল, তখন রামচন্দ্র যে উক্তি করিয়াছেন, "বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে", তাহাকে শিষ্টতার পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু দেখি যে, ইহার পরেই তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া বলিতেছেন :

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি !"

ইহা কি কেবল ব্যঙ্গমিশ্রিত উক্তি ? ইহার মধ্যে কি রাঘব-চরিত্রের ভীরুতা প্রকাশ পায় না ? আবার, বীরাঙ্গনাবেশে সজ্জিতা প্রমীলাকে দেখিয়া রামচন্দ্র যে কথা বলিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার দুর্বলতাকে স্পষ্টতর করিয়া দিয়াছে :

"সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;
কে রাখে এ মৃগপালে ?"

কোনো প্রকৃত বীর তাঁহার সৈন্যদল সম্বন্ধে এই রকম উক্তি করিতে পারেন কি ?

প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন রামচন্দ্রকে এইরূপ ভীরু, কাপুরুষ করিয়াই আঁকিয়াছেন, কোমলতাই এই চরিত্রের মূলধর্ম। তিনি অতিমাত্রায় স্নেহ ও ভাবপ্রবণ। কারণে অকারণে তিনি কাঁদিয়াই অস্থির। ইন্দ্রজিৎ বা প্রমীলার শক্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বক্ষ আশঙ্কায় কাঁদিয়া উঠে। রামচরিত্রে মহত্ত্ব আরোপ করা মধুসূদনের অভিপ্রেত ছিল না অথবা রাবণ-চরিত্র আঁকিতে গিয়া তাঁহার উদ্দাম কল্পনাশক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া এইরূপ ঘটিয়াছিল !

ইহার আরও একটি কারণ আছে। রামচন্দ্রের বানরসৈন্যই কবির অবজ্ঞার কারণ। সামান্য বানরের হাতে মহিমময় রাক্ষস-বাহিনীর পরাজয় মধুসূদন সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন : "The subject is really heroic ; only the monkeys spoil the joke...if the father of our poetry had given Rama human companions, I could have made a regular Iliad of the death of Meghnada."—মধুসূদন আর একস্থানে লিখিয়াছেন : "I despise Rama and his rabble"—ইহাতে অনেকেই মনে করেন এই বিধর্মী কবির রামের প্রতি একটা মজ্জাগত বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু ডাঃ সুকুমার সেনের ন্যায় আমরাও মনে করি এরূপ ধারণা ভ্রান্ত, এবং ডাঃ সুকুমার সেন এই লাইনটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—I despise Rama because of his rabble—ইহা বড়ই সমীচীন হইয়াছে। তবে যতই হোক্ কবির এই উক্তি তাঁহার একদেশদর্শী মনোভাবকেই সমর্থন করে। কিন্তু যে মধুসূদন লিখিলেন :

"হায়, দেবি, দেবে কি মানবে
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি।"

Ravan elevates and kindles my imagination,—এইখানেই আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই, মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণই হইল পরিকল্পনার মূল উৎস।

রাবণ এই কাব্যের মূল উৎস বা মূল লক্ষ্য বলিয়াই কাব্যখানি এতখানি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। নচেৎ মেঘনাদ-কাহিনীকে কবি যে বিস্তৃতি দান করিয়াছেন, উহাই উহার চরম। কিন্তু তাহাতে আর কাব্য-কলেবরের কতটুকু অধিকৃত হইয়াছে? রাবণকে লইয়াই কাব্য। রাবণকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার প্রথম হইতে নবম-সর্গ। রাবণের আশে-পাশে যেমন বীরবাহু, চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরী, প্রমীলা, সীতা-সরমা ও রাম-লক্ষ্মণাদি, তেমনি মেঘনাদও একজন। তবে জ্যোতিষ্ক-রাজ রাবণের সাজানো আকাশে মেঘনাদ এমনই একটা জ্যোতিষ্ক, যাহা রাবণরূপ পূর্ণের অংশমাত্র হইয়াও পূর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে দর্শকের নয়ন-মন আকর্ষণ করে। কিন্তু নায়কত্বের বিচার করিতে বসিয়া কেবলমাত্র দীপ্তি ও গভীরতা, অথবা কবির আদর্শ দেখিলে হইবে না,—ব্যাপ্তি এবং বিস্তারও দেখিতে হইবে; আর দেখিতে হইবে কবি-কল্পনার,—কবির আদর্শের নহে,—মূল আশ্রয়। মেঘনাদের মৃত্যুর পরেও আমরা কবির লেখনী চালনার পথ চাহিয়া থাকি; কারণ, মেঘনাদ গিয়াছে কিন্তু রাবণ আছে। মেঘনাদ এমনই সম্পূর্ণ এবং এমনই নির্দোষ যে, তাহার মৃত্যু যেন তাহারই জয়জয়কার। এই পূর্ণ ও নির্দোষ চরিত্র মধুসূদনের কাব্যৈশ্বর্য হইলেও কাব্যের মূলাধার নহে; কারণ তাহা হইলে, মেঘনাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কাব্য শেষ হইয়া যাইত—আর সেক্ষেত্রে কাব্যের চেহারাও হইত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কবির অভিপ্রেত নহে। কবির যে অভিপ্রায় অনুযায়ী কাব্যখানি পরিকল্পিত ও রূপায়িত হইয়াছে, তাহার সন্ধান মিলিবে রাবণের পরিকল্পনায়। মেঘনাদের মৃত্যুর পরও আমরা আরও কিছুর আশায় পথ চাহিয়া থাকি, কিন্তু রাবণের মুখে 'ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে' ইত্যাদি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শুশ্রূষা ও জিজ্ঞাসাও মুদিত হইয়া আসে, কাব্যেও নামিয়া আসে ঈপ্সিত উপসংহার—কারণ মূল পরিকল্পনার এইখানেই পরিপূর্ণতা। আমরা বুঝি, নির্দোষ অতিমানবতুল্য মেঘনাদ নহে, দোষেগুণে মানুষ রাবণই কবির প্রধান লক্ষ্য। এই রাবণের বিলাপেই কাব্যের শুরু ও তাহারই হাহাকারে কাব্যের শেষ অঙ্কিত করিয়া কবি পার্থিব মানবের চিরন্তন ট্রাজেডিকে এক অমর কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। তাই কবির মূল প্রয়োজন-সিদ্ধির কথা চিন্তা করিয়া রাবণকেই কাব্যের নায়ক বলিতে হয়। এই প্রসঙ্গে মোহিতলালের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

"মেঘনাদ কবির কামনাগত আদর্শ, সে চরিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর, নির্দোষ; তাহার কল্পনায় কোন বাধা নাই, কবি-কামনার মোক্ষধামে তাহার অবস্থিতি। কিন্তু বাস্তব বিধি-নিয়তির সংঘাতে এ স্বপ্ন টিকিবে না—জীবনে তাহা সফল হইবার নয়, এ কল্পনার সঙ্গে এই দুঃখ—সেই নিষ্ফলতার হাহাকার ও নৈরাশ্যের অন্ধকারই—রোমান্টিক কাব্য-পিপাসার পক্ষে বড় মধুর, বড় উপাদেয়। মেঘনাদবধ কাব্যে এই দুঃখের হেতু হইয়াছে মেঘনাদ—মেঘনাদই কবির সেই আশুবিধ্বংসী দুরূহ কামনার মানস-বিগ্রহ। কিন্তু মেঘনাদ তো সেই দুঃখের বিষয়, তাহার আশ্রয় হইবে কে? ভিতরে কবির নিজের প্রাণই সেই আশ্রয়—বাহিরে রাবণ তাহার প্রতিকৃতি। এইজন্য মেঘনাদ এ কাব্যের সর্বস্ব হইতে পারে নাই, কবির এই আত্মভাব প্রতিষ্ঠার জন্য রাবণের বিশাল-ছায়া মেঘনাদকে আবৃত ও

অতিক্রম করিয়া আছে। এই রোমাণ্টিক লিরিক আবেগ মেঘনাদবধ কাব্যের এপিক অভিপ্রায়কে দ্বিধাযুক্ত করিয়াছে, এবং মেঘনাদকে নায়ক করিতে গিয়াও, কবির স্বকীয় প্রাণের আকুতি তাহাকে শাস্তি ভোগ না করাইয়া, রাবণকে করাইয়াছে,—doing ও suffering-এর যত কিছুর ভার রাবণই বহন করিতেছে। এই রহস্যই এ কাব্যের সবচেয়ে বড় রহস্য। *** সজ্ঞানে কবি মেঘনাদকেই নায়ক করিয়াছেন বটে, কিন্তু নির্জ্ঞানে রাবণই তাঁহার সমগ্র কল্পনাকে অধিকার করিয়া তাহার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতেছে। *** কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারে এবং আরও কতকগুলি কারণে, মেঘনাদও নায়কত্বের দাবি করিলেও গভীরতর অর্থে এ কাব্যে নায়ক রাবণ।"

১৪। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' লক্ষ্মণ-চরিত্রে কবি-মনোভাবের যে ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত রসগ্রাহী বিশ্লেষণ দাও।

[ইহার পূর্ণাঙ্গ উত্তরের জন্য **"চরিত্র-সৃষ্টি"** নিবন্ধে 'লক্ষ্মণ'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।]

১৫। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাবণ-চরিত্রটি অবলম্বনপূর্বক মধুসূদনের কবি-কল্পনা ও কবি-মানস সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও রসগ্রাহী বিশ্লেষণ দাও।

(**"চরিত্র-সৃষ্টি"** নিবন্ধের 'রাবণ'-প্রসঙ্গে ইহার পূর্ণাঙ্গ উত্তর মিলিবে।)

১৬। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সীতা-সরমার কথোপকথনের ভিতর দিয়া কবি বিশেষভাবে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন কাব্যবিচারে তাহার সার্থকতা কোথায়?

উত্তর। মহাকাব্যের প্রধান গুণ বিস্তৃতি। মধুসূদন রামায়ণের যে অংশের কাহিনী হইতে তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ঘটনার স্বল্পতা এই বিস্তৃতির পক্ষে অন্তরায়, ইহা বুঝিতে পারিয়াই তাঁহাকে অনন্যোপায় হইয়া এই সর্গটির পরিকল্পনা করিতে হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কবি-কল্পনার উদার বিস্তৃতি পরিস্ফুট হইবার দ্বিতীয় কোনো উপায় ছিল না। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এই সর্গটির বিষয়বস্তু সীতা-সরমার কথোপকথন মাত্র নহে, বর্তমানকাল হইতে কবি কিছুক্ষণের জন্য অতীতকালে চলিয়া গিয়াছেন। কাব্যের কাহিনীকে সুসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য অতীতের সীতা-হরণের ঘটনার উল্লেখ অপরিহার্য। ইহাতে একদিকে কাব্যে বিস্তৃতি আসিয়াছে, অন্যদিকে রাম-সীতার দণ্ডকারণ্যের গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতা সমস্ত কাব্যখানিকে এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, সমগ্র কাব্যের মধ্যে যে জিনিষটি বাঙালী পাঠকের নিকট সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা গার্হস্থ্য জীবনের এই সহজ পবিত্রতা। এই পবিত্রতার অনুভূতি ও প্রেরণা কবি বিদেশী কোনো কাব্য হইতে সংগ্রহ করেন নাই—ইহা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন ভারতীয় নারীত্বের ঐতিহ্য হইতে। সীতা-সরমার কথোপকথন বাল্মীকির রামায়ণেও পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা উল্লেখ মাত্র। যদিও ভবভূতির উত্তর-রামচরিত হইতে মধুসূদন এই সর্গের বিষয়বস্তুর কিছু উপকরণ পাইয়াছেন, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে চতুর্থ সর্গের সমগ্র কাহিনীটি হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণে অত্যন্ত গাঢ়বদ্ধ ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

সর্গমুখে প্রথমেই ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য গ্রহণে লঙ্কাপুরীর আনন্দ-উৎসবের বর্ণনা। উৎসব-মুখর সেই পুরীর একান্তে অশোককাননে একাকী বসিয়া শোকাকুলা সীতা মনোবেদনায় অশ্রুবর্ষণ

সেই মধুসূদনই রামচরিত্রকে লঘু করিয়া নিজের এই উক্তিরই বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। প্রাক্তনের গতিতে কবির বিশ্বাস আছে, অথচ সেই প্রাক্তন কিভাবে তাহার কার্য করে তাহা যদি কবি একটুও বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তিনি রামচন্দ্রকে এমন মেরুদণ্ডহীন করিয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র ভীরুতা, নম্রতা ও কোমলতার প্রতীক করিয়া কখনই আঁকিতেন না। রাবণের প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র হিসাবেও রামের চরিত্রে অন্ততঃ কিছু শৌর্য-বীর্যের আরোপ করা উচিত ছিল।

১৩। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রকৃত নায়ক কে? রাবণ না ইন্দ্রজিৎ?

উত্তর। যদিও কাব্যখানির নাম "মেঘনাদবধ", এবং মেঘনাদের বধ-কাহিনী ইহার কেন্দ্রীয় ও প্রধান ঘটনা, আর সেই কারণেই ইহার নায়কত্বের আসনে সাধারণ পাঠকের পক্ষে মেঘনাদকে বসানোই একান্ত স্বাভাবিক, তথাপি সাম্প্রতিক সমালোচনায় কাব্যখানির এক নায়ক-সমস্যা বিচার্য বিষয় হইয়াছে। প্রথমেই মন্তব্য করা যাইতে পারে যে, এই সমস্যা এমন কিছু মারাত্মক নহে যে, ইহার সমাধান না হইলে কাব্যের রসাস্বাদন বা কাব্যোপলব্ধি ব্যাহত হইতে বাধ্য। তবে ইহার আলোচনায় ঐ আস্বাদন ও উপলব্ধি উভয়েরই উৎকর্ষ আশা করা যায়।

এই নায়কত্বের আসন লইয়া যে দুইজনকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খাড়া করা হইয়াছে তাঁহারা হইলেন, পিতা-পুত্র,—রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ। এই পিতা-পুত্রের মধ্যে যেমন কোন দ্বন্দ্বের লেশ মাত্র নাই,—বরং তাঁহাদের সম্পর্ক হইল—বৃন্ত ও পুষ্পের, আধার ও আধেয়ের সম্পর্ক, তেমনি এই নায়কত্বের প্রশ্নও পিতা ও পুত্র পরস্পরকে দূরে না ঠেলিয়া বরং আরও ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গিসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ যদি নায়ক হ'ন তবে রাবণের আশ্রয় তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য, আর রাবণ যদি নায়ক হ'ন তবে তাঁহাকেও প্রধান ঐশ্বর্যরূপ ইন্দ্রজিতের গর্বকে বাদ দেওয়ার উপায় নাই।

প্রথমে দেখা যাউক মেঘনাদকে নায়ক বলিবার পক্ষে কি কি যুক্তি থাকিতে পারে। আলংকারিক সূত্র অনুসারে যে সকল গুণ নায়কের থাকা দরকার, সে সমস্তই মেঘনাদ চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সর্বপ্রকার সজাগ অনুভূতির সুষমতা, কর্তব্যের ঔচিত্য, আচরণের সৌষ্ঠব, পবিত্র গার্হস্থ্য জীবনের বিচিত্র আদর্শের সামঞ্জস্য ও সর্বোপরি এক মহান্ বীরত্ব তাঁহাকে যে কেবল পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের অধিকারী করিয়াছে, তাহা নহে,—মেঘনাদ এই কাব্যে এক লোকোত্তর মহিমায় মহিমান্বিত মহাপুরুষ। ইহা ছাড়া, এই মেঘনাদই মধুসূদনের মানস-পুরুষ, এই কাব্যের শ্রেষ্ঠচরিত্র—কাব্য-মণিমালার মধ্যমণি। কবি এই চরিত্রটির মধ্যে আপন অন্তরের শ্রেষ্ঠ আদর্শরাজির এক সুসমঞ্জস রূপায়ণ ঘটাইয়া তাহাতেই প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। মধুসূদনের অতৃপ্ত ব্যক্তিমানস এই চরিত্রাঙ্কনের সাধনায় তৃপ্তিলাভ করিতে চাহিয়াছে। ইহাতে কেবল কবি যাহা ছিলেন তাহাই নহে, যাহা হইতে চাহিতেন অথচ হইতে পারেন নাই, এমন সমস্ত বস্তুর বলিষ্ঠ ইঙ্গিত প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রজিতের সহিত এই কাব্যে পরিচয়মাত্রই আমরা ইহাকে আত্মপ্রত্যয়ী ও পৌরুষদর্পী মধুসূদনের মনের মানুষ বলিয়া চিনিয়া লইতে পারি। যে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যমণ্ডিত গৌরবময় জীবন কবির নিজের ভাগ্যে ঘটে নাই, এই ইন্দ্রজিতের মধ্যে তাহাই অঙ্কিত করিয়া কবি যেন আপনাকে আপনি প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিয়াছেন। তাই এই চরিত্রটির প্রতি কবির অপরিসীম দরদ, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, নিবিড় অন্তরের আকর্ষণ। ইন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া

তিনি বলিয়াছেন: He (the glorious son of Ravana) was a noble fellow, and but for the scoundrel Bibhisan would have kicked the Monkey army into the sea." এ হেন ইন্দ্রজিতের মৃত্যু যে কবির অন্তরকে বহুকাল ধরিয়া তোলপাড় করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? রাবণের পুত্র তাঁহার নিকট কেবল 'ইন্দ্রজিৎ' নহে, 'my favourite Indrajit'; তাঁহার কল্পলোকের বধ-কাহিনী রচনার কথা অপরকে জানাইবার সময় কবির উৎসাহ-উদ্দীপনা, মানসিক উত্তেজনা ও বিরাট আয়োজনের ইঙ্গিত সেই কথাতেই নিঃশেষে জানা যায়, "I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit."

স্থতরাং কাব্যে যেটি শ্রেষ্ঠ-চরিত্র, আর কবিরও যে অন্তরতম তাহাকেই নায়ক বলিতে হয়, কারণ, ইহা ছাড়া আর কোন পরিচয় ইহার মর্যাদার অনুরূপ হইতে পারে না।

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্ঠ-চরিত্র মেঘনাদ হইলেও রাবণই উহার মূল আশ্রয়। নায়কত্বের বিচারে এখানেই সমস্যা দেখা দিয়াছে। যে অল্পকালের জন্য উদিত হইয়া আপন মহিমার ভাস্বর বর্ণচ্ছটায় সকলের চোখ ধাঁধাঁইয়া দিল, সেই নায়ক, না যাহার কর্মনীতি বা সুখদুঃখময় বিশাল জীবন ঐ চোখ-ধাঁধানো চরিত্রটিকে আপন ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সমগ্র কাব্যখানির ভিত্তিরূপে অবস্থান করিতেছে, সেই নায়ক? তাহা ছাড়া কাব্যের মূল প্রেরণা কে জাগাইয়াছে? অবশ্যই মেঘনাদ নহে, রাবণ। তাই নয়টি সর্গে বিস্তারিত কাব্যখানির মাত্র তিনটিতে মেঘনাদ স্থান পাইয়াছে, আর রাবণ ইহার সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত,—রাবণেই ইহার আরম্ভ, আর রাবণেই ইহার পরিসমাপ্তি। এই মূলপ্রেরণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে মূল্যবান্ মন্তব্য অন্যত্র ["চরিত্র-সৃষ্টি"—নিবন্ধে 'রাবণ-প্রসঙ্গ'] উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে যে অটল শক্তির ভয়ংকর সর্বনাশের কথা পাওয়া যায়, সেই অটল শক্তিই রাবণ; মেঘনাদবধে ইহারই বন্দনা গীত হইয়াছে, এবং রাবণ-ই এই কাব্যের মূল লক্ষ্য, মেঘনাদ নহে;—মেঘনাদ ঐ লক্ষ্যকে লক্ষণীয় করিবার জন্য পাঠকের দৃষ্টিপথে প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে মাত্র।

এখন দেখিতে হইবে, রাবণ এই কাব্যের মূল লক্ষ্য বা মূল প্রেরণার উৎস কিসে? মেঘনাদ মধুসূদনের আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু কবির প্রকৃত স্বরূপ মেঘনাদ নহে রাবণ। রাবণের পৌরুষ ও শক্তি-লীলা, রাবণের অনন্ত সম্ভাবনাময় জীবন, এবং নিয়তি-নির্যাতনে এই শক্তি-সম্ভাবনার শোচনীয় পরিণামের মধ্যে কবি যেন আপন জীবনকেই প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। আত্মসচেতন কবি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে এক অনন্ত সম্ভাবনা, তাই তিনি বন্ধুদের নিকট কি হইবেন বা কি করিবেন ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ব হইতেই আভাস দিতেন—এবং শক্তিমানের ধর্ম অনুসারে নিজের সু-উচ্চ আশা ও সংকল্পরাজি বেশ নিরাবরণভাবেই প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আমরা জানি বহিঃশক্তির নিষ্ঠুর প্রতিকূলতায় তাঁহাকে ব্যর্থতার অভিশাপে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে হইয়াছে। এই যে তাঁহার আশাভঙ্গের tragedy, যাহা কেবল তাঁহার একার নহে, বিশ্বের ব্যথাহত, নিয়তি-পীড়িত মানুষ মাত্রেরই tragedy,—কবির ধারণা, রাবণের মধ্যে তাহার এক করুণ অথচ মহিমময়ী মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাবণ যেন সকলের হইয়া, বিশেষ করিয়া, কবির হইয়া, মানুষের এক চিরন্তন হাহাকারকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। তাই, কবির দৃষ্টিতে রাবণ was a grand fellow এবং the idea of

করিতেছেন। এমন সময়ে সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া বিভীষণের পত্নী সরমা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিলেন। তাহার পর সরমা সীতার ললাটে এয়োতিচিহ্ন সিন্দুরের ফোঁটা আঁকিয়া দিলেন। সীতার বরাঙ্গে একখানিও অলংকার নাই দেখিয়া সরমা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, রাবণ এমনি নিষ্ঠুর যে, অমন সোনার অঙ্গ হইতে সে সমস্ত আভরণ খুলিয়া লইয়াছে। ইহা শুনিয়া সীতা সরমাকে বলিলেন, রাবণের কোন দোষ নাই, সে যখন আমাকে হরণ করিয়া লইয়া আসে তখন আমি নিজেই আমার অলংকারগুলি খুলিয়া পথে ফেলিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, আমার স্বামী পথে এই সব অলংকার দেখিয়া আমার সন্ধান করিতে পারিবেন। আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, ঐ অলংকার দেখিয়াই অনুসন্ধান করিতে করিতে আমার স্বামী আজ লঙ্কাপুরীতে সমাগত।

এই কথা শুনিয়া সরমার কৌতূহল জাগিল—তিনি জানিতে চাহিলেন, রাবণ কেমন করিয়া সীতা হরণ করিলেন। তখন সরমার অনুরোধে সীতা সেই কাহিনী-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই কাহিনী-সংযোজনের উপযোগিতা সম্পর্কে স্বয়ং কবিও চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। আপাত-দৃষ্টিতে যে ইহাকে নিছক বাহুল্য মনে হইতে পারে, তাহা কবিরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "Perhaps the episode of Sita's abduction (Fourth Book) should not have been admitted, since it is scarcely connected with the progress of the Fable". কিন্তু তবুও যে তিনি ছাটিয়া ফেলেন নাই, তাহার কারণ সমস্তই আমাদের ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে। তিনি শুধু ঐ মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই নিঃশ্বাসে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "But would you willingly part with it ?" অনেক না-বলা কথাই এই প্রশ্নটির মধ্যে বিধৃত। আরও জানাইয়াছেন, "Many here look upon that Book as the best among the five," বেশ বুঝা যায়, চতুর্থ সর্গের এই সীতা-সরমা-কাহিনী কবির একটা দরদ-ঢালা সৃষ্টি। যে ভাবে ইহার উপক্রমণিকা রচিত হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে হয়, কবিমানস এইখানে চাহিয়াছিল কিঞ্চিৎ বিশ্রামের শান্তি, চাহিয়াছিল সমর-বিধ্বস্ত লঙ্কার উত্তপ্ত আবহাওয়ায় যাহাতে উহা কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে পারে তজ্জন্য শক্তি, সঞ্চয়ের উপকরণহিসাবে অপেক্ষাকৃত শান্ত বিষয়ান্তরে আত্মবিনোদন। কিন্তু তাহাকে তো একান্ত অসংলগ্ন হইলে চলিবে না; তাই কাব্যের মূল ঘটনার লীলাভূমি লঙ্কাপুরীর মধ্যেই এবং কাব্যের নায়ক যে রাবণ তাহারই সাম্প্রতিক কার্যাবলীর মধ্যে দৃষ্টি চালাইতেই কবির মানসপটে ভাসিয়া উঠিল লঙ্কার অশোক-কানন, যাহার প্রতিটি পত্রগুল্ম জানকীর শোকে ঘন মলিন। কাঁদিয়া উঠিল কবি-হৃদয় জানকীর দুঃখে, দুলিয়া উঠিল কবি-চিত্ত সেই সুখে-দুঃখে আন্দোলিত কাহিনী রচনার আবেগে। তাই এমন আবেগভরা রচনাকে বাড়তি মনে হইলেও কবির পক্ষে বর্জন করা সম্ভব হয় নাই। কাব্য-বিচারে কবির হৃদয়াবেগের যদি কোনো স্থান থাকে তবে এই আনুষঙ্গিক আবেগেরও সার্থকতা সহৃদয়-হৃদয় মাত্রেই স্বীকৃত হইবে।

তাহা ছাড়া কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনী-বিন্যাস এখানে এমন নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা সহজেই পাঠক-চিত্তকে অভিভূত করে। কাব্যের মূল কাহিনী হইতে যদিও ইহা একটি সাময়িক Distraction বা পশ্চাদপসরণ, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, রসোত্তীর্ণ এই কথোপকথন কাব্যে এক ঘনীভূত আবেদনের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার মধ্যে কবি আবার একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্তের

সন্নিবেশ করিয়া সমগ্র সর্গটিকে আরও চিত্তস্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছেন। সীতা হরণের ফলে কি ঘটিতে পারে, কৌশলে কবি এই স্বপ্নের ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিয়া কাব্যখানিকে অধিকতর রসসমৃদ্ধ করিয়াছেন। বিদেশী কাব্যের অনুকরণে পরিকল্পিত হইলেও, কবির বর্ণনাগুণে এই স্বপ্নচিত্র মূল কাব্যের প্রাণধর্মের সহিত একাত্মভাবেই মিলিয়া গিয়াছে। এইভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, সীতা-সরমার কথোপকথনকে অবলম্বনপূর্বক কবি তাঁহার সমগ্র কাব্যখানিকে এক অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন এবং কাব্য-বিচারে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই সর্গটি না থাকিলে, কাব্য অসম্পূর্ণ তো থাকিতই, এমনকি ইহার প্রাণধর্ম পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইত। কাব্যের কাঠামোকে ঋজুভাবে ধরিয়া রাখিবার পক্ষেও এই সর্গটির প্রয়োজনীয়তা ছিল।

[১৮ নং প্রশ্নের উত্তরও এইপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য]

১৭। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গটি অবলম্বনপূর্বক সীতা ও সরমার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। দুঃখ ও অশ্রুর উপাদানে সীতা-মূর্তির কল্পনা। সীতা জন্ম-দুঃখিনী। ভাগ্যবিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহাকে বিবাহের অল্পদিন পরেই স্বামীর সহিত বনগমন করিতে হয়। শ্বাপদ-সংকুল বনে অশেষ কষ্টের মধ্যেও তিনি যখন প্রেমের স্বর্গ রচনা করিয়া বাস করিতেছিলেন, অমনি দুরাচারী রাবণ আসিয়া তাঁহাকে শ্যেনের মত হরণ করিয়া লইয়া গেল। অপহৃতা রাজবধূ বন্দিনীরূপে দিনে দিনে পলে পলে কত যন্ত্রণাই যে সহ্য করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ভাগ্যবিপর্যয়ের দুরন্ত আঘাতে রামায়ণের কবি এই রমণীর কোমল হৃদয়খানিকে দলিত মথিত রূপে আঁকিয়াছেন। এই আঘাত-পরম্পরার একটিমাত্র আঘাতকে দেখাইয়া মেঘনাদবধ কাব্যের কবি সীতার অশ্রুময়ী মূর্তি গড়িয়াছেন। সে আঘাত রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণের আঘাত। অপহৃতা হইয়া সীতা পতিবিরহে, আত্মাবমাননায়, আপনার নির্বুদ্ধিতার ভাবনায় যতকাল লঙ্কার অশোকবনে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন, ততকাল নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাল কাটাইয়াছেন।

অশ্রুময়ী হইলেও সীতাচরিত্র বীরত্বে মণ্ডিত। প্রমীলা চরিত্রের তীব্র তেজ তাঁহাতে ছিল না বটে, কিন্তু বিপন্ন হইয়া তিনিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন নাই। দুর্ধর্ষ রাবণ তাঁহাকে বলপূর্বক রথে তুলিয়া লইলে তিনি ভয়ে মূর্চ্ছিতা হন নাই। প্রবল রাবণকে তাহার পাপকার্যের জঘন্যতা বুঝাইয়া তাহাকে সেরূপ কর্ম হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। যখন দেখিলেন দুর্মতি রাবণ তাহা শুনিল না, তখন উচ্চৈঃস্বরে আপনার বিপদবার্তা ঘোষণা করিতে থাকেন। তাহাতেও যখন কোন ফল ফলিল না, তখন পরে যাহাতে তাঁহার স্বামী ও দেবর তাঁহার সন্ধান পান এই উদ্দেশ্যে অঙ্গের অলংকার উন্মোচনপূর্বক একে একে যাত্রার পথে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন।

স্বামীর প্রেমে সীতা ছিলেন একেবারে আত্মহারা। স্বামীর জন্য ইনি সুখের সকল উপকরণ ত্যাগ করিতেও এতটুকু কাতর হন নাই। রামচন্দ্র যখন সব ছাড়িয়া জটা ও চীর ধারণ করিয়া বনগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, সীতা তখন রাজ-অন্তঃপুরের সকল সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া ছায়ার মত স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। বনবাসের ক্লেশের কথা বুঝাইয়া স্বামী কত নিষেধ করিলেন,

গুরুজনেরা নিষেধ করিলেন—কোন কথায় সীতা কর্ণপাত করিলেন না। বিবাহসভায় সুখে-দুঃখে যাঁহাকে তিনি জীবনের অবলম্বন করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই তিনি হাসিমুখে ভবিষ্যতের অন্ধকার রাজ্যে পদক্ষেপ করিলেন।

তাহার পর বনরাজ্যে আসিয়া প্রেমের অমৃতবর্তিকা জ্বালাইয়া তিনি সেই ভয়াল স্থানটিকেও সুখের অমরাবতী করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে সহস্র সুখের উপকরণের মধ্যে যে তৃপ্তি লাভ করা যায় না, তিনি বনের মধ্যে তাহার অপেক্ষাও অধিক সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিনযাপন করিতেছিলেন। রাবণ আসিয়া শেষে তাঁহার সেই সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া দিল। সীতার জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা শোকাবহ ঘটনা। মধুসূদন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্থ সর্গে সীতার মুখে ইহার যে অশ্রুসজল বিবরণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে সীতা-চরিত্রের এমন একটি রূপ আমাদের চক্ষে পড়ে, যাহা সহজেই সহানুভূতির উদ্রেক করে।

সীতা-চরিত্রের আর একটি দিক্ আছে। তিনি কোমলতা ও করুণার মূর্তি। রাবণের পুরীতে বন্দিনী থাকিয়া বীরশূন্য লঙ্কার চারিদিকে রাক্ষসদের হাহাকার-ধ্বনি সীতাকে বিচলিত করিয়াছে। রাক্ষস-নারীদের বিলাপে তিনি বিচলিত হইয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, শত্রুপুরীর সেই দুঃখ দেখিয়া সীতা কাতরকণ্ঠে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। পরদুঃখে তিনি আপনার দুঃখের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অশ্রুময়ীর এই কোমলতা সীতা-চরিত্রের একটি প্রকাণ্ড বৈশিষ্ট্য, ইহাই তাঁহার নারীচরিত্রকে দেবত্ব-মণ্ডিত করিয়াছে।

লঙ্কাপুরীতে দুঃখময় বন্দিনী-জীবন যাপন করিবার কালে তিনি একটি রত্নলাভ করেন,—সেটি সরমা। সরমা বিভীষণ-পত্নী। সীতা যখন একাকিনী থাকিতেন, তখনই ইনি সীতার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। ইঁহার সহমর্মিতায় ও মিষ্ট সাহচর্যে সীতা আপনার লঙ্কাবাস-দুঃখকে অনেকাংশে সহনীয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহার কাছে সীতা আপনার মনের কপাট একেবারে খুলিয়া দিতেন। সরমাকে সীতা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন।

অতি উজ্জ্বল বর্ণনায় কবি অতি অল্প পরিসরের মধ্যেই এই সরমা মূর্তিটিকে চমৎকার করিয়া আঁকিয়াছেন। সরমা শোভাময়ী, পরদুঃখকাতরা, পতিপ্রাণা। সীতার ইনি একান্ত ভক্ত। প্রমীলার ন্যায় এই সরমাও মধুসূদনের মানস-দুহিতা। সরমার এমন মমতাময়ী মূর্তি আমরা রামায়ণেও পাই না। রাক্ষসপুরীতে সীতার ন্যায় সরমারও শান্তি ছিল না। সীতারও যেমন কোন বান্ধবী সেখানে ছিল না; সরমাও তেমনি সেই পুরীতে নির্বান্ধব অবস্থায় ছিলেন। যাঁহার স্বামী আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছেন, তিনি তো সকলের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্রী হইবেনই। পদে পদে স্বামী-নিন্দাও তাঁহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইত। সীতা ও সরমা উভয়ের এই ভাগ্যের সমতাই পরস্পরকে পরস্পরের নিকট কাছে টানিয়া আনিয়াছিল।

পতির অঙ্গে রাবণের পদাঘাতের বেদনা সরমা নীরবে আপনার অঙ্গে বহন করিতেন; এবং স্বামীর স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করার কাজটি মনে-প্রাণে সমর্থন করিতেন। তাহার পর প্রতিদিনের লঙ্কা-ধ্বংসের ব্যাপার হইতে তাঁহার মনে দৃঢ় একটা প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, রাম জয়ী হইবেনই এবং সীতার মনোবেদনার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও মর্মবেদনার সমাপ্তি ঘটিবে। এই

বিশ্বাসের বলেই তিনি নিঃশব্দে শক্রভাবাপন্ন স্বপক্ষীয়গণের ভিতরে বেদনার বেড়াজালের মধ্যে অপূর্ব ধৈর্যসহকারে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়া চলিতেন। সরমা যেন সহিষ্ণুতার মূর্তি। এই সহিষ্ণুতাই সরমা-চরিত্রে একটা অনুপম মাধুর্যের আরোপ করিয়াছে। দুঃখদগ্ধ সীতার কাছে সরমার সাহচর্য তাই এত সুন্দর মনে হইত।

সমবেদনার ও সমমর্মিতার মধুর রসে সরমার হৃদয়খানি সর্বদাই অভিসিঞ্চিত হইয়া থাকিত। সীতার জীবনের দুঃখবেদনায় তাঁহার বুকখানি ফাটিয়া যাইত। তাই যখনি তিনি দেখিতেন সীতা একাকিনী আছেন অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পাদমূলে বসিয়া মিষ্ট আলাপে তাঁহার বেদনার কতকটা লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেন। সীতার জীবনের প্রতি কথাটি তিনি ভাল করিয়া জানিতে চাহিতেন; কারণ এই সীতাকে তিনি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন। ধৈর্যময়ী, মিষ্টভাষিণী সরমা স্নিগ্ধ বাক্যের চন্দন-লেপে সীতার ব্যথাবিদগ্ধ তনুমনে যেমন শৈত্যের সঞ্চার করিতেন, তেমনি আশা ও ভরসার কথা কহিয়া, তাঁহার নিরাশাহত হৃদয়ে জীবন-সঞ্চার করিতেন। শক্রপুরীতে সীতা যে নিরাশার পীড়নে দেহত্যাগ করেন নাই, এ শুধু সরমার গুণেই।

অতি সামান্ত সময়ের জন্য কবি এই সরমাকে পাঠকের নিকট আনিয়াছেন, কিন্তু সেই সামান্ত সময়টুকুর মধ্যেই এমন চমৎকারভাবে এই চরিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা সকলের চিত্তে গভীর রেখায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্য একবার পড়িলেও কেহ সরমার কথা বিস্মৃত হইতে পারিবে না। এই ব্যথাবন্ধুর, জ্বালার জলদর্চি-বেষ্টিত জীবন-পথে এমন সহানুভূতির চিত্র বাস্তবিকই উপভোগ্য—এমনটি সহজে মেলে না। কবি সরমাকে সীতার অভিশপ্ত জীবনে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হিসাবে আঁকিয়াছেন বলিয়া সীতার নিকট সরমা সত্যই 'রক্ষঃকুল-লক্ষ্মী'। স্বল্পকথায় এমন একটি অপার্থিব চরিত্র-সৃষ্টি একমাত্র মধুসূদনের পক্ষেই সম্ভব। ("চরিত্র-সৃষ্টি"-নিবন্ধে 'সীতা' ও 'সরমা' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।)

১৮। "মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গটি কাব্যের মুল কাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন এবং মূল প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে নিরর্থক"—এই মন্তব্য অবলম্বন করিয়া চতুর্থ সর্গের উপযোগিতা আলোচনা কর।

উত্তর। ইন্দ্রজিতের অভিষেকে সমগ্র লঙ্কাপুরী আনন্দোদ্বেল, এই প্রচ্ছদপটে 'অশোকবন' নামক চতুর্থ সর্গে কবি অঙ্কিত করিয়াছেন পুরীর কোন এক দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থিত শোকাচ্ছন্ন অশোককাননের এক মর্মস্পর্শী চিত্র। এই কবি-প্রয়াসের মূল লক্ষ্য হইল সীতা-চরিত্র অঙ্কন। বন্দিনী সীতাদেবী অন্যদিন এই বনে বিকট-দর্শন চেড়ীগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকেন, আজ বিভীষণ-পত্নী সরমা আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত। এই সীতা ও সরমার কথোপকথনেই এই সর্গের কলেবর গঠিত হইয়াছে। ইহাতে আমরা পাই সীতার আরণ্যজীবন-কাহিনী, সূর্পণখা-বৃত্তান্ত, রাক্ষস-যুদ্ধ, রামচন্দ্রের স্বর্ণমৃগান্বেষণ, লক্ষণের প্রতি সীতার ভর্ৎসনা, রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ, জটায়ুর যুদ্ধ, মূর্চ্ছিত অবস্থায় সীতাদেবীর ভবিতব্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ স্বপ্নদর্শন এবং সীতার প্রতি সরমার সশ্রদ্ধ আশ্বাস-বাণী।

এখন প্রয়োজন হইল, এই সর্গটির উপযোগিতা-নির্ণয়। নয়টি সর্গে গ্রথিত এই মেঘনাদবধ কাব্যের গাঢ়বন্ধতার জয়গান আমরা শুনিয়াছি। "মেঘনাদবধ কাব্যেই মধুসূদন সর্বপ্রথম ইউরোপীয় কাব্যকলাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। কাব্যের কেন্দ্র ও পরিধি গোড়া হইতে স্থির করিয়া নয়টি সর্গে তিনি পর পর যে ভাবে বস্তু-যোজনা করিয়াছেন, সামান্য আখ্যানটুকুকে যেরূপ সাবধানতার সহিত বিস্তারিত করিয়াছেন, সর্গগুলির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য ও যথাস্থান যেভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মূল কাহিনীর গতিধারা যেরূপ অব্যাহত রাখিয়াছেন,—তাহাতে কাব্যখানি গঠনে ও গাঢ়বন্ধতায় প্রায় অনবদ্য হইয়াছে।" অর্থাৎ এই কাব্যের কোন সর্গকেই অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না। কিন্তু তথাপি সমালোচক মহলে এই সর্গটির প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে উৎসাহের প্রচুর অভাব দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের কথা হইল, মেঘনাদবধের মূল কাহিনীর সহিত এই সর্গটির কোন সংযোগ নাই। নির্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে কবির যেন সহসা পথচ্যুতি (digression) ঘটিয়াছে। কিন্তু এই অভিযোগ যে নিতান্ত অমূলক তাহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আমরা দেখিতে পাই, উমা ও বিজয়ার কথোপকথনের মধ্যে প্রমীলা ও মেঘনাদের শক্তি-ক্ষয় তথা রক্ষোবংশের বিনাশের ইঙ্গিত দিয়া 'সমাগম' নামক তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত করিবার পর কবি শ্রীমধুসূদন ভক্তসুলভ দীনতা লইয়া কবিগুরু বাল্মীকির চরণ বন্দনা করিয়া নূতন শক্তি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মূল কাহিনীকে ফেলিয়া রাখিয়া এইরূপ স্তুতি-বন্দনা অবশ্যই মত্ততার পরিচায়ক নহে। বুঝিতে হইবে কবি কোন এক বিশেষ সৃষ্টির জন্য এক বিশেষ রকমের প্রস্তুতির প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন, চতুর্থ সর্গের প্রধান উপজীব্য সীতা-চরিত্রের উপাদান বাল্মীকির নিকট হইতে লইতে হইবে, তাই এই প্রস্তুতি কেবল সীতা-চরিত্র অঙ্কন করিবার জন্য, তাঁহারা কবি-কৃতির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা করিলেন এমন কথা বলা যায় না। কারণ প্রথমতঃ, চতুর্থ সর্গের মুখবন্ধে তৎকৃত প্রার্থনার মধ্যে কবি কোথাও একথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, তিনি সীতা-চরিত্র বর্ণনার জন্যই কবিগুরুর নিকট শক্তি ভিক্ষা চাহিতেছেন। প্রথম সর্গে যেমন তিনি শ্বেতভুজা ভারতীর নিকট কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়া যশস্বী হইতে চাহিয়াছেন, এখানকার প্রার্থনাও তাহারই অনুরূপ;—বাল্মীকির কৃপা ব্যতীত তিনি কেমন করিয়া কবিতা-রস-সায়রের অন্যান্য রাজহংসের সহিত মিলিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবেন; তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ভাষাকে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দীন, তাই তাঁহার কথা হইল—'কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।' সুতরাং এই যে কৃপা-প্রার্থনা ইহা সীতা-চরিত্র অঙ্কনরূপ কোন অংশবিশেষের জন্য নহে, সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের সৌষ্ঠব ও সফলতার জন্য। তবে যে ঠিক এই সর্গটির প্রারম্ভে প্রার্থনাটি দেখা দিল, ইহা কি কেবল খেয়াল অথবা নিরর্থক? কখনই নহে। মনে রাখিতে হইবে, মাইকেল মধুসূদন মহাকাব্য রচনার প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, এবং যে মহাকাব্য তিনি রচনা করিয়াছেন তাহা লক্ষ্যহীন লেখনীচালনার আকস্মিক ফলরূপে দেখা দেয় নাই, শিল্পীর সুপরিকল্পিত ছাঁচেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ছাঁচের অঙ্গহিসাবে চতুর্থ সর্গটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি অত্যন্ত সচেতন বলিয়াই প্রার্থনাটি ইহারই প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহাকাব্যের অন্যতম প্রয়োজন হইল বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া চতুর্থ সর্গটি সমগ্র কাব্যের মধ্যে অদ্বিতীয়। তৃতীয় সর্গে কবি বীররস ও ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের পর্যাপ্ত পরিবেশন করিয়াছেন। বীরাঙ্গনা প্রমীলার চরিত্র অঙ্কন করিবার জন্য বীরোচিত গতিবিধি বা কথাবার্তার সঙ্গে স্থানে স্থানে ভয়ংকরের সমাবেশও দেখা যায়। পর্বত গৃহ হইতে নির্গত সিন্ধুমুখী স্রোতস্বিনীর ন্যায় দানব-বালা প্রমীলা হুংকার দিলেন "দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধূ; রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?" উগ্রচণ্ডা ধনী নৃ-মুণ্ডমালিনী অশ্ব সমাবেশ করিল, অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ ডাকিনী যোগিনীর ন্যায় প্রমীলার পার্শ্বে সমবেত হইল, বাড়বাগ্নি-শিখার ন্যায় বড়বার পৃষ্ঠে দীর্ঘশূল হস্তে লইয়া দানব-বালা আরোহণ করিলেন,—সমস্তটা মিলিয়া যেন চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর-বধের আয়োজন হইয়া উঠিল। অতঃপর তাহাদের সদর্প অভিযান, নৃ-মুণ্ডমালিনীর সদম্ভ ভাষণ, ভীমারূপী বীর্যবতী চামুণ্ডার ন্যায় শূলপাণি প্রমীলা ও তাঁহার ভয়ংকর নারীবাহিনী-কর্তৃক রামচন্দ্রের ভীতি-উৎপাদন, বিজয়গর্বে প্রমীলার পুরী-প্রবেশ,—ইত্যাদি সমাচার-দান প্রসঙ্গে কবি বীরত্ব, ঐশ্বর্য ও ভয়ংকরের সমাবেশে যে এক উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, মহাকাব্যের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর অনুরোধে, তাহার সাময়িক পরিবর্তন ঘটাইয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত-শীতল পরিবেশ সংযোজনার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। করুণ-রস-প্লাবিত চতুর্থ সর্গটি সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ করিয়াছে। সমর-বিধ্বস্ত উত্তপ্ত লঙ্কাপুরী হইতে বিচ্ছিন্ন ছায়াশীতল অশোকবনের স্তিমিতালোকে দুইটি কোমলহৃদয়া পূতচরিত্রা সাধ্বী রমণীর সহৃদয় আলাপনের মধ্যে কবি মহাকাব্যের এই বায়ুপরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিতে বিগলিত সীতা ও সরমার এই কথোপকথন একদিকে যেমন লঙ্কাযুদ্ধের পূর্ববর্তী বিবরণ সংক্ষেপে পাঠককে জানাইয়া দিয়া সমগ্র কাব্যখানির উপর অধিকতর আকর্ষণ জন্মাইয়া দেয়, অপরদিকে তেমনি তৃতীয়সর্গ-সম্ভূত বহুমুখী উত্তেজনার উপর আনিয়া দেয় এমন এক শান্তির মধুর প্রলেপ—যাহার ফলে কবি সেখানে যে বীররসের সঞ্চার করিয়াছেন তাহাকে ধারণ করিয়া স্থায়ী উপভোগের পক্ষে পাঠকের আর কোনরূপ কাঠিন্য থাকে না। বীররসাত্মক কাব্যকে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য যে মানসিক বিশ্রামের (নাটকের ভাষায় যাহাকে বলে dramatic relief) প্রয়োজন ছিল তাহারই সার্থক আয়োজন হইয়াছে এই চতুর্থ সর্গে। এই বৈচিত্র্যবিধান সম্পর্কে কনক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "মহাকাব্যের বৈচিত্র্যসাধনের জন্য পার্শ্বচিত্র বা শাখা-কাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন। মহাকাব্য-রচনায় এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ রচনা করিয়াছিলেন এবং একটি বিচ্ছিন্ন আখ্যানবস্তুকে মূল ঘটনার সহিত সংযোজিত করিয়া কবি পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন।"

দ্বিতীয়তঃ, পাশাপাশি দুইটি বিপরীত পরিস্থিতি গঠন করিয়া উভয়কে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলার যে রীতি, তাহা সর্বত্রই শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচায়করূপে গণ্য। যদি মূল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত প্রমীলার চরিত্র ও সমরবিধ্বস্ত লঙ্কাপুরীর তদানীন্তন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ কাব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়, তবে তাঁহাদের দুইটি বিপরীত চিত্র (foil) হিসাবে সীতা-চরিত্র ও অশোকবনের অশ্রুসজল কথোপকথন সেই কাব্যমূল্যই অধিকতর বর্ধিত করিয়াছে। বিশেষতঃ, সীতার আরণ্য-জীবনের মধুর স্মৃতি উগ্ররস-সেবিত পাঠকের অন্তরে

নিঃসৃত হইয়াছে বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুপম চিত্ররাজি এবং এই সৃষ্টিকার্যে কবির উদ্দাম কল্পনাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। প্রথমত আমরা স্বর্গের ঠিক পাশাপাশি মর্ত্যকে পাইয়া এখানে এক জাতীয় কৌতুক অনুভব করি। আমরা যেমন পাই এক দেব-দম্পতীকে, তেমনি পাই এক রাক্ষস-দম্পতীকে। ইহাদের আচরণের পার্থক্যও বিশেষ উপভোগ্য। মধুসূদনের লেখনীমুখে রাক্ষস-দম্পতীর নিকট দেব-দম্পতী কি ভাবে ম্লান হইতে বাধ্য হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা মধুসূদনের কবিকৃতিতে মুগ্ধ হই। ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী'র আলাপ-আচণের মধ্যে এমন এক দুর্বলতা ও অসহায় মনোভাব অঙ্কিত হইয়াছে যে, তাহার পাশাপাশি মেঘনাদ ও প্রমীলার চিত্র স্বভাবতই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। পার্থিব দম্পতীর প্রেমালাপের মধ্যে দুর্বলতা বা ভীরুতা নাই, আছে কর্মপূত বীর-প্রেমের উজ্জ্বল কাঞ্চন-কান্তি। দেব-দম্পতীর বিলাসোচ্ছল জীবনটিই আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠে, আর রাক্ষস-দম্পতীকে দেখা যায় কুসুম-কোমল প্রেমিক-হৃদয়ের অধিকারী হইয়াও কর্তব্যে কঠোর, সংযমে অবিচলিত, দাম্পত্য জীবনের সমুন্নত মহিমায় মহিমান্বিত।

বৈপরীত্যমূলক বৈচিত্র্যের আস্বাদন সত্যই এই সর্গের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যাহার বলে সর্গটি সমগ্র গ্রন্থখানির মহাকাব্যত্ব-প্রতিষ্ঠায় বহুলাংশে সহায়ক হইয়াছে। এই বৈচিত্র্য যেমন চরিত্র-চিত্রণে তেমনি দৃশ্যপট ও পরিবেশ রচনায়, ভাবে ও ভাষায়, সুরে ও আবেগে। "উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে ; লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!"—এখানে একই সঙ্গে উদয় ও অস্তের দৃশ্য আঁকিয়া কবি উপভোগ্য কাব্যরসের অবতারণা করিয়াছেন, অথচ ঘটনা-প্রবাহ এতটুকু ব্যাহত হয় নাই। লক্ষ্মণের পরীক্ষার বর্ণনায় কবি আরও উচ্চাঙ্গের বৈপরীত্য-সৃষ্টি-কলার পরিচয় দিয়াছেন। "ভীষণ-দর্শন মূর্তি! দীপিছে ললাটে শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি মণি! জটাজুট শিরে" দক্ষিণ করে ত্রিশূল ধারণ করিয়া ভূতনাথ ; রক্তবর্ণ আঁখি হর্যক্ষ যাহার ঘোরনাদে কানন কম্পমান ; বিদ্যুৎ-সম্বলিত মেঘের ঘনঘটা, মুহুমুহু ; বজ্রপাত, রৌরবসৃষ্টিকারী দাবানল,—ইত্যাদি ভয়াবহ দৃশ্যপরম্পরার পাশেই কবি আঁকিলেন ঃ

তারাদল শোভিল গগনে!
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
* * *
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্বণে!
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সপ্তস্বরা ; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া!

অতঃপর অপ্সরাগণের সৌন্দর্য ও ভাববিলাসের চিত্র অঙ্কন করিয়া কবি আতঙ্ক ও বিভীষিকার পরেই শান্তি ও সুষমার প্লাবন ঘটাইয়া পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন।

পরবর্তী ষষ্ঠসর্গে যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিবে তাহার জন্য এই পঞ্চম সর্গে যেমন একদিকে সর্বপ্রকার উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইল, আর একদিকে তেমনি মহাকাব্যোপযোগী নানা বৈচিত্র্যের পরিবেশনে পাঠকচিত্তকেও প্রস্তুত করা হইল, আনুষঙ্গিকভাবে বিচিত্র কাব্যরসের অবতারণায়

গ্রন্থের কাব্যমূল্যও বর্ধিত হইল। এইখানেই পঞ্চম সর্গের উপযোগিতা, আর ইহাতেই প্রমাণিত হইবে যে, সমগ্র কাব্যমধ্যে এই সর্গটির স্থান অবশ্যই নগণ্য নহে।

২০। পঞ্চম সর্গের উপর দেশী ও বিদেশী প্রভাবের আলোচনা করিয়া এই সর্গের ঘটনা-সমাবেশে ও রচনায় মাইকেলের মৌলিকতা নির্ণয় কর।

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গটি সমালোচকের নিকট একটি প্রিয় কাব্যাংশ। এখানে দেশী ও বিদেশী কাব্যের প্রভাবও যেমন প্রচুর, কবির নিজস্ব মৌলিকতাও তেমনি উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ হইতে প্রচুর আহরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা দুর্বলের নির্বীর্য সংগ্রহ নহে, তাহা প্রতিভাবানের সৃজনাত্মক আহরণ ও স্বকীয়করণ—যাহার ফলে সমাহৃত সামগ্রী নূতন সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণের যে সুকঠিন পরীক্ষার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে দেখা যায় সিদ্ধির পথ অতিশয় বন্ধুর ও বিঘ্নসংকুল, মধুসূদনের লক্ষ্মণ বহু বিভীষিকা বহু প্রলোভন জয় করিয়া তাঁহার ইষ্টদেবতার বরলাভে সমর্থ হইয়াছেন। অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী অপ্সরাগণ আবির্ভূত হইয়া জলক্রীড়া দেখাইয়া, প্রণয়-সম্ভাষণ করিয়া এবং নানা হাবভাবের দ্বারা লক্ষ্মণের মন হরণ করিবার চেষ্টা করিল। মাইকেলের এই বর্ণনা ট্যাসোর কাব্য 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড'-এর একটি বর্ণনার অনুকরণে লেখা। ট্যাসোর মহাকাব্যে দেখা যায় যে, কুহকিনী আর্মিডার মায়াপুরীতে রাইনাল্ডো যখন মোহাবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই উবাল্ডো এবং তাঁহার সহচর এইরূপ বিপদসংকুল পথের মধ্য দিয়া আর্মিডার মায়াপুরীতে পৌছিয়াছিলেন। মিলটনের 'প্যারাডাইস্ রিগেন্ড্' কাব্যেও ক্রাইষ্টকে শয়তানের প্রলোভন প্রদর্শনের বিবরণ আছে। ইহাও মধুসূদনের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।

ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার যে নিদ্রাভঙ্গের বর্ণনা এই পঞ্চম সর্গে দেখা যায়, তাহা 'প্যারাডাইস্ লষ্ট'-এর এ্যাডাম কর্তৃক ঈভের নিদ্রাভঙ্গের অনুকরণে লেখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র পঞ্চম সর্গটির উপর গ্রীককাব্যের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর্য রামায়ণে লঙ্কাযুদ্ধে দেব-দেবীগণের কোন পক্ষপাতিত্বের বা পক্ষাবলম্বনের দৃষ্টান্ত নাই; কিন্তু পঞ্চম সর্গে দেখা যায়, কবি ইলিয়াতের অনুকরণে দেবতার কার্যকলাপের আধিপত্য ঘটাইয়াছেন। সর্বোপরি যে এক অলক্ষ্য নিয়তির বিধান এই সর্গে পদে পদে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাও ঐ গ্রীককাব্যের অনুসরণেই হইয়াছে।

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, মেঘনাদবধের যেথানেই এইরূপ পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্য হইতে উৎকৃষ্ট রচনাংশ বা রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে, সেখানেই উহা প্রতিভাবান কবির অদ্ভুত প্রতিভাস্পর্শে নূতন ও মৌলিক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির অনুকরণ সর্বত্রই একটি সচেতন প্রয়াস, কিন্তু লক্ষ্য উহার সর্বত্রই মহৎ ও পুরুষোচিত। শিল্পী মধুসূদন বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য কবির শিল্পকলা আত্মসাৎ করিয়া আপন মাতৃভাষাকে তদ্দ্বারা সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য মণ্ডিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াই লেখনী ধারণ করেন। সর্বত্রই তাঁহার যেন একটা Challenging Spirit—একই কলা-কৌশলে সুন্দরতর কাব্যসৃষ্টি করিবেন, এবং বলা বাহুল্য, তাঁহার এই স্পর্ধা শূন্যগর্ভ হুঙ্কার না হইয়া মহিমময়ী সৃষ্টিতেই সার্থক হইয়াছে।

এক গীতিসুলভ মাধুর্যের সঞ্চার করিয়া দেওয়ায় এই সর্গটি পাঠকের নিকট এক বিশিষ্ট আকর্ষণের দাবী রাখে।

তৃতীয়তঃ, এই সর্গটি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের এক উল্লেখযোগ্য পরিচয় বহন করে। এই ছন্দেই কবি আমাদের ভেরী-রব ও বীণা-নিক্বণ উভয়ই শুনাইয়াছেন। বিষয়বস্তু অনুযায়ী এ ছন্দের এক এক স্থানে এক এক প্রকার অনুরণন শুনিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় সর্গের বিষয়বস্তুতে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ভেরীরবেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে, সেখানে বীণা ধ্বনির কোন অবসর নাই। কিন্তু মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীণা-নিক্বণে গীতি-ঝংকার তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—এই সর্গে তাহার পর্যাপ্ত পরিচয় রহিয়াছে। "ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,"—ইত্যাদি সীতাদেবীর সুদীর্ঘ উক্তিটি যেন সুকণ্ঠীর সুললিত সংগীতের মত শোনা যায়; বিশেষত যেখানে তিনি বলেন:

"নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!"

—আমরা যেন মুগ্ধচিত্তে কোন গানের পালাই শুনিতে থাকি। ডাঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, চতুর্থ সর্গে কবির লিরিক ক্ষমতা চূড়ান্তে উঠিয়া গিয়াছে।

১৯। পঞ্চম সর্গে বর্ণিত ঘটনার ইঙ্গিত সহ এই সর্গটির উপযোগিতা ও সমগ্র কাব্য মধ্যে ইহার স্থান নির্ণয় কর।

উত্তর। পঞ্চম সর্গের ঘটনা স্বর্গ-মর্ত্যে ব্যাপ্ত হইয়া সঞ্চারিত। একটি স্বর্গের ও দুইটি মর্ত্যের এই তিনটি ঘটনা-চিত্র এখানে সন্নিবেশিত দেখা যায়। স্বর্গে চলিতেছে দেবতাদের সলা-পরামর্শ, অংশগ্রহণ করিয়াছেন প্রধানত ইন্দ্র ও মায়াদেবী—শচীদেবী আছেন দেবরাজের পার্শ্বচরীরূপে আনন্দ-আতঙ্কের ভাগ লইতে। ঠিক হইল মায়াদেবী স্বয়ং যাইবেন লঙ্কাপুরী ইন্দ্রজিত-নিধনে লক্ষ্মণের সহায়তায়, আর পরবর্তী ব্যাপারে ইন্দ্র রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়া সমস্ত বিপদের ঝুঁকি লইবেন। ইহাই স্বর্গে সংঘটিত ঘটনার রেখা-চিত্র।

মর্ত্য ঘটনা-দ্বয় ঘটিয়াছে লঙ্কাপুরীরই দুইটি বিভিন্ন অংশে। প্রথমে স্বপ্নদেবীর সাহায্যে মায়াদেবী লক্ষ্মণকে চণ্ডীর দেউলে গিয়া তৎপূজান্তে বর-প্রার্থনার কথা জানাইলে লক্ষ্মণ স্বপ্নবর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী চণ্ডী-পূজা ও বর লাভে সমর্থ হন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে বিচিত্র বাধা অতিক্রম করিয়া বহুপ্রকার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই দীর্ঘ-বর্ণিত ঘটনাটি ঘটে লঙ্কার উত্তরে অবস্থিত চণ্ডী-কাননে।

ঠিক একই সময়ে লঙ্কার অপরাংশে ঘটিতেছিল আর একটি ঘটনা। প্রেমিকবর মেঘনাদ কর্তৃক প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হইলে উভয়ে মিলিয়া মাতৃসকাশে গমন করেন, উদ্দেশ্য—মাতৃ-আশীর্বাদ মাথায় লইয়া মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিবেন। মন্দোদরী কুণ্ঠার সহিত পুত্রকে বিদায় দিলেন; কিন্তু পুত্রবধূকে সঙ্গ-ছাড়া করিতে চাহিলেন না। প্রমীলা যজ্ঞাগারের পথে

দাঁড়াইয়া তাঁহার সিংহ-বিক্রম স্বামীকে তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিলেন। স্বামী চক্ষের অন্তরালবর্তী হইলে তাঁহার কল্যাণের জন্য ভবানীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু দেবরাজের চক্রান্তে সে প্রার্থনা আর কৈলাসে পৌঁছিল না, মাঝপথেই বায়ুপতি আসিয়া উহাকে উড়াইয়া লইয়া গেলেন।

পঞ্চম সর্গের উপযোগিতা ও সমগ্র কাব্য মধ্যে ইহার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্গটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'উদ্যোগ'। অর্থাৎ কাব্যের যে মূল ঘটনা মেঘনাদ-বধ, তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত উদ্যোগ এখানে সম্পূর্ণ হইল, এখন বাকী রহিল শুধু মেঘনাদের নিধন যাহা ষষ্ঠ সর্গের বর্ণিতব্য বিষয়। এই উদ্যোগ কেবল স্বর্গে বা কেবল মর্ত্যে নিবদ্ধ নহে, স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়স্থানেই চলিয়াছে ইহার মহড়া। ইহাতে কাব্যের কেন্দ্রীয় অবলম্বন বা মূলঘটনাটির গুরুত্ব বর্ধনে কবি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষ উপভোগ্য। মেঘনাদের পতন কোনো সাধারণ বীরের পতন নহে, তাহার জন্য যে স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় না হইলেই নয়, ইহাই পঞ্চম সর্গের মর্মগত ইঙ্গিত। স্বয়ং দেবরাজ তাহার জন্য বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন। দেবরাজ হইয়াও তিনি এককভাবে এই ব্যাপারে কিছুই করিতে পারেন না, তাই মায়াদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ। মর্ত্যেও যাহাকে দিয়া এই কার্য হাঁসিল করিতে হইবে তাহাকে সামান্য বীর হইলে চলিবে না; কেবল দেবশক্তিতেও তাহাকে পুরাপুরি সক্ষম করিয়া তোলা সম্ভব নহে, তাই সেই বীরের নিজস্ব বীরত্ব, শক্তি ও চরিত্রবলের একটা বড়ো রকমের পরীক্ষা ও প্রস্তুতি চাই। মূল কাব্যের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্যই পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ-বৃত্তান্তকে এতখানি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, আর এই প্রসঙ্গে, পরবর্তী সর্গে লক্ষ্মণ-চরিত্রটি যে হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কবি যেন তজ্জনিত তাঁহার দোষ-ক্ষালনের একটা প্রশস্ত অবসর রচনা করিয়াছেন এই পঞ্চম সর্গে। বস্তুত মাইকেলের লক্ষ্মণ-চরিত্রের স্বরূপ-নির্ণয় মেঘনাদবধ-কাব্য-পাঠকমাত্রেরই অন্যতম লক্ষ্য, এবং সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে একমাত্র এই সর্গেই লক্ষ্মণ-চরিত্রের সমুন্নতি অঙ্কিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া, একমাত্র এই সর্গেই পাওয়া যায় মন্দোদরী চরিত্রের আলেখ্য, এবং সে আলেখ্যে স্পষ্টই লক্ষিত হয় মধুসূদনের চরিত্রায়নের মৌলিকতার ছাপ। এ এক নূতন মন্দোদরী মাতৃ-মহিমায় অপরূপ যাঁর মূর্তি। মেঘনাদ-প্রমীলারও অন্যত্র বিস্তৃত পরিচয় থাকিলেও এখানেও আছে এক অনবদ্য চিত্র যার অভিনবত্ব কবি-দৃষ্টির মৌলিকতার উপভোগ্য পরিচয় বহন করে। এক কথায় এই তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে কবি লঙ্কেশ্বর রাবণের অন্তঃপুরের যে আবহাওয়া কাব্য মধ্যে বহাইয়া দিয়াছেন তাহাতে পঞ্চম সর্গের সংশ্লিষ্ট ভগ্নাংশটি বেশ মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে। এই আবহাওয়া যে কৃত্তিবাসী ও বাল্মীকী আবহাওয়া হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র, কেবল ইহাই স্মরণীয় নহে, এই স্বাতন্ত্র্যের বলে কবি যে তাঁহার কাব্যের গোটা রাক্ষস-সমাজেরই কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি দৃঢ়তর করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহাও স্মরণীয়।

পঞ্চম সর্গের স্থান-নির্ণয়ে আরও কয়েকটি বিষয় আলোচ্য হইয়া পড়ে। যে বৈচিত্র্য-সৃষ্টি মহাকাব্যের অন্যতম আকর্ষণ সেই দিক দিয়াও পঞ্চম সর্গের স্থান নগণ্য নহে। কাব্যের মূল ঘটনার অঙ্গীভূত ঘটনাংশগুলি যেমন এখানে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে, তেমনি কবির লেখনী হইতে

দেশীয় প্রভাবের মধ্যে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের কথাই উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম সর্গে বাল্মীকি অপেক্ষা কৃত্তিবাসেরই নিবিড়তর অনুসরণ দেখা যায়। আর্য রামায়ণে মহামায়া বলিয়া কোনো দেবী নাই। কিন্তু মায়ার প্রভাব ভিন্ন আকারে বর্তমান। ইন্দ্রজিতের মায়া-সীতা বধ, যুদ্ধ করিতে করিতে আপনার মায়ামূর্তিতে সকলকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিয়া পুরীমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ, মায়াবলে মেঘের আড়ালে যুদ্ধ ইত্যাদি রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনা দ্বারা মধুসূদন তাঁহার কাব্যে মায়া-প্রভাবিত ঘটনা সংযোজনায় আরও উৎসাহিত হইয়া থাকিবেন। যদিও সমালোচকের মতে মধুসূদনের মহামায়া হোমরের কাব্যের আথেনা (Athena) দেবীর অনুরূপ, তথাপি রামায়ণ-বর্ণিত মায়ার কোন প্রভাবই তাঁহার উপর পড়ে নাই, এমন কথা বলা যায় না। পঞ্চম সর্গে যে নিশা-রণের কথা ও রাম-লক্ষ্মণের একবার নিহত হইয়া পুনরায় জীবিত হওয়ার কথা পাওয়া যায়, তাহা মধুসূদন কৃত্তিবাস হইতে লইয়াছেন, বাল্মীকি-রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাস বলিয়াছেন :

'নাহিক এসব কথা বাল্মীকি-বচনে
বিস্তারিয়া লিখিত অমৃত-রামায়ণে।'

মন্দোদরীর পুরী বর্ণনাতেও কৃত্তিবাসের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। ইহা ছাড়া—

'মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি'
'এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্মতি।'

ইত্যাদি রচনার মধ্যে দেখা যায়, কেবল মন্দোদরীর পুরী বর্ণনা নয়, রাণীর মুখের কথাও মধুসূদন কিছু কিছু কৃত্তিবাস হইতে লইয়াছেন। কিন্তু তবুও ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে মন্দোদরীর পুরী ও চরিত্র উভয়ই মধুসূদনের কাব্যে কতই না অভিনব হইয়া দেখা দিয়াছে। মাইকেলের অনুকরণ দুর্বলের অনুকরণ নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইন্দ্রজিতের তিনবার যুদ্ধযাত্রার কথা আছে, এবং তাহার মাতৃ-সম্ভাষণ বলিতে যাহা কিছু সমস্তই ঘটে দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে। তৃতীয়বার, অর্থাৎ যেবার ইন্দ্রজিৎ নিহত হন, সেবার তিনি আদৌ মাতৃ-সন্নিধানে যান নাই।

মাতা সম্ভাষিতে গেলে হইবে বিরোধ
যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ-অনুরোধ।

মেঘনাদবধের কবি ঐ মাতৃ-সাক্ষাৎ তৃতীয়বারের যুদ্ধ-পূর্বেই এমনভাবে বর্ণিত করিয়াছেন, যাহাতে মাতা ও পুত্র উভয়ের চরিত্রই উজ্জ্বলতর ও মহত্তর হইয়া উঠিয়াছে। মাইকেলের মেঘনাদের মনে যুদ্ধ জয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই, আত্মশক্তিতে তাঁহার অটুট বিশ্বাস। মেঘনাদের দৃঢ় ধারণা মাতৃ-পদ-প্রসাদে দেব-দৈত্য-নরের সমরে তিনি চিরজয়ী। মাতৃভক্ত মেঘনাদের কোনো সংগ্রামেই মনে দুর্বলতা আসে না, কেবলমাত্র আজ্ঞার অপেক্ষা;—"দেহ আজ্ঞা তুমি। কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে?" এই মেঘনাদ কৃত্তিবাসের মেঘনাদ হইতে কত স্বতন্ত্র!

মন্দোদরী সম্পর্কে মাইকেলের রচনায় কৃত্তিবাসের অনেক অনুকরণ-অনুসরণ লক্ষ্য করা গিয়াছে। কিন্তু তুলনা করিলে অনেক পার্থক্যও ধরা পড়ে। উভয় মাতাই স্নেহময়ী; কিন্তু কৃত্তিবাসী মন্দোদরীর মুখে যখন শুনি :

ন হাজার নারী তব পরমা সুন্দরী।
আজি সেবা করুক যতেক বহুয়ারী॥
রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া সুমতি।
অন্তঃপুরে থাক বাছা আজিকার রাতি॥

তখন যেন মায়ের স্নেহ লক্ষ্য করিতে করিতে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। পক্ষান্তরে মধুসূদনের মন্দোদরীকে এই বলিয়া পুত্রকে বিদায় দিতে শোনা যায়ঃ—"যাইবি রে যদি,—রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি তাঁর পদযুগে আমি।" যুদ্ধে বা যজ্ঞালয়ে যাত্রা করিবার পূর্বে প্রমীলার নিকট মেঘনাদের বিদায়গ্রহণ ও সেই উপলক্ষে এই রাক্ষস-দম্পতীর চরিত্রের যে সমুন্নতিসাধন—ইহার কিছুই কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই।

এখানে মূলকথা হইল, আর্য রামায়ণে রাক্ষস-চরিত্রগুলির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ স্নেহ-ভক্তিবাৎসল্যের পরিচয় থাকিলেও সেগুলি সম্পূর্ণ রাক্ষস চরিত্র। কিন্তু সৃজনী প্রতিভার সম্রাট মধুসূদনের লেখনী মুখে সেই সুদূর লঙ্কাবাসী প্রাচীন যুগের রাক্ষস-চরিত্রগুলি একেবারে আমাদেরই বাংলাদেশের বর্তমান মার্জিত যুগের আদর্শ চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। তাই বলিতে হয়, পঞ্চম সর্গে যেমন দেশী ও বিদেশী প্রভাবের বিস্তারিত পরিচয় আছে, তেমনি ইহার প্রতি ছত্রে আছে মাইকেলের মৌলিকতার অবিস্মরণীয় নিদর্শন।

২১। মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গ অবলম্বন করিয়া কবির পরিকল্পিত মন্দোদরী-চরিত্রটির একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দাও।

উত্তর। অতি অল্পকালের জন্য ইন্দ্রজিৎ-জননী মন্দোদরী আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছেন। তুলিকার দুই একটি টানে কবি কিন্তু তাঁহার চিত্রখানিকে সুসম্পূর্ণ ও অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদনের হাতে রাক্ষসরমণী বঙ্গজননী মূর্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়াছেন। মন্দোদরী আদর্শ মাতা, সর্বদা সন্তানের শুভানুধ্যানে সমাহিত-চিত্তা এবং স্নেহান্ধা। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি পদে পদে আকুল হইতেন। তাঁহার হৃদয়খানি ফুলের মত কোমল।

পুত্র মেঘনাদের শুভকামনায় শিবালয়ে বসিয়া সেই পরম দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন,—এই স্নেহার্দ্র মূর্তিতে আমরা মন্দোদরীকে প্রথম দেখিতে পাই। তাঁহার পর সস্ত্রীক মেঘনাদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি পূজান্তে মন্দির হইতে বাহির হইলেন,—অমনি পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। মন্দোদরী হর্ষোৎদ্বেলিত হৃদয়ে তাঁহাদের দুইজনকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া নীরবে উভয়ের মস্তকে আনন্দের অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কবি এখানে রমণীর স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়খানিকে পাঠকের চক্ষের সম্মুখে একেবারে মেলিয়া ধরিয়াছেন। দিবারাত্র যাঁহারা তাঁহার সকল চিন্তা, সকল ধ্যান, সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সারা চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন, আজ তাঁহারা তাঁহার বুকের কাছে আসিয়াছেন, তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই।

তাহার পর তিনি যখন শুনিলেন বীর পুত্র যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছেন, তখন একটি আশঙ্কার অনুভূতিতে তাঁহার মাতৃহৃদয়খানি শিহরিয়া উঠিল। কত

অসম্ভব বিপদের কল্পনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল ; মনে পড়িল, রাম অসমসাহসিক যোদ্ধা, তাঁহার কথায় জলে শিলা ভাসে, তিনি মরিয়া আবার বাঁচিয়া উঠেন—প্রাণ ধরিয়া তিনি পুত্রকে প্রথমে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দিতে পারিলেন না।

কিন্তু মন্দোদরী রাবণের স্ত্রী—মহাবীর্যবতী ও তেজস্বিনী রমণী। তিনি বীরের কন্যা, বীরের ঘরণী, বীরপ্রসূ। কাজেই জননীর স্নেহকোমলতার সঙ্গে তাঁহার ক্ষাত্রতেজের জ্বালাও ছিল। পুত্র যখন বীরত্বের বাণীতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, তখন মন্দোদরীর রক্তের সঙ্গে যে বীরত্বের তেজ মূর্ছিত হইয়াছিল তাহা জাগিয়া উঠিল ; এবং ইন্দ্রজিৎ যখন বর্তমান সময়ে যুদ্ধযাত্রা তাঁহার একটি অবিসম্বাদিত কর্তব্য বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তখন মন্দোদরীর স্নেহকাতর চিত্তে কর্তব্যবোধও জাগিয়া উঠিল। সেই উদ্বোধিত ক্ষাত্র উদ্দীপনায় তাঁহার নয়নের অশ্রু শুকাইয়া গেল এবং একটি কঠিন কর্তব্যবোধের তাড়নায় তাঁহার ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তা সমাহিত হইল। তিনি শেষে ভগবানের আশীর্বাদ যাচ্ঞা করিয়া বীর পুত্রকে যুদ্ধ গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। দেশের জন্য মন্দোদরী ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিলেন ; বীর-রমণীর অন্তর্গূঢ় তেজস্বিতায় তাঁহার অন্তর দৃঢ় হইল। তাই তিনি সকল ভয়কে দমন করিয়া সকল বেদনাকে সংযত করিয়া পুত্রকে মাতৃ-আশীর্বাদের দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত করিয়া যুদ্ধে যাইবার অনুমতি দিলেন। কর্তব্যের জ্ঞান কেমন করিয়া স্বভাবকে জয় করে, তেজস্বিতার প্রেরণা কেমন করিয়া সকল আশঙ্কাকে পরাভূত করে—কবির এই মন্দোদরী চরিত্র তাহার চমৎকার উদাহরণ।

মন্দোদরীকে আমরা আর একবার দেখিতে পাই রাবণের সভায়। ইন্দ্রজিতের ন্যায় পুত্রের মৃত্যু মায়ের বুকে যে কি প্রচণ্ড শেল বিদ্ধ করিতে পারে, তাহা কে অনুমান করিবে? এই নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র মনে হয় সেই বিরাট মাতৃহৃদয়ের বিরাট শোক-সাগর একমুহূর্তে এমনই উত্তাল উদ্দাম হইয়া উঠে যে, সমস্ত বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া রাণী মন্দোদরী 'শিশু-শূন্য নীড় হেরি আকুল কপোতী যথা' ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার একমাত্র গতি স্বামীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। হত-চৈতন্য রাণীকে যত্নে তুলিয়া লইয়া রাবণ সান্ত্বনাস্বরূপ যাহাই বলুন, মন্দোদরীর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সখীরা ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল। শোকের এই স্তব্ধতার মধ্যে কবি মন্দোদরীর মাতৃহৃদয়ের উপর যে-ভাবে আলোকপাত করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

[এই সঙ্গে "চরিত্র-সৃষ্টি" নিবন্ধে 'মন্দোদরী'-প্রসঙ্গও দ্রষ্টব্য।]

২২। ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত ঘটনার সহিত বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের বর্ণনা-পার্থক্য নির্দেশ করিয়া মেঘনাদ ও লক্ষ্মণ চরিত্রের রূপায়ণে মধুসূদনের মৌলিকতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। মেঘনাদবধ একটি অতি প্রাচীন ও সুপরিচিত ঘটনা। কিন্তু বধসাধন ব্যাপারে ঘটনা-সন্নিবেশ ও পরিবেশরচনার মধ্যে মধুসূদনের বিশেষ এক মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে তিনি বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস কাহারও অনুসরণ করেন নাই। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারেই মেঘনাদ নিহত হন—এইটুকুই মাত্র মূল রামায়ণ হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরিবেশ সম্পূর্ণ পৃথক। যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিবার জন্য ও মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য মাইকেল পদে পদে যে

মহামায়ার প্রভাব দেখাইয়াছেন, আর্য রামায়ণে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই। মাইকেলের কাব্যে দেখা যায়, মায়ার বরে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকিয়া যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং ইন্দ্রজিতের কোষার আঘাতে লক্ষ্মণ অচৈতন্য হইলে ইন্দ্রজিৎ জয় লাভ করিবার যে সুযোগ পাইলেন, মায়ার প্রভাবে তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না তাঁহার অতুলনীয় শক্তিসত্ত্বেও লক্ষ্মণের হস্তধৃত অসি বা ধনু বা ফলক কিছুই তিনি স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। ইহা সমস্তই মাইকেলের নিজস্ব উদ্ভাবন। রামায়ণে এইরূপ অদৃশ্যভাবে যজ্ঞাগারে প্রবেশের কথাও নাই, অথবা যুদ্ধকালে এইরূপ কোন যাদুমন্ত্রের প্রভাবও দেখা যায় না। সেখানে দেখা যায় বানরসৈন্য সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণ ও বিভীষণ প্রকাশ্য দিবালোকে গড়ের নিকট উপনীত হইয়া প্রবেশ দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া রাক্ষস-প্রহরীর সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিলেন। যজ্ঞ পণ্ড করিবার জন্য হনুমান উপর হইতে প্রস্রাব করিয়া দিল। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যেও কোনো গোপনীয়তা নাই, দৈব প্রভাবও নাই; সম্মুখ-সমরে বাহুবলেই ইন্দ্রজিৎ পরাস্ত ও নিহত হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ যে সুসম্পন্ন হইবে না, ইহাও প্রথমেই বুঝা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লিখিত আছে, এবারে যে অগ্নিকুণ্ড সজ্জিত হয়, তাহার আয়োজন নাকি মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, মেঘের গর্জনের ন্যায় বিষম শব্দ করিয়া অগ্নির তেজ গগন স্পর্শ করে, দক্ষিণ দিকে আগুনের শিখা ধাবিত হয়, এবং তাহার জন্য অগ্নিদেব রুষ্ট হইয়া উঠেন। তাহা ছাড়া নিত্যপূজা ও বর প্রার্থনাও অগ্নিদেবের পক্ষে বিরক্তিজনক। তাই তৃতীয় বারের যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মেঘনাদ যখন রামকে বধ করিবার জন্য বর প্রার্থনা করিলেন তখন অগ্নিদেব স্পষ্টই জানাইলেন যে এ প্রার্থনা তাঁহার পূর্ণ হইবে না।

"অগ্নি বলে হেন বর চাহ তো রাবণ
কেমনে মারিব রামে তিনি নারায়ণ।"

রামায়ণের লক্ষ্মণ দৈব সহায়তা পাইলেও উহা খাঁটী বীরের চরিত্র। কিন্তু মাইকেলের লক্ষ্মণ চরিত্রে বীরত্ব ও নৈতিক দৃঢ়তার যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও ষষ্ঠ সর্গে উহা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে—ইহা সাধারণ সমালোচকের অভিমত। এই হীনতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যজ্ঞাগারে প্রবেশ কালেও মাইকেল এতখানি মায়ার প্রভাব আমদানী করিয়াছেন। তিনি যে চোরের মত মেঘনাদের ঘরে ঢুকিয়াছেন, এবং চোরের মত শাস্তিই তাঁহার পাওয়া দরকার এ কথার কোন ভিত্তি থাকিত না, যদি না লক্ষ্মণ গোপনে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করিতেন।

এইখানে মধুসূদন স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাল্মীকির অঙ্কিত চরিত্রটিকে একেবারে বিপরীত করিয়া আঁকিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে ইন্দ্রজিতের লক্ষ্মণকে তিরস্কার করা দূরে থাকুক, লক্ষ্মণই বীরোচিত দৃপ্তকণ্ঠে ইন্দ্রজিতকে প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য তিরস্কার করিয়াছেন। "অন্তর্দ্ধান গতেনাসৌ.........বাগত্বং বিকম্পসে", ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে পাওয়া যায় যে 'তস্করাচরিতো মার্গ' অবলম্বন করিবার জন্য ও অনর্থক গর্ব প্রকাশ করিবার জন্য ইন্দ্রজিতই লক্ষ্মণ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছে।

মধুসূদনের জীবনচরিতকারের মতে মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গই সমস্ত কাব্যের মধ্যে নিকৃষ্ট, এবং তাঁহার এইরূপ অভিমতের প্রধান কারণই হইল এই সর্গে অঙ্কিত রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্রের চরম অবনতির চিত্র।

নিঃশঙ্ক হওয়ায় নির্লজ্জের মত লঙ্কাসমরে অংশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, সেই ইন্দ্রকেই প্রথমে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া বীর-পিতার কর্তব্য বটে। কিন্তু তৎপূর্বে দেবসেনাপতি আসিয়া যেখানে রাবণের পথরোধ করেন সেখানে আমরা রাবণের আর একটি রূপ দেখিবার সুযোগ পাই। এ রূপ যেমন ভক্তি-নম্র তেমনি বীর্য-দীপ্ত। রামের সহিত তিনি অকারণ যুদ্ধ করিতে চাহেন না, কারণ আজিকার লক্ষ্য তাঁহার পুত্রহন্তা লক্ষ্মণ, তাই প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর ঔদার্যে রাবণ রামকে যুদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। ইতিমধ্যে একে একে বীর হনূমান ও কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীবকে অনায়াসে পরাভূত করিয়া অনিবার্য-গতিতে রাবণ আসিয়া লক্ষ্মণের সম্মুখে পৌঁছিলেন। ভীমপরাক্রম হনূ তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ, সুগ্রীবও তথৈবচ, অধিকন্তু বিদ্রূপের পাত্র, এবং সেই ঘোর রণোন্মদের মধ্যেও বিদ্রূপবর্ষণে রাবণ পরাঙ্মুখ নহেন।

লক্ষ্মণের মুখোমুখি রাবণকে কবি কী যত্নেই না অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম দৃষ্টিতে লক্ষ্মণ দেবাকৃতি,—বলা বাহুল্য ইহা স্বয়ং কবিরই দৃষ্টি। এই দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। অতঃপর বুঝি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ ও পুত্রহন্তার শাস্তি-বিধানের উদ্দেশ্যে আপন বীর-রোষাগ্নিকে উত্তেজিত করিবার জন্য শোনা যায় তাঁহার আস্ফালন, ভর্ৎসনা, রণোন্মত্ত হুংকার। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, সেই ভীষণ রণোন্মাদনার মুহূর্তে রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের বীরত্বের প্রশংসা। বীর যে, সে কখনই বীরত্বের তারিফ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না—পরম শত্রুর ক্ষেত্রেও না। এই যে দুর্লভ বীর-চরিত্র-লক্ষণ, রাবণের মধ্যে তাহারই অপূর্ব সন্নিবেশ ঘটাইয়া মধুসূদন তাঁহার রাবণকে বীর সমাজে মহিমান্বিত করিয়াছেন। তাই যে পুত্রহন্তাকে প্রতিহিংসানলে দগ্ধ করিতেই এই যুদ্ধোদ্যম, তাহারই প্রশংসায় রাবণকে যখন আমরা বলিতে শুনি—

> "বাখানি
> বীরপণা তোর আমি সৌমিত্রি কেশরি!
> শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
> তুই ;"

তখন, একদিকে শক্তিশেল প্রয়োগের করাল দুর্জয় সংকল্প, অপরদিকে সেই অবশ্য নিধন-যোগ্য ঘোরতর শত্রুর অকুণ্ঠ-প্রশংসা, এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়ে রাবণ চরিত্র সম্পর্কে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অন্তর ভরিয়া উঠে।

যুদ্ধোদ্যম ও যুদ্ধের বর্ণনা এবং সেই সূত্রে অকৃত্রিম বীররসের অবতারণা নিঃসন্দেহে সপ্তম সর্গের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। যে বীররসের কাব্যসৃষ্টির মহৎ সংকল্প লইয়া কবি মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনা করেন, তাহা আর কোথাও এমন অবিমিশ্র এমন বিশুদ্ধ রূপ লাভ করে নাই যেমন করিয়াছে এই সপ্তম সর্গে। এই দিক দিয়া সপ্তম সর্গের উপযোগিতা অনন্যসাধারণ।

যুধ্যমান প্রায় সকল চরিত্রেই এখানে অল্পবিস্তর বীররস ফুটিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাবণের উক্তিতে ও কার্যকলাপে। যুদ্ধোদ্যমের প্রথম পর্বে রাক্ষসবাহিনীর প্রতি রাবণের যে দীর্ঘ উক্তি তাহা যেমন বীরোচিত তেমনি উদ্দীপনাময়। উৎসাহ যাহার স্থায়িভাব সেই বীররসের একটি চমৎকার রূপ ফুটিয়াছে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিনিচয়ে :

"বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে ! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
দেবদৈত্য-নর-ত্রাস তোমরা সমরে ;
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে চল রণস্থলে ;—
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী !"

এই যে বহু গুণান্বিত রাবণ চরিত্রের আলেখ্যনির্মাণ, ইহার একটা পৃথক গুরুত্ব এইখানে যে, যে বিরাট জীবনের ট্রাজেডি ফুটাইবার ভার সমগ্র কাব্যের, সপ্তম সর্গের এই আলেখ্য সেই ট্রাজেডিকেই মর্মস্পর্শী করিবার পক্ষে অবশ্যই সহায়ক হইয়াছে।

ইহা ছাড়া যুদ্ধের পরিবেশ রচনা, অস্ত্রাদির বিনিময়, রণ-কোলাহল ও ঘনঘটা, যুদ্ধের গতি সম্পর্কে বাস্তব-ঘেঁষা রেখাচিত্র, ইত্যাদি ব্যাপারে মাইকেল যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহার পরিচয় বহন করিয়া সপ্তম সর্গ এই যুদ্ধ-কেন্দ্রিক কাহিনী কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই যুদ্ধ-আবহাওয়ার প্রচ্ছদপট-রচনাতেও কবি-কল্পনার আয়াস ও প্রয়াস যেমন লক্ষণীয় হইয়াছে তেমনি সেই কল্পনার বহরেও পাওয়া যায় কবির দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব। একটি দৃষ্টান্ত :— রক্ষঃকুলরাজ-লক্ষ্মী যখন ইন্দ্রের নিকট তাঁহার নিজস্ব আয়োজনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভঞ্জন-আদি দিক্‌পালগণের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ইন্দ্র বলিতেছেন,—

"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে দিকপালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে ?—
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি ; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে !"

যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী গুরুত্ব অঙ্কনের এই যে দুরন্ত প্রয়াস ও ইহার অন্তরালবর্তী যে কল্পনা ও পরিকল্পনার বহর তাহা মাইকেল প্রতিভার উচ্চতা ও স্বকীয়তাই প্রতিপন্ন করে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য যে দৈবপ্রভাবের সমাবেশ, তাহাতে এই সর্গের উপযোগিতা কিছু না বাড়িলেও, মহাকাব্যোপযোগী বিস্তার ও বৈচিত্র্যবিধানে উহা কিঞ্চিৎ সহায়ক হইয়াছে বলিতে হয়।

এই ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ির কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই কথাই মনে হয়, সপ্তম সর্গটি প্রধানত রাবণের বীরত্বের চিত্র হইয়াও অতিমাত্রায় দেবতার আমদানীতে কিঞ্চিৎ বিড়ম্বিত। মহাদেব হইতে আরম্ভ করিয়া 'মহী'-দেবী পর্যন্ত একযোগে বহু দেবতা আসিয়া এখানে ভিড় জমাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, কৈলাসেশ্বর মহাদেব ও বৈকুণ্ঠবিহারী মাধব ব্যতীত যোগদানকারী

কিন্তু এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলালের বিশ্লেষণে কবির এই লক্ষ্মণ-চরিত্র-চিত্রণের অনেক যৌক্তিকতা ফুটিয়াছে। [এই প্রসঙ্গে 'মেঘনাদ কাব্যে চরিত্রসৃষ্টি' পর্যায়ের লক্ষ্মণ-চরিত্রের বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।] তাঁহার প্রতিপাদ্য হইল, মধুসূদনের কল্পলোকে লক্ষ্মণ-চরিত্রটি যে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় মণ্ডিত। লক্ষ্মণকে তিনি রামায়ণের একটি অসাধারণ জীবন্ত, বীর্যবান ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্ররূপেই দেখিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্মণ ধর্মভীরু নয় বরং ধর্মবলদৃপ্ত; তাঁহার দেবভক্তি ন্যায়নিষ্ঠারই নামান্তর। ইন্দ্রজিৎ যেমন বীরধর্মের একনিষ্ঠ সেবক, লক্ষ্মণ তেমনি ন্যায়ধর্মের উদ্ধার করিতে দৃঢ়পণ ও একাগ্রমনা। মধুসূদন তাঁহার কাব্যে সর্বত্র লক্ষ্মণকে এক বিশিষ্ট গৌরব দান করিয়াছেন। লক্ষ্মণ এ কাব্যে প্রায় সর্বত্র 'সৌমিত্রি কেশরী' ও 'দেবাকৃতি রথী'। কিন্তু এই গৌরব ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে গিয়া মধুসূদন বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

লক্ষ্মণের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে কবির কল্পনার মুখ্য অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। ইন্দ্রজিতের নিধন লক্ষ্মণের হাতেই হইতে হইবে, অথচ ইন্দ্রজিৎ অজেয়—একরূপ অমর বলিলেই হয়। বাল্মীকির রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ দুর্জয় হইলেও অজেয় নয়; নিকুম্ভিলা নামক একরূপ যাদু বা মায়া-ঘটিত প্রক্রিয়ার দ্বারাই সে বার বার অজেয় হইয়া উঠে। মধুসূদনের মেঘনাদ এত ছোট নয়; সে নিজ শক্তিতেই অজেয়প্রায়। অতএব এই ইন্দ্রজিতকে যে বধ করিবে তাহাকে নায়কের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে অসাধারণ বীরও হইতে হইবে আবার কাপুরুষের কলঙ্ক-স্পর্শও বরণ করিতে হইবে। বস্তুত মেঘনাদের এই হত্যা-ব্যাপারটিকে দুরূহ ও দুঃসাধ্য করিবার জন্য কবি-কল্পনা সর্বাধিক আয়াস স্বীকার করিয়াছে, যিনি 'দেবাকৃতি রথী' 'তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী', যাঁহার চরিত্র-বল, হৃদয়-বল, সাধন-বল ও বীরত্বের চরম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে চণ্ডীর কাননে, তাঁহারই মুখে বসাইতে হইয়াছে কাপুরুষোচিত উক্তিঃ

'আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি—
অবোধ, তেমতি তোরে ………………
……মারি অরি, পারি যে কৌশলে!

লক্ষ্মণ এখানে এমন নীতির আস্ফালন করিতেছে, যাহা কোনো ক্ষত্রিয় বীরের মুখে কোনো অবস্থাতেই শোভা পায় না। কিন্তু পরম কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়, মধুসূদন তাঁহার লক্ষ্মণকে এই পর্যায়ে অবনমিত করিতে বহু ইতস্তত: করিয়াছেন, বহু সন্তর্পণে লেখনী চালনা করিয়াছেন। এই চরম উক্তিটির পূর্বে লক্ষ্মণকে আমরা বলিতে শুনি, "দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!' আবার হত্যার পরেও বিভীষণকে সান্ত্বনা দান প্রসঙ্গে লক্ষ্মণকে বলিতে শুনা যায়,—"বিধির বিধানে বধিনু এ যোধে আমি,—"। অর্থাৎ এই কার্যের ভালমন্দের দায়িত্ব দেবতাদের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি যেন নিষ্কৃতি পাইতে চান। মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রায় সমস্ত চরিত্রের মতই তিনিও যে এক দুর্জ্ঞেয় দৈবশক্তির হাতের যন্ত্রস্বরূপ তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে এইখানে। তবে যেহেতু কৃতকর্মের দ্বারাই কর্মীর পরিচয়, সেইহেতু লক্ষ্মণের দুর্নামের হাত হইতে অব্যাহতি নাই। যাহাই হউক লক্ষ্মণ-চরিত্রটি সম্পর্কে কবি-মানসের নিখুঁত সন্ধান যিনি পাইয়াছেন তিনি বুঝিবেন, লক্ষ্মণের প্রতি এই

অবিচার যে কারণেই হউক বা যেমনই হউক, এই চরিত্রের প্রতি কবির সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা যে আন্তরিক ও অকৃত্রিম ইহা সন্দেহাতীত। নিতান্ত বিপদে পড়িয়াই তিনি উহাতে কলঙ্কস্পর্শ ঘটাইয়াছেন। ইন্দ্রজিতকে কবি যদি আর্যরামায়ণকারের দৃষ্টিতে দুর্ধর্ষ রাক্ষসমাত্র বলিয়া দেখিতেন তবে আর এই বিপদের কথা উঠিত না, কিন্তু তাহাতে তো তাঁহার কাব্যের মূল পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়। মেঘনাদ-চরিত্রটির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষকে আর্যরামায়ণের সংস্কারের ভস্মাবলেপ হইতে মুক্ত দীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রোজ্জল করিয়া তোলাই এই কাব্যে কবির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সমগ্র কাব্য-সহিত্যে মেঘনাদ এক অপূর্ব সৃষ্টি। মেঘনাদ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ও অকলঙ্ক। "এ চরিত্র নিদাঘ দিবার মত দীপ্ত ও নির্মল, কোনখানে মেঘ বা কুয়াসার লেশমাত্র নাই। ইহার অন্তঃকরণে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-প্রশ্ন-সংশয় নাই, নৈরাশ্য নাই,—প্রেম-ভক্তি-বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রস্ফুট কুসুমে কোথাও চিন্তাকীট প্রবেশ করে নাই। আর্যরামায়ণের মেঘনাদের সেই দৃপ্ত পশুবল, মধুসূদনের মেঘনাদের অপর সকল মহৎগুণের সমবায়ে আজ অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।—মায়ের দুলাল, পিতার নয়নমণি, পত্নীর কণ্ঠহার, শত্রুর দুঃস্বপ্ন এই মেঘনাদ, সলিল-অগ্নি-মরুতের সন্নিপাতে মেদুর মেঘকান্তির মত নয়ন-মনোহর হইয়াছে। মেঘনাদের বীরত্বের মূল উপাদান হইয়াছে—তাহার নিরতিশয় ভয়শূন্যতা, শক্তি-মদমত্ততা নয়- অসীম বাহুবল ও হৃদয়বলের অমোঘতায় বিশ্বাসই ইহার কারণ। আরও কারণ, মেঘনাদ ক্রূরতা বা কপটতায় বিশ্বাস করে না, জগতকে সে আত্মবৎ বীরধর্মী মনে করে।—রাবণের মনে বিধি নামক যে দুর্জ্ঞেয় বিরুদ্ধ শক্তির চেতনা জন্মিয়াছে, তাহার মনে সে চেতনাও নাই। মনের সারল্য ও প্রাণের এই নির্ভীকতাই তাহার কর্তব্যকেও সরল করিয়াছে। তাহার ধর্মবিচার বিতর্কের ধর্ম নয়। তাহা স্বাভাবিক প্রাণধর্ম—পৌরুষের ধর্ম।"

মাইকেলের মত শক্তিশালী স্রষ্টা যে এমন উৎকৃষ্ট উপাদানবিশিষ্ট একটি চরিত্র পাইয়া কাব্যমধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? যে মেঘনাদের মৃত্যু রামায়ণে একটি উপদ্রবের শান্তি বলিয়াই বিবেচিত, মাইকেলের হাতে সেই মৃত্যুই পাঠকের করুণ অশ্রুধারা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে। কবি যে বলিয়াছেন, 'It cost me many a tear to kill him,"—অশ্রুকাতর-হৃদয়ে পাঠককেও তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। এ যেন এক অতিমানবীয় জীবনের নিষ্ঠুর নিয়তি। যৌবনের যে মহিমা ও হৃদয়ের যে স্বতস্ফূর্ত শক্তির নাম ইন্দ্রজিৎ, তাহারই হত্যাকাহিনী-মূলক দৃশ্যের অন্ধকারকে ঘনীভূত করিবার জন্য, ইহার মর্মগত ট্রাজেডিকে চকিত বজ্রদীপ্তি দান করিবার জন্য পূর্বাপর সকল আয়োজনই যথাযথ হওয়ায় এই চরিত্রটি সহজেই পাঠকের এক পরম আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে। আর এই যে আকর্ষণ-সৃষ্টি, ইহাতেই মধুসূদনের মৌলিকতা। [চরিত্রটির বিস্তারিত আলোচনা 'চরিত্র-সৃষ্টি' পর্যায়ে দ্রষ্টব্য]

২৩। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত দৈব ও নিয়তি-প্রভাব লইয়া আলোচনা কর।

উত্তর। হোমরের পরম ভক্ত ও অনুরাগী বলিয়া মাইকেলের নিয়তিবাদ বা অদৃষ্টবাদকে প্রথম দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গ্রীককাব্য হইতে আমদানী করা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সেই প্রসঙ্গে একথাটিও স্মরণীয়, গ্রীককাব্যের নিয়তি-প্রাধান্যই যে মেঘনাদবধ-এর কবিকে নিয়তিবাদী করিয়াছে, তাহা নহে।

মধুসূদনের কবি-মানস পাশ্চাত্ত্যের কাব্য-কলা যতই অনুকরণ ও অনুসরণ করুক, তাহার প্রকৃতিটি নিতান্তই বাংলার ও বাঙালীর। বাঙালী ধাতুতে গঠিত বলিয়া তাহার প্রবণতা কারুণ্যের দিকে, যে কারুণ্যের সহিত অদৃষ্টবাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ইহার উপর যুগ-প্রভাব তো আছেই। বাঙালী যে যুগে নবজাগরণের উন্মাদনায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে, মধুসূদন সেই যুগেরই সন্তান বলিয়া নিয়তির লীলা যেন তাঁহার চক্ষে অতি কঠোর দীপ্তিতে ধরা পড়িয়াছে। তবে মূলত তাঁহার অদৃষ্টবাদ প্রাচ্য সংস্কার ও বিশেষ করিয়া হিন্দু-মনোভাবের ফল। এ অদৃষ্টবাদ গ্রীক-কল্পনার অহেতুক দৈব-স্বৈরাচার নহে। মধুসূদনের দেবদেবীগণও এই অদৃষ্টের শাসন মানে, ইহার উপরে তাহাদেরও কর্তৃত্ব নাই। এ অদৃষ্ট এতই দুজ্ঞেয় যে শেষ পর্যন্ত ইহা হিন্দুরই কর্মবাদে আসিয়া দাঁড়ায়।

পঞ্চম সর্গে দেখা যায়, মানুষ অপেক্ষা দেবতারই আধিপত্য। ইহার প্রধান কারণ, নায়কের মাহাত্ম্য সমুন্নত দেখাইবার জন্য তাহার বধ-সাধনের 'উদ্যোগ' পর্বটিকে গুরুত্বপূর্ণ করিতে কবি বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। এখানকার মেঘনাদ রামায়ণের মত একটা রাক্ষসীয় উপদ্রবমাত্র না হইয়া সর্বগুণান্বিত আদর্শ বীরুপুরুষের ন্যায় মহিমান্বিত হওয়ায় তাহার বধ-কার্যটীকে যথাসম্ভব দুরূহ ও দুঃসাধ্য করিবার জন্য কবি প্রচুর দৈব শক্তির আমদানী করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, সেই দৈবশক্তিও এখানে স্বেচ্ছাচারী নহে। মানুষের মত দেবতারাও এক বিরাট ও ব্যাপক নিয়তি-প্রভাবের অধীন। "এখানকার যে বিধির বিধান তাহা এই ব্যাপকতার জন্যই দুজ্ঞেয় আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা কোন স্থূল দৈব হস্তক্ষেপ নহে; ইহা অতি সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান থাকিয়া এমনভাবে স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, যাহাতে সকলকেই যেন সেই এক বিরাট যন্ত্রীর হাতে যন্ত্ররূপে চালিত হইতে দেখা যায়। যে ভাবে মধুসূদন এই অলঙ্ঘ্য বিধি-বিধানের প্রভাব দেখাইয়াছেন, তাহাতে একহিসাবে কোনো অবাঞ্ছনীয় ঘটনার জন্য কোন দেবতাকেই দোষ দিবার উপায় নাই। কারণ, সকলেই, দেখা যায়, সেই অলঙ্ঘ্য বিধানের দোহাই দিতেছেন। যে মায়াদেবী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ, তিনি যখন ইন্দ্রের পুরীতে সর্বপ্রথম মেঘনাদবধের পন্থা বিশ্লেষণ করেন, তখনই তাঁহার মুখে আমরা শুনিতে পাই, "বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?" অতঃপর তাঁহার পরিকল্পনানুযায়ী যাহা কিছু ঘটিল, সমস্তই নিয়তির লীলা বলিয়া ধরিতে হইবে। স্বপ্নদান পর্যন্ত শেষ হইল; এইবার আসিল দৈব-নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের কাজের পালা।" স্নেহবৎসল রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ভয়ঙ্কর পরিবেশে আবদ্ধ চণ্ডীর দেউলে পাঠাইতে একান্তই অনিচ্ছুক। লক্ষ্মণের উপর তাঁহার যে অত্যাচারের আর শেষ নাই। কিন্তু তিনি কি করিবেন? তিনিও যে নিয়তির অধীন। তাঁহার মুখে আমরা শুনি, "কেমনে লঙ্ঘিব দৈবের নির্বন্ধ, ভাই?"

অথচ লক্ষ্মণকে কবি যতই উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গড়িয়া পিটিয়া লউন তবু তাঁহার নায়ক মেঘনাদ যে কাহারও হাতে পরাজিত হইবার নহে এই আদর্শটি অম্লান রাখিবার জন্য উদ্যোগ-পর্বে কবি লক্ষ্মণের কঠিন পরীক্ষা ছাড়াও ঐ স্বপ্নাদেশ, চণ্ডীপূজা, চণ্ডীর বরলাভ, এক কথায়, এক ব্যাপক দৈব ষড়যন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। চণ্ডীও আবার শিবের আদেশে এই উদ্যোগে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, যে শিব স্বয়ং 'বিশ্বনাথ' হইয়াও দ্বিতীয় সর্গেই এই উদ্যোগের পূর্বকৃত্যে জড়িত হইয়া

নিজমুখে বলিয়াছেন, 'হায়, দেবি, দেবে কি মানবে, কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?' এইভাবে এক সর্বনিয়ন্তা শক্তিই যদি চক্রান্তের অংশীদার হইয়া পড়েন, তবে যতই অসাধারণ শৌর্যবীর্যের অধিকারী হউক না কেন মেঘনাদকে অসহায় না হইয়া আর উপায় নাই। তাই মেঘনাদ যজ্ঞশালা অভিমুখে যাত্রা করিলে প্রমীলা যখন বিলাপ করিতে লাগিল, তখন কবি "প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?" এই মন্তব্যের দ্বারা আর একবার নিয়তির প্রসঙ্গ তুলিয়া পাঠকের অন্তর মেঘনাদের জন্য ব্যথিত করিয়া তুলিলেন।

পঞ্চম সর্গে যে নিয়তির ব্যাপক মহড়া চলিয়াছে ষষ্ঠ সর্গে দেখা যায় তাহারই ফলিত রূপ। ষষ্ঠের ঘটনা-রূপটি পঞ্চমেরই ছাঁচে ঢালা। যে 'প্রাক্তনের গতি' লক্ষ্য করিয়া পঞ্চম সর্গে কবি-হৃদয় হায় হায় করিয়া উঠিয়াছে ষষ্ঠ সর্গে তাহারই অনিবার্য পরিণতি করাল মূর্তি ধারণ করিয়াছে। ঘটনার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি চরিত্র ঠিক সেই এক অন্ধ নিষ্ঠুর নিয়তির অদৃশ্য ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে দেখা যায়।

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আসল বধ-সাধনের জন্য অভিযানের সময় আসিলে রামচন্দ্র পুনরায় দ্বিধাগ্রস্ত হইতেছেন। অনুজের বিপদাশঙ্কায় তাঁহার ভ্রাতৃবৎসল হৃদয় কম্পিত কুণ্ঠিত না হইয়া পারে না। মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে,—"নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাসে।" তাঁহার এখনও মনে হয়, 'মায়াবিনী আশা'র ছলনায় ঘুরিয়া মরিতেছেন। কিন্তু 'সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী' তাঁহাকে দৃঢ় করিয়া দিল, ভবিষ্যৎ বিজয়ের ইঙ্গিতও ছবির মত চোখের সামনে তুলিয়া ধরা হইল। সুরু হইল মারাত্মক অভিযান। কিন্তু পদে পদে দৈব-প্রভাব, যার অন্তরাত্মায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় এক বিরাট নিয়তি-শক্তির নিয়ন্ত্রণ। মায়াদেবী আসিয়া রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মীকে তাঁহার তেজ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলে পরম ভক্ত রাবণের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিলেও তিনি মায়ার আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু কতই না কুণ্ঠার সহিত,—"সম্বরিব, দেবি, তেজঃ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?"

যে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ রাবণের সর্বনাশ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া চলিয়াছেন, রাবণের বৈভব ও মহিমাদর্শনে তাঁহারাও কতই না কাতর। বিভীষণের চিত্তও টলিয়া উঠে, কিন্তু লক্ষ্মণকে শক্ত রাখিবার জন্য, আত্মকৃত কার্যেরও সমর্থনের জন্য তিনি আবৃত্তি করেন,—"কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে। এক যায় আর আসে, 'জগতের রীতি"—প্রকারান্তরে সেই বিধির বিধানের কথা সেই অদৃষ্টবাদের কথা। মেঘনাদ যখন লক্ষ্মণকে কিছুতেই রামানুজ বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহেন না, স্বীয় আরাধ্য বিভাবসুই কৌতুকবশত লক্ষ্মণের মূর্তিতে আবির্ভূত মনে করিয়া—"বিলম্বিলে আমি, ভগ্নোত্তম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"—বলিয়া ভক্তের আকুল প্রার্থনা জানাইলেন, তখন লক্ষ্মণও বুঝি শত্রুর সেই চারিত্রিক মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন, এবং "দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!" ইত্যাদি ভাষণে দেবতার দোহাই না পাড়িয়া নিজেকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। হত্যার পরেও বিলাপকাতর খুল্লতাত বিভীষণকে সান্ত্বনাদান প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"বিধির বিধানে বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে তোমার" অর্থাৎ উভয়েরই চলাফেরা কার্যকলাপ, উভয়েরই ভালমন্দ ন্যায়ান্যায় সমস্তই বিধির বিধানে নিয়ন্ত্রিত।

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, বিজেতা ও বিজিত, উভয়েই মায়ার হাতের ক্রীড়নক। মায়াশ্রয়ী হইয়াও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের কোষার আঘাতে ভূতলশায়ী এবং একান্ত অসহায়, অথচ ইন্দ্রজিতেরও মায়াকে পরাভূত করিবার কোন শক্তি নাই ;—"মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে" নানা ভয়াবহ দৃশ্য এবং অবশেষে "বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা রাহুগ্রাসে!" মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকেও, "কি পাপে বিধাতা দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?" ইত্যাদি উক্তিতে বিধির বিধানের কাতর উল্লেখ করিতে শুনা যায়।

এইভাবে আমরা যখন মেঘনাদবধ-কাব্যের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে দৈব ও নিয়তি-প্রভাবের আধিপত্য লক্ষ্য করি তখন ইহার পশ্চাতে সক্রিয় কবি-মানসটির পরিচয়ে বলিতে হয় যে উহা শুধু সেই লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ঘটনা বিশেষ নহে, সমগ্র মানবজীবনেই যে নিয়তির দুর্নিবার প্রভাব, তাহারই ব্যাপকতায় ও নিষ্ঠুর প্রচণ্ডতায় যেন অভিভূত। নিয়তি যেন তার অদৃশ্য ও অনির্দেশ্য করাল হস্তে রক্ষোরাজ রাবণ ও তৎসহ সমগ্র রাক্ষসজাতিকে মৃত্যুর অন্ধতমসার দিকে ধীর ও দৃঢ় গতিতে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। তার ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কাছে পাপপুণ্যের ন্যায়ান্যায়ের বিচার তুচ্ছ,—দানবীয় বা মানবীয় যে কোনো শক্তি যেন তার একটি আঘাতেই ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে বাধ্য। তাই ধর্মের পথে, ন্যায়ের পথে ও বীরের পথেই যাহার অকম্পিত জয়যাত্রা, সেই মহাবীর ইন্দ্রজিতকেও স্বীয় যজ্ঞাগারে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যায় সমরে নিহত হইতে হইল। ইহাকে নিয়তির অন্ধ নির্মমতা ছাড়া আর কি বলিয়াই বা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে?

এখানে স্বতঃই মনে হয়, একটি গভীর বিয়োগান্ত কাব্য রচনার জন্যই মধুসূদন রামায়ণ হইতে লঙ্কাকাণ্ডের একটি অধ্যায় বাছিয়া লইয়া তাহাকে নিজ প্রতিভাবলে নূতনরূপে নূতনভাবে প্রাণবন্ত করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন। মূল কাহিনীটি বাল্মীকির রামায়ণেরই অনুরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবের দিক দিয়া মেঘনাদবধ মাইকেলের অনবদ্য নবীন সৃষ্টি। এই সৃষ্টির তাগিদেই মাইকেল বাল্মীকির অতি সুস্পষ্ট পাপ-পুণ্য-বিচার প্রায় সম্পূর্ণ এড়াইয়া গিয়া অন্ধ ও নিষ্ঠুর নিয়তিকে টানিয়া আনিয়াছেন, নতুবা করুণ রস গাঢ় হইয়া উঠে না। প্রায় সকল ঘটনার মূলেই অদৃশ্য শক্তির কঠোর হস্ত। নিয়তির এই নিষ্ঠুরতাই বিয়োগান্ত কাব্যের করুণ রস জমাইয়া তুলিয়াছে। কাব্যের এই গুরু প্রয়োজনেই মাইকেল চির-পরিচিত রামায়ণের চরিত্রগুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন এবং ঘটনার গতি মোটামুটি ঠিক রাখিয়াও তাহাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। কবির এই সাফল্যেই মেঘনাদবধ-এর ট্রাজেডি এমন গভীর ও করুণ হইয়াছে, আর এইখানেই ফুটিয়াছে মাইকেলের প্রতিভার মৌলিকতা।

২৪। মেঘনাবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গটি অবলম্বনপূর্বক বিভীষণ-চরিত্র বর্ণনা কর।

উত্তর। রামায়ণ বিভীষণকে ধর্মভীরু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে; এবং এই ধর্মের জন্যই তাঁহাকে অত্যাচারী ভ্রাতা, আত্মীয়-পরিজন ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ধর্মাশ্রয়ী রামচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল—এমন বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। মধুসূদনও বিভীষণের স্বপক্ষ-ত্যাগের এই যুক্তি আশ্রয় করিয়াছেন। বিনাদোষে রাবণ যখন রামের পত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিলেন,

এবং তাহার পর রামচন্দ্র সসৈন্যে সাগরের বুকে সেতু নির্মাণ করিয়া জলরাশি অতিক্রম করিয়া লঙ্কার দ্বারে আসিয়া বসিলেন, সেই সময়ে ইনি একদিন রাজসভায় আসিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সীতা প্রত্যর্পণ করিবার উপদেশ দেন। দম্ভের মূর্তবিগ্রহ রাবণ অনুজের হিতোপদেশে কর্ণপাত করিলেন না; উপরন্তু ক্রোধান্ধ হইয়া সেই সভাতেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে বিভীষণ স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, সোনার লঙ্কা—সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়া রামের পক্ষে যোগ দিলেন।

সীতাহরণ রাবণের পক্ষে যেমন একটা মস্ত অপরাধ প্রকাশ্য রাজসভায় ছোট ভাইকে পদাঘাত করিয়া অপমান করাও তেমনি আর একটি গুরুতর অপরাধ। পাপাচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া রাবণের ন্যায় দুর্ধর্ষ নরপতির সম্মুখে গিয়া প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া সত্যের পথ ধর্মের পথই যে বিজ্ঞের একমাত্র লক্ষ্য এরূপ নির্দেশদান ও নিঃশঙ্ক ঘোষণার মধ্যে বিভীষণের যে পৌরুষ ফুটিয়াছে তাহা বাস্তবিকই বীরোচিত, মহান্, সুতরাং প্রশংসার যোগ্য। এক্ষেত্রে রাবণের প্রতি ক্রোধ এবং বিভীষণের প্রতি সমবেদনা, পাঠকচিত্তে উদ্রিক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু বিভীষণের শেষের আচরণে সকলের চিত্ত তাঁহার প্রতি ঘৃণায় একেবারে বিরূপ হইয়া উঠে, এবং রাবণের সকল দোষের কথা ভুলিয়া তাঁহার প্রতি করুণায় ও সমবেদনায় আর্দ্র হইয়া আসে। পাপ যাহা তাহা চিরকালই ঘৃণার্হ ও বর্জনীয় - কিন্তু পাপী নহে। ধার্মিক বিভীষণ কিন্তু এমনি ধার্মিক যে তিনি ইহার দিক দিয়াও গেলেন না। রাবণ অনিষ্টকারী, রাবণ অত্যাচারী, তিনি তাঁহার অবমাননা করিয়াছেন—অতএব তাঁহার ন্যায় সত্যাশ্রয়ীর কাছে রাবণ অবশ্যই বর্জনীয়। কিন্তু রাবণের সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রীপুত্র এবং সকলের উপর স্বীয় জন্মভূমি—এসকল ত্যাগ করিলেন কেন? আর শুধু ত্যাগ করা নহে—স্বহস্তে তিনি ইহাদের সর্বনাশ সাধন করিলেন কেন?

লঙ্কার সুরক্ষিত পুরীর দ্বারদেশে রাম চিরকাল বসিয়া থাকিলেও পুরী প্রাচীর তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেন না। ঘর-সন্ধানী বিভীষণকে স্বীয় পক্ষে লাভ করিতে না পারিলে রামচন্দ্রকে হয়তো সীতা উদ্ধার না করিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইত। বিভীষণই তাঁহার কাছে আসিয়া লঙ্কায় কে কি রকমের বীর, কাহার কোথায় দুর্বলতা ইত্যাদি সংবাদ দিয়া রামকে লঙ্কা ধ্বংসের জন্য সক্ষম করিয়া তুলেন। শেষে ইনিই পুরীর গুপ্ত পথ দিয়া লক্ষ্মণকে একেবারে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইয়া গিয়া নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতের হত্যাসাধন করেন।

বিভীষণচরিত্র অঙ্কনে মধুসূদন একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এই যে জন্মভূমি শ্মশানে পরিণত করা, দেশের স্বাধীনতা নাশের কারণ হওয়া, ও নিজের হাতে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মৃত্যু রচনা করা, এগুলি ধর্মের নামে, সত্যাশ্রয়ীর কাজ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বিভীষণ যদি সত্যসত্যই সত্যাশ্রয়ী হইতেন, তাহা হইলে পাপাচারী ভ্রাতাকে ছাড়িয়া পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেন, এই পর্যন্ত। একের অপরাধে অমন করিয়া নির্দোষ আত্মীয়-স্বজনের সর্বনাশের কারণ হইতেন না এবং জন্মভূমিরও সর্বনাশ ঘটাইতেন না। মধুসূদনের দৃষ্টিতে বিভীষণের চরিত্রের এই দিকটি বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া, রামের পক্ষে তিনি যে কেবল সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য যোগদান করেন, এমন নহে। বিভীষণের অন্তরে, সকলের অগোচরে আর একটি ইচ্ছা প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল। তিনি মনে মনে লঙ্কার সিংহাসনে বসিবার আশা পোষণ করিতেন। তাই আমরা

দেখিতে পাই যে, ইন্দ্রজিৎ-বধের প্রাক্কালেই, বিভীষণ এক স্বপ্ন বৃত্তান্তের ভিতর দিয়া লঙ্কার শূন্য সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে রামচন্দ্রকে আশ্বাস দিতেছেন। সম্ভবতঃ সেই উদ্দেশ্যেই 'ভাবী কর্ব্বূররাজ' লক্ষ্মণকে লঙ্কার গুপ্ত পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

বিভীষণেরা যাহাতে চিরদিন পৃথিবীতে ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকে সেইজন্য কবি ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়া তাঁহার খুল্লতাতের উদ্দেশে যে সব কথা বলাইয়াছেন, তাহার মধ্যে বিভীষণের চরিত্র সমগ্রভাবে ধরা দিয়াছে। ষষ্ঠ সর্গে বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উক্তি এমনই নিন্দাসূচক যে, তাহাতেই চরিত্রটি চিরকালের মত ধিক্কৃত হইয়াছে। বিভীষণ যখন অম্লানবদনে বলিলেন যে, তিনি রাঘবের দাস, তখন বাসববিজয়ী ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে খুল্লতাতের উদ্দেশে যে ধিক্কার-বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, আবেগ ও যুক্তির সংমিশ্রণে তাহা, এক কথায়, 'অনবদ্য'। ইন্দ্রজিতের এই ধিক্কার-বাণীর ভিতর দিয়া বিভীষণের চরিত্রটিকে কবি যে ভাবে পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বদেশের বিভীষণদের প্রতি প্রযোজ্য। মধুসূদন ভারতের ইতিহাসের একজন কত বড় গভীর পাঠক ছিলেন, তাহা তাঁহার সৃষ্ট এই বিভীষণ চরিত্রটি আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

২৫। মেঘনাদবধ কাব্যে লঙ্কার ঐশ্বর্য বর্ণনার সার্থকতা কোথায়?

উত্তর। দৈব-অস্ত্রে সুসজ্জিত লক্ষ্মণ যখন ইন্দ্রজিতকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে বিভীষণকে সঙ্গে লইয়া লঙ্কাপুরীতে যাত্রা করেন, তখন প্রথমেই 'সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে চতুরঙ্গ বল দ্বারে।' স্বর্ণসৌধ-কিরীটিনী লঙ্কার ঐশ্বর্য বর্ণনায় কবি-কল্পনার যে বর্ণাঢ্য সমারোহ আমরা লক্ষ্য করি, তাহা মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাধর কবির পক্ষেই সম্ভব। কাব্যের আরম্ভেই স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্যের একটি অপূর্ব বর্ণনা আছে। প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়া রাবণ দেখিতেছেন ঃ

"মনোহরা পুরী!—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ ছটা;
তরুরাজী; ফুল-কুল চক্ষু-বিনোদন,
যুবতী-যৌবন যথা; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতনে পূর্ণ।"

রাবণের স্বর্ণলঙ্কাকে স্বর্গের অপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া কবি একদিকে যেমন তাঁহার কল্পনার বর্ণাঢ্যতা দেখাইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য-প্রিয়তারও আভাস দিয়াছেন। রাবণকে বড় করিয়া দেখাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

লক্ষ্মণ ইতঃপূর্বে লঙ্কার ঐশ্বর্যময় রূপ প্রত্যক্ষ করেন নাই। তাই বিভীষণের সঙ্গে পুরীর প্রাচীরে উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। লঙ্কা শুধু মর্ত্যের অমরাবতী নহে, ইহার অপার্থিব সৌন্দর্যের সহিত মিশিয়া আছে অজেয় পৌরুষ ও বীরত্ব। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা শুধু সৌন্দর্যের স্বর্গ হইতে পারে না—ইহা মনে করিয়াই কবি লক্ষ্মণের দৃষ্টিপথে যে চিত্র

উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া রামানুজের বিস্ময় লাগিবার কথা। লঙ্কাপুরীর দ্বারদেশে চতুরঙ্গ বল ঃ

"মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদিবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য ; অজেয় সংগ্রামে।"

সভয়ে সেই দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া লক্ষ্মণ অগ্রসর হইলেন। যতই তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার দৃষ্টিপথে লঙ্কার সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। নীরবে তিনি তাঁহার দুই পার্শ্বে স্বর্ণপুরীর অপার সৌন্দর্য নয়নমন দিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন ঃ

"শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা
মণ্ডিত রতনে।"

কিন্তু এইখানেই লঙ্কার সৌন্দর্য বা ঐশ্বর্যের শেষ নহে। লক্ষ্মণ আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ঃ

"ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া।"

অবশেষে কবি লক্ষ্মণের মুখ দিয়া বলাইলেন—"এহেন বিভব, আহা, কার ভবতলে" এবং নিজে "লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে"—এই কথা বলিয়া রাবণের স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্যের যে ইঙ্গিত প্রদান করিলেন, তাহারই মধ্যে তিনি স্বর্ণসৌধকিরীটিনী লঙ্কাপুরীর সমগ্র ঐশ্বর্যকে এক কথায় পাঠকের নিকটে মেলিয়া ধরিয়াছেন।

রাবণের লঙ্কাপুরীর এমন সমারোহপূর্ণ বর্ণনার আর একটি উদ্দেশ্য কবির থাকিতে পারে এবং কাব্যের পক্ষেও তাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। রাক্ষস এবং রাক্ষস-রাজের প্রতি পক্ষপাতমূলক সহানুভূতিই হইল মেঘনাদবধকাব্য-রচনার নেপথ্য প্রেরণা। তাঁহার সৃষ্ট রাবণ তথাকথিত হীন রাক্ষস নহেন। তিনি পৌরুষের প্রতীক, বীরত্ব ও বীর্যের সাকার বিগ্রহ। বিধির বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহার অজেয় পৌরুষ ও দৃপ্ত বীরত্বের গৌরীশৃঙ্গে। এ হেন যে রাবণ, তাঁহার লঙ্কাপুরী যদি ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয় না হয়, তাহা হইলে রাবণ-চরিত্রের বীরত্ব ও দম্ভের কোন অর্থই হয় না। দ্বিতীয় কথা, রাবণের ট্রাজেডি অঙ্কিত করাই হইল মেঘনাদবধ কাব্য-রচনার মূলগত প্রেরণা। এই ট্রাজেডিকে মর্মস্পর্শী করিবার জন্য প্রয়োজন হইল নায়কের মহত্ত্ব ও বিরাটত্বকে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তোলা। কারণ সামান্য মানুষের পতন আমাদের

মনে যে কারুণ্যের সুর জাগায়, অসামান্যের পতন তাহা অপেক্ষা আরও গভীরতর কারুণ্যে আমাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে। তাই রাবণের হাহাকারকে আমাদের অন্তরে চির-ধ্বনিত করিতে হইলে কবির প্রয়োজন হইল, রাবণ যে কত বিরাট, কত মহৎ, কত অসামান্য, তাহার হৃদয়গ্রাহী চিত্র অঙ্কন করা। লঙ্কার ঐশ্বর্য-বর্ণন রাবণের এই স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের মূল্যবান উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ করিয়াছে। তাছাড়া, কাব্যাংশকে পাঠকের নিকট উপভোগ্য করিয়া তুলিবার পক্ষে ঐশ্বর্যের এই বর্ণাঢ্য বর্ণনা একটি মূল্যবান উপকরণ, ইহা মধুসূদন বিলক্ষণ জানিতেন। লঙ্কাপুরীর এই বিচিত্র বর্ণনা না থাকিলে সমগ্র কাব্যখানি এমন উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় হইত কিনা সন্দেহ। তাই কাব্যের প্রয়োজনেই এই ঐশ্বর্য-বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

২৬। মেঘনাদবধ কাব্যের রাম চরিত্রটির একটি রসগ্রাহী বিশ্লেষণ দেখাও।

উত্তর। পূর্বলিখিত 'চরিত্র-সৃষ্টি' দ্রষ্টব্য।

২৭। সপ্তম সর্গের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করিয়া এই সর্গের উপযোগিতা নির্ণয় কর।

উত্তর। 'মেঘনাদবধ' এই শিরোনাম যাহার ললাটে, সেই কাব্যে মেঘনাদ-বধই নিঃসন্দেহে প্রধান ঘটনা। সুতরাং ষষ্ঠ সর্গে সেই মেঘনাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের গুরুত্বও অন্তর্হিত হইল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সন্ধানী রসজ্ঞ দৃষ্টি যাঁহাদের, তাঁহারা ঠিকই বুঝিবেন, মেঘনাদ এই কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র হইলেও, প্রধান চরিত্র রাবণ। রাবণের ট্রাজেডি অঙ্কনই এই কাব্য-সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণার উৎস। তাই মেঘনাদের তিরোধানের পরেও কাব্যের গতি ব্যাহত হয় না, বরং তাহার প্রতিক্রিয়ায় সেই 'অটল শক্তি' রাবণের কী অবস্থা ঘটে জানিবার অধীর ঔৎসুক্যে পাঠক কাব্যের পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাকুলভাবে দৃষ্টিপাত করে। সপ্তম সর্গ সেই ঔৎসুক্য ও ব্যাকুলতা নিবৃত্তির প্রথম উপাদানসম্ভার লইয়া এই কাব্যে স্থান সংগ্রহ করিয়াছে।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কবি তাই এখানে রাবণ-চরিত্রের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় চিত্রিত করিয়াছেন, এবং এই চরিত্রায়ন ফুটিয়াছে ঘটনা-পরম্পরাক্রমেই, আকস্মিক বা খাপছাড়া ভাবে নহে। অর্থাৎ আমরা পরবর্তী ঘটনা হিসাবে লক্ষ্মণের শক্তিশেল-বৃত্তান্তও পাইলাম, রাবণ-চরিত্রের অন্যতম বিশিষ্ট রূপটিও দেখিলাম। এই দুইয়ের সামঞ্জস্যবিধান সপ্তম সর্গের একটি বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এখানকার যুদ্ধোদ্যম ও যুদ্ধের বর্ণনা এবং প্রকৃত বীররসের অবতারণা। তৃতীয় কথা, যে দৈব-প্রভাব মেঘনাদবধ-কাব্যের অন্যতম আলোচ্য বিষয়, এখানে তাহারও বিপুল সমাবেশ ঐ আলোচনার রসদ জোগাইয়াছে, আনুষঙ্গিকভাবে পাওয়া গিয়াছে বিচিত্র দেব-দেবীর নানা কৌতুকাবহ কাহিনী যাহার সূত্রে কবি-কল্পনারও চমৎকার লীলা উপভোগ্য হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে বিস্তার ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ তাহাও এই সূত্রে সপ্তম সর্গে লক্ষণীয় হইয়া দেখা দিয়াছে।

এই সকল বৈশিষ্ট্যের আলোকে এই সর্গের উপযোগিতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। প্রবলপরাক্রান্ত রাবণ প্রিয়তম পুত্রের শোকে এবং তাহাকে অন্যায়যুদ্ধে নিহত করার জন্য প্রচণ্ড ক্রোধে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিহিংসার প্রলয়ানল জ্বালিয়া দিবে এইটুকুই মাত্র সাধারণ প্রত্যাশা। কিন্তু মধুসূদনের

রাবণ যে ঐ সাধারণ প্রত্যাশার উর্ধ্বে অবস্থিত এক বিরাট পুরুষ ইহা বুঝাইবার জন্য সপ্তম সর্গে কবি-কল্পনার এক প্রশংসনীয় প্রয়াস দেখা যায়। শিবের পরম ভক্ত এই নৈকষেয়, ইহা আমরা পুর্বেই জানিয়াছি। কিন্তু সেই ভক্তির বহর যে কী রোমাঞ্চকর তাহা এইখানেই জানা যায়। রাবণের এই চরম বিপদে রুদ্রদেব অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে শুধু বীরভদ্রকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়া স্বয়ং সেই ভীষণ শোক-বার্তাটি রাবণের নিকট পৌছাইয়া দিবার ভার লইলেন তাহা নহে, শোকভার-বহন ও পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য তাঁহার ভক্তাগ্রগণ্যকে রুদ্রতেজে তেজস্বী করিয়া দিলেন। কত বড়ো সাধক হইলে তবে যে আরাধ্যের নিকট হইতে এমন ভাবে অযাচিত বরলাভ করা যায়, তাহাই চিন্তনীয়। এই রাবণ কেবল একটা দুর্ধর্ষ শক্তি নহে, অধ্যাত্মবলেও মহাবলীয়ান, যাহার বলে তিনি রাজসভায় বসিয়া প্রত্যক্ষ করেন যাহা পরম সাধকের কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ ঃ

‘দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া।’

এই দৈববল-লাভের দুর্লভ সাধনা ছাড়াও আরও বহুগুণের সমাবেশ দেখা যায় সপ্তম সর্গের রাবণ-চরিত্রে। প্রতিপক্ষ রামচন্দ্র যেখানে সামান্যতম ভাগ্যবিপর্যয়ে বিলাপকাতর হইয়া প্রায় কাজ ভুলিতে বসেন, রাবণ সেখানে সন্তঃপ্রাপ্ত নিদারুণ পুত্রশোকেও স্বীয় বীরকর্ম সম্পন্ন করিতে এতটুকু বিচলিত নহেন। এমনকি যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মন্দোদরী আসিয়া যখন তাঁহার পদতলে পড়িয়া শোকের প্লাবন বহাইয়া দিলেন, তখন সংযমের প্রতিমূর্তিস্বরূপ রাবণকে আমরা বলিতে শুনি ঃ

যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি ?

এ শুধু কঠিন রাক্ষস হৃদয়ের লৌহকঠোর সংকল্প নহে, এ হৃদয় যেমন বজ্র-কঠোর তেমনি কুসুম-কোমল, রুষ্টিমান মহাবীরপুরুষের পরম সম্পদ ; এখানে যেমন সংকল্পের কঠোরতা আছে তেমনি আছে পুত্রশোকবিহ্বলা পত্নীর প্রতি গভীর সমবেদনা, গভীর দরদ ও পর্যাপ্ত শ্রদ্ধা। একদিকে স্নেহাতুর পিতৃহৃদয়ের ইঙ্গিত, অপরদিকে খাঁটি বীরপুরুষের বীর-চরিত্রের সৌরভ, উভয়ের সম্মেলনে এই রাবণ মধুসূদনের এক অনন্য সৃষ্টি।

স্বল্প পরিসরের মধ্যে রাবণকে এখানে বহু বিচিত্র চরিত্রের সম্মুখীন করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রাবণেরই শৌর্যবীর্য ও চারিত্রিক গুণের উৎকর্ষ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। সর্বাগ্রে তিনি খুঁজিয়াছেন বজ্রপাণি পুরন্দরকে। সার্থক তাঁহার এই ব্যগ্রতা। যাঁহার কৌশলে পুত্রবর কপট-সংগ্রামে নিহত, ইন্দ্রজিতের ভয়ে যিনি লঙ্কামুখী হইতে সাহস পাইতেন না, এবং সম্প্রতি

অধিকাংশ দেব-চরিত্রেরই এই সর্গে মাইকেলের হাতে দুর্দশার একশেষ ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাবণের চিরপূজিত রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী। ইঁহাকে কিছুতেই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সমগ্র কাব্যকাহিনীর প্রায় সুরুতেই ইঁহাকে দেখা যায় কর্মব্যস্ত; কর্মটি, এক কথায়, ষড়যন্ত্র-রচনা. এবং এ ষড়যন্ত্র সেই রাবণেরই বিরুদ্ধেযে রাবণের প্রগাঢ় ভক্তি-ডোরে ও পূজার সমারোহে তিনি একেবারে স্বর্ণলঙ্কায় চিরদিন বাঁধা হইয়া আছেন। এখানেও তাঁহার সেই একই ভূমিকা। পাছে রাবণের বিনাশের আয়োজনে কোথাও কোনো ত্রুটি থাকে এইজন্য ছুটিয়াছিলেন ইন্দ্রপুরীতে। চারিদিকে আট-ঘাট বাঁধিয়া তিনি পুনরায় স্বমন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত একরকম সহনীয়; অতঃপর কবি যখন অঙ্কিত করেন, "বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে", তখন এই দেবীটিকে মনে হয় একটি কিম্ভূতাকিমাকার চরিত্র, পুতুলনাচের পুতুলের মত কবির উদ্ভট খেয়ালী কল্পনার নির্দেশে চলাফেরা করিতেছেন। ইঁহার অপেক্ষা 'মায়াদেবী' অনেক স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য; কারণ তাঁহাকে, আর যাই হোক, এইরূপ ভণ্ড-চরিত্রের অভিনয়ে লিপ্ত হইতে দেখা যায় না। মোট কথা, দেব-চরিত্র-চিত্রণে মাইকেলের কল্পনা যে রীতিমত একটা খেয়ালী শৈথিল্যে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে, তাহার পরিচয় এই সর্গেও রহিয়াছে। কেবলমাত্র বৈচিত্র্য ও বিস্তারের খাতিরে এই শৈথিল্যকে সহনীয় করিয়া লইতে হয়।

২৮। মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে একটি রসগ্রাহী আলোচনাপূর্বক ইহার বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। যে ছন্দে এই কাব্যখানি রচিত, তাহা বাংলা সাহিত্যে নূতন। কবি মধুসূদনই ইহা বৈদেশিক সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে আমাদের সাহিত্যে প্রবর্তিত করেন। ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান; ইহাতে আমাদের ভাষালক্ষ্মী যে কতখানি সমৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহা এককথায় বলিয়া বুঝাইবার নহে। এই ছন্দে প্রতিটি ছত্র চতুর্দশটি অক্ষরে গ্রথিত, এবং ছত্রগুলির শেষে মিল নাই। অন্ত্য অক্ষরে কোনরূপ মিল নাই বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইংরাজী সাহিত্যের যে ছন্দটিকে তিনি আমাদের বঙ্গসাহিত্যে আমাদের মত করিয়া গড়িয়া লন, তাহার ইংরাজী নাম Blank Verse.

মিত্রাক্ষর ছন্দই আমাদের কবিতাসাহিত্যের একমাত্র রূপ ছিল। তাহাতে প্রেমের শ্লথ অলস স্বপ্নময় ভাব, ব্যথা বেদনার করুণ মূর্ছনা,—এ সবই ফুটিত ভাল। বীরত্বের সাগর-গাম্ভীর্যে রুদ্রতার বজ্রগম্ভীর রোল—এসব আমাদের সাহিত্যে বাজে নাই, সে ছন্দে বাজিত না বলিয়াই বাজে নাই। বীরস্বভাব মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের সাধনা আরম্ভ করিয়াই এই অভাবটিকে বিশেষ করিয়া অনুভব করিলেন। সেই অভাব দূর করিবার জন্য তিনি আপনার অসামান্য প্রতিভাবলে বৈদেশিক ছন্দটিকে আপনার করিয়া আমাদের সাহিত্যের মধ্যে আনিয়া তাহার দ্বারা কাব্যসরস্বতীর এই অভিনব মূর্তি রচনা করিয়া তুলিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই ছন্দে প্রতি ছত্র চৌদ্দটি করিয়া অক্ষরে গঠিত। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যতি নির্ধারণ। ইহাতে ছত্রের সঙ্গে সঙ্গে বক্তার বক্তব্য শেষ হয় না; আবার ইহাতে একটি ছত্রের যে কোন স্থলে বক্তার বক্তব্যটি শেষ হইয়া যাইতে পারে। আর নয়ত সেটি ছত্রের পর ছত্র

ব্যাপিয়া ঘুরিয়া বজ্রকল্লোলে বাজিয়া চলে। প্রযুক্ত শব্দের ওজন বুঝিয়া হিসাব করিয়া এবং বক্তব্যের ঝোঁক কোথায় গিয়া শেষ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়া তবে ইহাতে যতিনির্দেশ করিতে হয়। বস্তুতঃ, যতি নির্দেশের উপরেই এই ছন্দের সার্থকতা নির্ভর করে। বড় বড়, ছোট ছোট,—নানান রকমের যতিনির্দিষ্ট কবিত্বময় বক্তব্যের ধ্বনি সমবায়ে এই ছন্দে এক সাগরকল্লোল বাজিয়া উঠে। ইহাই বীরত্বের গাম্ভীর্য ও রুদ্রতার বজ্ররোল পাঠকের চিত্তে বাজাইয়া তুলে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিতর দিয়া কবি প্রেমের মধুর ঝংকারও বাজাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহা মিত্রচ্ছন্দের প্রেমের ঝংকার নহে। মিত্রচ্ছন্দের ভিতর দিয়া যে প্রেম ঝংকৃত হইয়া উঠে, তাহা একটি শিথিল বিবশতায় সমাচ্ছন্ন; কিন্তু মধুসূদনের ছন্দের ভিতর দিয়া যে প্রেম জাগিয়াছে তাহার ভিতরে দৃঢ়তার একটি মেরুদণ্ড আছে,—শক্তি-জীবন্ত আত্মবিশ্বাসের বজ্র-বনিয়াদে তাহা সংস্থাপিত। রোদনের করুণ সুরও কবি তাঁহার এই নবপ্রবর্তিত ছন্দে বাজাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এ রোদন-ধ্বনি মিত্রচ্ছন্দের রোদনধ্বনি হইতে একটু পৃথক্। মিত্রচ্ছন্দের রোদন সর্বস্বহারার ভূমিতে লুটাইয়া রোদন; অমিত্রচ্ছন্দের রোদন সংযমের বন্ধনে নিগড়িত।

বঙ্গভাষার অন্তরের অন্তঃপুরে যে শক্তি নিহিত ছিল, মধুসূদন আপনার প্রতিভার তীক্ষ্ণ আলোকে তাহা আবিষ্কার করেন; এবং এই ছন্দের ভিতর দিয়া কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে তাহাকে জাগাইয়া গিয়াছেন। আমাদের সাহিত্যে তাঁহার এই দান চিরকাল বিজয়-বৈজয়ন্তীর ন্যায় তাঁহার কবি-গৌরব ঘোষণা করিবে। বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদনের এই যে সকলের চেয়ে বড় কাজ,—ছন্দোবৈচিত্র্যে বাঙালী পাঠকচিত্তের রুচিপরিবর্তন,—ইহার তুলনা নাই। আর নবছন্দ প্রবর্তনে তিনি মাতৃভাষার ভিতরকার মূর্ছিত মহাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া বঙ্গসরস্বতীর যে রাজ-রাজেশ্বরী মূর্তি আমাদের দেখাইয়াছেন, তাহারও তুলনা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাকে কবি সর্বত্র ছন্দের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়াছেন, তাই মধুসূদনের ভাষা সর্বত্র গম্ভীর, সাবলীল,—কল্লোল-গর্জনে তাহা গঙ্গোত্রীর স্রোতোধারার ন্যায় খরবেগে বহিয়া চলিয়াছে। ছন্দ ও ভাষার এই নব ভগীরথের সাধন তাই উত্তরকালের কবিদের আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়াছে।

২৯। মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে কবির প্রেতপুরী বর্ণনার সহিত কাব্যের মূল কাহিনীর সংগতি ও সার্থকতা কোথায়, বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যের মূল কাহিনীর সহিত অষ্টমসর্গীয় প্রেতপুরী বর্ণনার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই (কেবলমাত্র যেটুকু সম্পর্ক কবি রাখিয়াছেন তাহা হইল, শক্তিশেল দ্বারা আহত লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার প্রকৃত ঔষধ কি তাহা অবগত হইবার জন্য রামচন্দ্র প্রেত-পুরীতে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যাত্র করিলেন) কিংবা মূল কাহিনীর উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য ইহার বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুর সঙ্গে কাব্য একপ্রকার শেষ হইয়া গিয়াছে। যেটুকু বাকী ছিল, তাহা সপ্তম সর্গে শক্তিশেল দ্বারা আহত লক্ষ্মণের কাহিনীতে শেষ হইয়াছে। ইহার পর কাব্যের মূল কাহিনীর অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে—ইন্দ্রজিতের সৎকার। কিন্তু শক্তিশেলের পরেই সৎকার পর্ব যদি বর্ণিত হইত তাহা হইলে আয়তনের দিক্ দিয়া কাব্য আরো ক্ষুদ্র হইয়া পড়িত। সম্ভবতঃ কবি সেই আশঙ্কায় সপ্তম ও নবম সর্গ দুইটির মাঝখানে এই প্রেতপুরী সর্গটির

অবতারণা করিয়াছেন, এবং এই বর্ণনা, বর্ণনা হিসাবেই যে উপভোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, ইহা রসোত্তীর্ণ বলিয়া কাব্যের মূল রসকেও অনেকখানি ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। তবে এই প্রেতপুরী বর্ণনার মূল প্রেরণা কবির নিজস্ব নহে, ইহা তিনি পাইয়াছেন দান্তের কাব্য হইতে, মিলটনের chaos বর্ণনাও ইহাতে ছায়াপাত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাব্যে শুধু স্বর্গ ও মর্ত্যের উল্লেখ থাকিবে, নরকের কথা থাকিবে না, উনবিংশ শতাব্দীর কবি মধুসূদন ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই।

লক্ষ্মণের অচৈতন্য দেহ কোলে লইয়া যখন রামচন্দ্র সকরুণভাবে বিলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় কৈলাসে উমাকে বিষণ্ণবদনা দেখিয়া মহাদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিজন্য কাতর হইয়াছেন। তখন উমার মুখে তাঁহার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া, মহাদেব বলিলেন, রামচন্দ্রকে এখনি মায়ার সঙ্গে প্রেতপুরীতে পাঠাইয়া দাও। আমার কৃপায় রামচন্দ্র সেখানে সশরীরেই যাইতে পারিবে এবং সেইখানে তাহার সহিত পিতা দশরথের সাক্ষাৎ হইবে। তিনিই লক্ষ্মণের জীবনদানের উপায় পুত্রকে বলিয়া দিবেন।

ইহার পরই আমরা দেখিতে পাই যে, সকলের অলক্ষ্যে মায়াদেবী আসিয়া বিষাদগ্রস্ত রামচন্দ্রের কানে কানে কি বলিলেন; অমনি সুগ্রীব প্রভৃতির উপর লক্ষণের অচৈতন্য দেহ রক্ষার ভার দিয়া রামচন্দ্র মায়ার অনুগমন করিলেন। প্রথমে সিন্ধুতীর্থে স্নান করিয়া তিনি পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং তাহার পর ইষ্টদেবীর অর্চনাপূর্বক তিমিরাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথে মায়ার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরেই রামচন্দ্রের বিস্মিত দৃষ্টিপথে চিরনিশাবৃত সেই ভীষণপুরী দেখা দিল। বজ্রনাদে বৈতরণী নদী বহিতেছে। উত্তাল তরঙ্গসমাকুল সেই নদীর উপর রামচন্দ্র একটি অদ্ভুত সেতু দেখিতে পাইলেন। সেতুটি কখন দেখিতে অগ্নিময়, কখন বা ধূম্রাবৃত। লক্ষ লক্ষ লোক, কেহ হাহাকার করিয়া, কেহ বা উল্লাস সহকারে সেই সেতুর দিকে চলিয়াছে। মায়াদেবীকে এই বিচিত্র সেতুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন—মৃত্যুর পর সকলকেই এই সেতু অতিক্রম করিতে হয়। ইহা কামরূপী সেতু। পাপীর পক্ষে ইহা কষ্টদায়ক, আবার পুণ্যাত্মার পক্ষে ইহা প্রশস্ত, সুন্দর। যাহারা ধর্মপথগামী তাহারা সেতুপথে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বদ্বার দিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যায়। আর যাহারা পাপী, তাহাদিগকে দিবারাত্র মহাক্লেশে এই নদী সাঁতার দিয়া পার হইতে হয়।

সেই ভীষণ যমপুরীতে সোনার প্রদীপের মত মায়াদেবী অগ্রে চলিয়াছেন আর তাঁহার পিছনে চলিয়াছেন রামচন্দ্র। সেতুর নিকট রামচন্দ্র বিরাট মূর্তি দণ্ডপাণি এক যমদূতকে দেখিতে পাইলেন। সশরীরে মানুষ এদেশে কখনও আসিতে পারে না, অথচ রামচন্দ্র আসিয়াছেন ইহাতে যমদূতের ক্রুদ্ধ হইবার কথা। কিন্তু মায়াদেবীর হস্তে মহাদেবের ত্রিশূল দেখিতে পাইয়া যমদূত শান্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। দুইজনে বৈতরণী পার হইলেন। সম্মুখে একটি লৌহময় পুরী দেখিতে পাওয়া গেল। সেই পুরীর চারিদিকে রাশি রাশি চক্রাকৃতি অগ্নি ঘুরিতেছে। তোরণ পথে লেখা রহিয়াছে, এই পথ দিয়া পাপী দুঃখদেশে গিয়া চিরদুঃখ ভোগ করে।

তাহার পর প্রেতপুরীর দক্ষিণ দিকের বর্ণনা। ইহারই অপর নাম চৌরাশি নরক। এখানকার বর্ণনা সত্যই লোমহর্ষক—

"অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল, মেঘাবলী উগরিছে রোষে,
কালাগ্নি ; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে !"

সম্মুখে রৌরব নামক মহাহ্রদ। কালাগ্নি সেই হ্রদের মধ্যে জলরূপে মহা কল্লোলে বহিতেছে। সেই ভীষণ জলস্রোতের উপর কোটি কোটি প্রাণী হাহাকারে ছটফট করিতে করিতে ভাসিতেছে। হাহাকার করিতেছে আর পাপীরা অনুতাপের স্বরে বলিতেছে, হায়, ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেন কুকর্ম করিলাম। অমনি শূন্যদেশে ভীষণ শব্দে বাণী উচ্চারিত হইতেছে—পাপের ছলনায় ধর্মকে কেন ভুলিয়া যাইলে ? এই ভীষণ নরকে নিজের কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। কারণ—"সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে।"

এই একটিমাত্র কথার ভিতরে কবি সমগ্র কাব্যের ট্রাজিক পরিণতিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অলঙ্ঘ্য বিধি-বিধানই মানুষের শাস্তির চরম নির্ণায়ক; এই কাব্যের নায়ক রাবণকেও ইহাই মর্মে মর্মে বুঝিতে হইতেছে। তবে রাবণের ট্রাজেডি বুঝাইবার জন্য যে এইরূপ একটি দীর্ঘ নরকবর্ণনার প্রয়োজন ছিল, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে এই অষ্টম সর্গটি বিশেষ কোন কাব্য-প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য নহে। ইহা নিতান্তই 'সর্গা অষ্টাধিকাস্তথা' এই দাবী মিটাইবার জন্যই রচিত বলিয়া মনে হয়, আর, ইহার আবির্ভাবের মূলে আছে পাশ্চাত্ত্য অনুকরণের দুর্বার আগ্রহ। দান্তে ও মিলটনের অনুকরণে কবি একবার নরকবর্ণনার সাধ মিটাইয়া লইয়াছেন মাত্র; মূল প্রয়োজন এত ক্ষীণ বলিয়াই এখানকার রচনাও এত দুর্বল। তবে এখানকার বর্ণনার মধ্যে পাপপ্রবণ মানুষের মনে যে আতঙ্ক জাগে, তাহার একটা মূল্য স্বীকার করিতে হয়।

৩০। "যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী।" মেঘনাদবধ কাব্যের কোন্ অংশে কি উপলক্ষ্যে ইহা কথিত হইয়াছে এবং কবির এই উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই বা কি ?

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে প্রেতপুরী বর্ণনায় কবি মায়াদেবীর মুখ দিয়া এই কথাটি বলাইয়াছেন। ইতিমধ্যে প্রেতপুরীতে বহুবিধ দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া, পাপীদের দণ্ডভোগের বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখিয়া রামচন্দ্রের কোমল হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। যাইতে যাইতে তিনি একস্থলে দেখিতে পাইলেন যে, কিছুদূরে লক্ষ লক্ষ নারী অতি করুণভাবে আর্তনাদ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ স্বহস্তে নিজের কেশপাশ ছিঁড়িতেছে, কেহবা তীক্ষ্ণ নখরদ্বারা বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে, কেহ চক্ষু দুইটি কাটিতেছে আর সকলের মুখেই অনুতাপের মর্মস্পর্শী বাণী শ্রুত হইতেছে। কেহ বলিতেছে, একদা যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া স্বামীজনের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য এই দীর্ঘ চিকুর সযত্নে বাঁধিতাম ; কেহ বলিতেছে, বৃথাই এই দেহের যত্ন করিলাম; আবার কোনো নারী সখেদে বলিতেছে, এই চক্ষু দুইটিতে কত যত্নে অঞ্জন দিয়া চারিদিকে চাহিয়া কটাক্ষ শর হানিতাম, এমন কি দর্পণে এই মদালস চক্ষু দুইটির জ্যোতি দেখিয়া হরিণীর নয়নকে ঘৃণা করিতাম,—কিন্তু এখন ভাবিতেছি, "গরিমার পুরস্কার এই কিরে শেষে ?"

এইভাবে বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে যাহার নরকে চলিয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পিছনে তাড়া করিয়া চলিল ভীষণাকৃতি কৃতান্ত-দূতীরা। তখন রামচন্দ্রকে সম্ভাষণপূর্বক মায়াদেবী বলিলেন, এখনি অনুতপ্তা যেসব মেয়েদের দেখিলে ইহারা সকলেই জীবিতকালে বেশভূষাসক্তা ছিল এবং সর্বদাই ইহারা কামীজনের চিত্তবিভ্রম ঘটাইবার জন্য সচেষ্ট থাকিত। তাহাদের সেই যৌবনধন এখন কোথায়? এই দৃশ্য দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার প্রসাদে রামচন্দ্র অনুরূপ আর একটি দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, একদল সুসজ্জিত নারী ও পুরুষ প্রেমরঙ্গে মজিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন :

"সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে!
...করি জড়াজড়ি
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত-পদাঘাতে !
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।"

বিস্ময়-বিকলচিত্তে রামচন্দ্র যখন এই চিত্তস্পন্দী দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তখন মায়াদেবী তাঁহাকে বলিলেন যে, যেসব পুরুষ জীবনে কামের দাস এবং যেসব রমণী কামের দাসী ছিল—তাহারা অধর্মের বলে ধর্মকে বিসর্জন দিয়া এবং লজ্জাকে বর্জন করিয়া এইভাবে নিজেদের কামক্ষুধা মিটাইত। সেই কৃতকর্মের দণ্ড এখন তাহারা এই যমালয়ে আসিয়া ভোগ করিতেছে।

কবি এই দৃশ্যের অবতারণাপূর্বক এই কথা বিশেষভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, অসংযত ভোগ সাময়িক তৃপ্তি দান করিতে পারে কিন্তু জীবনের ভবিষ্যৎকে তমসাচ্ছন্ন ও যন্ত্রণাময় করিয়া তুলে। লালসার আগুনে কেবলই আহুতি দিয়া যাহারা প্রথম যৌবনে অসংযমের স্রোতে পৈশাচিক উল্লাসে ভাসিয়া চলে পরিণত জীবনে তাহারা অচিরেই বঞ্চনার বৃশ্চিক জ্বালায় জ্বলিতে বাধ্য হয়। এ সংসার ভোগের ক্ষেত্র, কিন্তু অসংযত ভোগ নহে, তাহা কেবল অনন্ত দুঃখের নিদান। যৌবনে যে কামপ্রবৃত্তি উদ্দাম হইয়া উঠিতে চাহে তাহারই মুখে লাগাম পরাইয়া সংযত ভোগের দ্বারা জীবনকে দীর্ঘকাল সুখময় করিয়া তোলাই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত, কারণ এই প্রবৃত্তি কেবল সুখের কারণ নহে শক্তিরও মূল উৎস। যে কেবল সুখের বিলাসে মত্ত হইয়া যৌবনে অমিতাচারী হইয়া পড়ে, পরিণত বয়সে তাহাকে সুখ ও শক্তি উভয় ধন হইতে বঞ্চিত হইয়া আক্ষেপে কাল কাটাইতে হয়। তখন কামনা লুপ্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর সূচীমুখ হইতে থাকে, কিন্তু কামনার পরিতৃপ্তি ঘটাইবার মত শক্তির শোচনীয় অভাব ঘটে। অর্থাৎ কামনা ও সম্ভোগের মধ্যে ঘটে এক যন্ত্রণাদায়ক দ্বন্দ্ব যাহার জ্বালা জীবনকে করিয়া তোলে বিষময়। কবি অমিতাচারীর জীবনের শোচনীয় পরিণতি দেখাইবার উদ্দেশ্যেই প্রেতপুরীতে বিশেষভাবে এই দৃশ্যটির অবতারণা করিয়াছেন এবং বর্ণনার গুণে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে।

৩১। মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন-বর্ণিত প্রেতপুরীতে রামচন্দ্র নরক-দৃশ্য ভিন্ন আর অন্য কোন দৃশ্য দেখিয়াছিলেন কি না এবং সেই সব দৃশ্যের অবতারণার সার্থকতাই বা কোথায়?

উত্তর। মধুসূদনের প্রেতপুরী মিলটনের নরক নহে; প্রেতপুরী বর্ণনার পরিকল্পনা কবি যদিও মিলটন হইতে পাইয়াছিলেন, তথাপি মধুসূদনের প্রতিভা এক্ষেত্রে মিলটনের বর্ণনাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। রামচন্দ্রকে যে উদ্দেশ্যে তিনি মায়াদেবীর সঙ্গে প্রেতপুরীতে লইয়া আসিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভয়াবহ নরকের দৃশ্যাবলী দেখাইয়া সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে না, এ কথা কবি জানিতেন। সেইজন্য তিনি প্রেতপুরীর পূর্বদিক ও উত্তরদিকের অবতারণা করিয়াছেন। এই দুইটি দিকের বর্ণনা না থাকিলে সমগ্র বর্ণনাটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। মিলটনের নরকে তাই আমরা পাই শুধুই উত্তাপ ও জ্বালা, কিন্তু মধুসূদনের প্রেতপুরীতে সেই সঙ্গে সুকৃতির ফলস্বরূপ যে অনাবিল শান্তির ব্যবস্থা আছে তাহার পরিকল্পনা একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির ফল। কবি ভারতীয় পুরাণ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া এই সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন। প্রেতপুরীর শেষাংশের বর্ণনাই ইহার সাক্ষ্য বহন করে।

পাঁচশত লাইনব্যাপী নরকের বিভিন্ন দৃশ্যের বর্ণনা করিবার পর কবির মনে হইয়া থাকিবে যে, সে বর্ণনা কেবলমাত্র নরকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে সর্গটির 'প্রেতপুরী' নামকরণ সমর্থন করা যাইবে না। অমনি কবি চিন্তা ও কল্পনার মোড় ফিরাইলেন। আর রৌরব বা কালাগ্নি নহে। মায়াদেবী হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে রামচন্দ্রকে বলিলেন যে, এই পুরীর শেষ নাই, অতি অল্পই মাত্র তোমাকে দেখাইলাম। যদি দ্বাদশ বৎসর সর্বদা এই পুরীতে ভ্রমণ করা যায়, তাহা হইলেও ইহা দেখিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। তাহার পর তিনি বলিলেন, ঐ দেখ, প্রেতপুরীর পূর্বদিক; পতিপরায়ণা সাধ্বীরা পতিসহ এইখানে সর্বদা বাস করেন। এখানকার সবই সুন্দর—বসন্ত সমীর এখানে সর্বদা প্রবাহিত। সপ্তস্বরা বীণা আপনি বাজিতেছে—চারিদিকে অমৃতফল এবং সুপেয় খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই। তাহার পর মায়াদেবী রামচন্দ্রকে লইয়া উত্তর দিকে চলিলেন।

প্রেতপুরীর এই উত্তরভাগের যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহা চিত্র হিসাবে উপভোগ্য তো বটেই, এমন কি, ইহার বর্ণনায় মধুসূদন স্বীয় কল্পনার বলিষ্ঠতারও পরিচয় দিয়াছেন। কবির কল্পনা যে কতদূর বিস্তৃত ও ব্যাপক হইতে পারে এবং সেই কল্পনার বৈচিত্র্য ও বর্ণাঢ্যতা কিভাবে ফুটাইতে পারিলে তাহা পাঠকচিত্তে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, মধুসূদন তাহা বিশেষভাবে জানিতেন।

যাইতে যাইতে হঠাৎ রামচন্দ্র অদূরে বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং—

"চারিদিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী,
কানন প্রসূন-পূর্ণ, সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়-ধাম।"

জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মায়াদেবী তাঁহাকে বলিলেন যে, সম্মুখযুদ্ধে যেসব বীর প্রাণত্যাগ করে তাহারা এইখানে আসিয়া অনন্ত সুখ ভোগ করিয়া থাকে। রামচন্দ্র সেইখানে অনেক বীরপুরুষকে দেখিতে পাইলেন; বৃত্র-আদি যত দৈত্যবীর সকলকেই দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ রামচন্দ্র প্রশ্ন করেন, সম্মুখযুদ্ধে যেসব রাক্ষসবীর প্রাণত্যাগ করিয়াছে সেই কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরদের দেখিতে

পাইতেছি না কেন। মায়াদেবী বলিলেন, তাহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া এখনও হয় নাই বলিয়া তাহারা এখনও এখানে আসিয়া পৌছায় নাই।

ইহার পর বানর-রাজ বালী ও পক্ষীরাজ জটায়ুর সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ। সকলের শেষে বৈতরণী তটে অক্ষয়বটের পাদদেশে রামচন্দ্র তাঁহার পিতা দশরথের সাক্ষাৎ পাইলেন। পিতা-পুত্রের এই সাক্ষাতের বর্ণনা সত্যই মর্মস্পর্শী। দশরথের সকরুণ বিলাপের সহিত রামচন্দ্রের নীরব ক্রন্দন মিলিয়া যে চিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ না করিয়া পারে না; রামচন্দ্র বনবাস যাইবার পর দশরথের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাঁহার সেই মৃত্যু যে অকালে মৃত্যু—ইহা আজ পুত্রকে তিনি নিজমুখে এইভাবে শুনাইলেন: "তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে।" পিতা-পুত্রে যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন সর্গটি সমাপ্তির দিকে। তাই পিতার সহিত বাক্যালাপ করিবার অবকাশ রামচন্দ্রকে কবি আদৌ দেন নাই। রাবণের শক্তিশেলে আহত অনুজ লক্ষ্মণ কি উপায়ে জীবন ফিরিয়া পাইবে, তাহা জানিতে চাহিলে দশরথ পুত্রকে বলিয়া দিলেন যে, গন্ধমাদন পর্বতের উপরে বিশল্যকরণী নামে যে ওষধি লতা আছে, উহাই লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার একমাত্র ঔষধ এবং সেই ঔষধ আবার রাত্রি থাকিতে আনিতে হইবে। একমাত্র হনুমান ভিন্ন ইহা আর কেহ আনিতে পারিবে না। এই বলিয়া দশরথ পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন এবং রামচন্দ্র তখনই মায়াকে সঙ্গে লইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৩২। নবম সর্গের মূল্য-নির্ণয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।

উত্তর। মেঘনাদবধ কাব্যের নবম সর্গটি যেমন সর্বকনিষ্ঠ, তেমনি সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। বিশেষত অব্যবহিত পূর্ববর্তী, সর্গ-মধ্যে দীর্ঘতম অষ্টমের পাশে এই নবমটি তাই পরিসরের দিক দিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়-জিজ্ঞাসা জাগাইয়া তোলে। আটশত বারো পঙ্ক্তি ব্যাপী অষ্টম সর্গের পাশে মাত্র কিঞ্চিদধিক চারিশত পঙ্ক্তির এই সর্গটি আপাতদৃষ্টিতে যেন একটা পরিশিষ্টের মত দেখায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অষ্টমের সহিত তুলনায় ইহা যে-অনুপাতে ক্ষুদ্র, কাব্যমূল্যের দিক দিয়া ঠিক সেই অনুপাতেই, অথবা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ।

যে বিরাট পুরুষটির জীবন লইয়া মেঘনাদবধ কাব্য, সেই 'অটলশক্তি' রাবণের হাহাকারে এই নবমসর্গের স্বর বাঁধা। বীররসের মহাকাব্যের করুণরসে সমাপ্তি। বহু প্রতিজ্ঞা, বহু প্রত্যাশা, বহু সম্ভাবনার এইখানে করুণ পরিণতি। চিত্র হিসাবে ইহা শুধু রাবণের, কিন্তু প্রতিচিত্র হিসাবে ইহা স্বয়ং কবির, হয়তো বা মানব-জীবনেরই। যাঁহারা বীররসের কাব্যরচনার প্রতিজ্ঞা করুণরসে ভাসিয়া গেল বলিয়া কবির ব্যর্থতাকেই বড়ো করিয়া দেখেন, তাঁহারা সমগ্র কাব্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই নবম সর্গটি যদি একটু সহৃদয়তার সহিত পাঠ করেন, তবে হয়তো কবির প্রতি সুবিচার করিবার পথ খুঁজিয়া পাইবেন। দেখিবেন, বহুলাংশে এই নবম সর্গের রাবণেরই অনুরূপ হৃদস্পন্দন আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে। প্রত্যেকের জীবনেই ঐ একই হাহাকার, একই বিধি-বিড়ম্বনা, একই অবনমনের জ্বালা! এইভাবে রাবণ-জীবনের কারুণ্যের মধ্যে মানুষমাত্রেরই জীবন-ট্রাজেডির প্রতিচ্ছবি খুঁজিয়া পাইলে কেবল যে নবম সর্গটি উপভোগ্য হইবে তাহা নহে, সমগ্র কাব্যের একটি সার্বজনীন আবেদন অন্তরে স্বীকৃত হওয়ার ফলে ইহার মহাকাব্যত্বের দাবীতেও বিশেষ আপত্তি থাকিবে না। নবম সর্গের কাব্য-মূল্যবিচারে ইহাই মনে হয় সর্বপ্রথম কথা।

প্রথম সর্গে যে রাবণকে আমরা দেখি—

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ।

এবং নানা বিপর্যয়ের মধ্যে সপ্তম সর্গের প্রারম্ভ পর্যন্ত যে 'দশানন রথী'কে কনক-আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই সকল দায়িত্ব পালন করিতে দেখি, সেই অটল পৌরুষের মূর্তি রাবণ এই সর্বপ্রথম ভূতলাশ্রয়ী। নবম সর্গের সূচনায় তাই যাঁহার চিত্র উন্মোচিত হইল, তিনি আর সে-রাবণ নহেন,—

'কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ ;—ইত্যাদি।

এই কনকাসন-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই রাবণের সর্বপ্রকার রিক্ততা নামিয়া আসিয়াছে। আজ তিনি নিঃস্ব। রক্ষঃকুলনিধির আজ সর্বশ্রেষ্ঠ নিধি—উত্তুঙ্গ মনোবল—হারাইয়াছে। তাই আজ রাবণের মুখে ভিখারীর কাতর প্রার্থনা! মন্ত্রী সারণকে রাঘবের নিকট পাঠাইবার সময় নিজমুখে বলিয়া দিতেছেন,—

"কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—"

এই কাব্যে আমরা রামচন্দ্রের পরিচয়েও 'ভিখারী রাঘব' পাইয়াছি, কিন্তু রাঘবের সেই ভিখারীত্ব কোথাও একটা বিনয়-কোমলতার পোষাকবিশেষ, কোথাও বা কবিরই আরোপিত রামচরিত্রের দুর্বলতাবিশেষ। আসলে ঘটনাক্রমের খতিয়ানে সেই ভিখারী রাঘবই হইলেন রাজ-রাজেশ্বর, আর কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী-লঙ্কার মহিমান্বিত অধীশ্বর রাবণই হইলেন ভিখারী। নিতান্ত ভিক্ষুকের মতই কবির 'অধম রাম'-এর নিকট তাঁহাকে মিনতি জানাইতে হয়, "পর-মনোরথ আজি পূরাও, সুরথি।" অতবড় বিরাট চরিত্রের, অমন মহাশক্তিদম্ভের এই যে অবনমন, ইহা কতই না বক্ষোভেদী, কতই না আতঙ্কজনক! ট্রাজেডির এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে আর কয়টি আছে? কিন্তু শুধু এইখানেই কবি ক্ষান্ত হন নাই। মনোবলের এই সিংহাসনচ্যুতির ফলে যে কী হইতে পারে তাহারও ছবি আঁকা হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে তাহাতে কেবল একটা নিরীহ মৈত্রী-ইচ্ছা ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু উহারই অন্তরালে রহিয়াছে পরাভবের ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস। রাবণের নির্দেশমত মন্ত্রী সারণ আসিয়া নতভাবে জানাইতেছে,—

যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী ;
নরদলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহা দোঁহে রিপুভাবে!

যেন কাহারও কোন দোষ নাই,—ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে কোন ভেদ নাই,—একটা শূন্যতার আশ্রয়ে শুধু মনকে সান্ত্বনা দেওয়া,—

* * * তাঁর মায়াছলে
রাঘব-রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে ?"

মনে হইতে পারে, এখানে একটা নির্দোষ মৈত্রীস্পৃহা, একটা শান্তিকামনা ছাড়া আর কিছু নাই। কিন্তু রাবণ তো এত নিরীহ, এত শান্তিকামী, এত বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন না। কে রাবণের এই পরিবর্তন ঘটাইল ? পুত্রশোক ? উপস্থিত ক্ষেত্রে তাই বটে, কিন্তু আসলে কেবল একটি পুত্রের বিরহ নহে ; যে কূটচক্রী নিয়তির ক্রূর ষড়যন্ত্র তাঁহার সমগ্র জীবন ঘিরিয়া ক্রমাগত জটিল হইতে জটিলতর জাল বুনিয়া পাশবদ্ধ মৃগেন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মনোবলকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে, যে অদৃশ্য প্রতিকূলতা কেবল রাবণ নহে জগতে বহু শক্তিমান পুরুষকেই পঙ্গু করিয়া দেয়, 'বিধির নির্ব্বন্ধ' নামে তাহাই ঘটাইয়াছে রাবণের এই শোচনীয় পরিবর্তন। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের উক্তিগুলির সমন্বয়ে গঠিত যে এক বিরাট পুরুষের সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে তাহার মূর্তিটি ঐ বিধির নির্বন্ধরূপ কণ্টকে আপাদমস্তক কণ্টকিত,—কণ্টকজর্জরিত যীশুর অথবা শরজাল-জর্জরিত ভীষ্মের মতই সে চেহারা। বিধি নামক সেই শক্তির পায়ে রাবণ যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাহা নয়; প্রতিপদেই তাঁহার মুখে এক ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ কুণ্ঠিত জিজ্ঞাসার আকারে,—

'কি পাপে দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ?'
'বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।'
'হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?' (১ম সর্গ)
'বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি !'
'কিন্তু দেব নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা ! নিদারুণ বিধি, এত দিন, এবে
বামতম মম প্রতি, (৭ম সর্গ)

নবম সর্গে আসিয়া আরও বাড়িয়া গেল এই বিধি-বিলাপ। বিব্রত, বিড়ম্বিত, বিধ্বস্ত শক্তিদম্ভ এখানে যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে। সেই কুণ্ঠিত জিজ্ঞাসা—

'বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ?'

কিন্তু কৈ সকলকে তো এই বিড়ম্বনা সহিতে হয় না। বিধির বিধানে যে খেয়ালের অন্ত নাই, কোথাও শুভদাতা, কোথাও অশুভের প্রতিমূর্তি। তাই একই বিশ্ববিধানে রামের শুভ ও রাবণের

বিপদ ; এবং পুত্রের সৎক্রিয়া সাধনের উদ্দেশ্যে রামের নিকট আবেদন জানাইবার সময় রাবণকেই আবৃত্তি করিতে হয়,—

'অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি,
দৈববলে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে'

কিন্তু কেন এই খেয়ালের অত্যাচার ? উপযুক্ত পুত্র মেঘনাদের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অন্তিমে সেই পুত্রেরই জাগ্রত দৃষ্টির আলোকে মহাযাত্রা করিবেন, এই ছিল রাবণের আশা। কী অন্যায় তিনি করিয়াছেন এই সাধারণ আশাটুকুকে শেষ বয়সের অবলম্বন করিয়া ?

'কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !'

তাই কাব্য হইতে বিদায় লইবার পূর্বে যে রাবণকে আমরা শেষবারের মত প্রত্যক্ষ করি তিনি এই বিধির নিষ্ঠুর খেয়ালের দুর্জ্ঞেয়তার প্রাচীরে মাথা কুটিয়া জীর্ণ দীর্ণ এক হতবল বিদ্রোহের কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত। প্রথম সর্গে যে ট্রাজেডির সূচনা নবম সর্গে তাহারই পূর্ণতা ও উপসংহার। ইহাকে বাদ দিয়া ঐ ট্রাজেডিকে তথা কাব্যের প্রধান আশ্রয় রাবণ-চরিত্রকে সম্পূর্ণ বুঝিবার উপায় নাই। তাই নবম সর্গটি সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যের অমূল্য ভাষ্য। এই সর্গের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"* * * যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতে হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্মদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

১১। দুরূহ শব্দ ও কাব্যাংশের ব্যাখ্যা

প্রথম সর্গ

১—২০০ ছত্র ঃ কি কৌশলে—মেঘনাদকে সহজে বধ করা সম্ভব হয় নাই। দেবতা ও মানবের চক্রান্তযোগে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্মণ হত্যা করিয়াছিলেন। আরম্ভে কবি তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে ভারতি!—শুভ্রবর্ণা সরস্বতীর বন্দনা। 'আবার' অর্থ 'পুনরায়'—কবি একবার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে বাণী-বন্দনা করিয়াছেন; দ্বিতীয়বার মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় বন্দনা করিতেছেন। সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!—বিষবৃক্ষ চন্দন বৃক্ষের মত গুণসম্পন্ন হয় অর্থাৎ অসম্ভবও সম্ভব হয়। উর—আবির্ভূত হও। মধুকরী কল্পনা! —রূপক অলংকার। কবিকল্পনাও যেন একজন দেবী। বাণী-বন্দনা শেষ করিয়া কবি কল্পনাকে স্বতন্ত্রভাবে আহ্বান করিতেছেন। **কবির-চিত্ত-ফুলবন-মধু**—দেশী-বিদেশী নানা কবির কাব্যসার, এই ব্যাখ্যা প্রচলিত হইলেও, মধুসূদনেরই কবিচিত্তের বিভিন্ন ভাবাশ্রয়ী রস, এই ব্যাখ্যাই অধিকতর সন্তোষজনক ও যুক্তিপূর্ণ। রতনসম্ভবা বিভা—মণিরত্ন হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ। গোকুল বিপিনে! —বৃন্দাবনের কাননে। কি ছার ইহার···স্বহস্তে গড়িলা—শোভা-সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির দিক্ দিয়া রাবণের এই রাজসভা ময়দানবের নির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থের সভাগৃহকে হার মানাইয়াছে। কাকলী—দূরস্থিত যন্ত্রসমূহের একত্রীভূত মৃদুধ্বনি। ঘন—মেঘ। আঁধার জগত···দিননাথে!—সূর্য মেঘে ঢাকা পড়িলে যেমন সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইয়া যায়, তেমনি পুত্রশোকাতুর রাবণের সমস্ত সভাজন দুঃখিত, উৎসাহহীন ও নীরব! ফুলদল···তরুবরে?—অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল? সামান্য দুর্বল মানব রামের হাতে কি করিয়া বীরবাহুর মত বীরের মৃত্যু হইল!—শূলী শম্ভুসম—শূলধারী মহাদেবের মত। কালকুটে ভরা—বিষে পরিপূর্ণ। পাবকশিখা-রূপিণী—অগ্নিশিখার ন্যায়। এখানে একই সঙ্গে সীতার রূপ, তেজ ও পবিত্রতা সূচিত হইয়াছে। দেউটী—দীপবর্তিকা। অন্ধরাজ—ধৃতরাষ্ট্র। সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ—মন্ত্রিকুলপ্রধান বিজ্ঞজন। অভ্রভেদী—আকাশভেদী। কুবলয়ধন—পদ্ম। মদকল করী—মদমত্ত হস্তী ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। পবনপথ—আকাশ। কোদণ্ড—ধনুক। ঘনাকারে—মেঘের আকার ধারণ করিয়া। কলম্বকুল—তীরসমূহ। সন্দেশবহ—দূত। হর্য্যক্ষ—সিংহ। আত্মজ—পুত্র। দ্বন্দ্বি—দ্বন্দ্ব করিয়া, অর্থাৎ সংঘর্ষে মাতিয়া। ভাতিল—দীপ্তিমান্ হইল। নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনের মত গুরুগম্ভীর শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা—প্রাণভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন বা পলায়ন করিলেই পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন পড়ে। মকরাক্ষ সম্মুখযুদ্ধই করিয়াছে, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে নাই; অস্ত্রাঘাত সে বক্ষেই ধারণ করিয়াছে। হরষে বিষাদে—বীরপুত্রের বীরত্বে গর্বিত ও তাহার শোকে দুঃখার্ত। কভু কি···বিবরে? সাপুড়িয়ার ডমরুধ্বনি শুনিয়া সাপ গর্তের মধ্যে স্থির হইয়া যেমন থাকিতে পারে না, বীরের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের কথা শুনিয়া যোদ্ধাও তেমনি কখনও নিষ্ক্রিয় উৎসাহ-হীন হইয়া থাকিতে পারে না।

২০১—৪০০ ছত্র ঃ অংশুমালী—সূর্য। দিনমণি, অংশুমালী—উভয় শব্দের অর্থ সূর্য। কিন্তু এখানে পুনরুক্তি দোষ হয় নাই, কারণ কবি অংশুমালী শব্দটি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, অংশু অর্থাৎ কিরণজাল যাহার গলদেশে মালাস্বরূপ। কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—স্বর্ণনির্মিত সৌধ অর্থাৎ অট্টালিকা যে লঙ্কার মুকুটস্বরূপ হইয়াছে। **উৎস রজচ্ছটা**—রজৎ-ছটা, অর্থাৎ রজত-ছটা কবি ছন্দের অনুরোধে 'রজত' শব্দে 'ত'—কারে স্থলে 'ৎ' করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সমগ্র প্রয়োগটির অর্থ হইল, রজতের ন্যায়—শুভ্র আভাবিশিষ্ট উৎস বা ফোয়ারা। করভসম নব বলে বলী—হস্তিশাবকের মত বলশালী। হিমান্তে—শীতের শেষে। কঞ্চুক—সর্পচর্ম। লুলি—লক্ লক্ করিয়া। অবলেপে—গর্বে। প্রসরণ—বেষ্টন। শত প্রসরণে—শত পাকে। পাকশাট মারি—পক্ষের আঘাত করিয়া। নিষাদী—গজারোহী। সাদী—অশ্বারোহী। ভিন্দিপাল—ক্ষেপ্যঅস্ত্র। হৈমধ্বজ—স্বর্ণপতাকা-যুক্ত। স্বর্ণ-চূড় শস্য…পড়ে ক্ষেত্রে—যেরূপ শীষরূপ স্বর্ণ চূড়া-মণ্ডিত শস্য কৃষকের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। গরুড় ঘটোৎকচ—গরুড়ের মত শক্তিশালী এবং আকাশযুদ্ধে পারদর্শী। (মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনের হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্রের নাম ঘটোৎকচ)। কালপৃষ্ঠ—কর্ণের ধনুঃ। একাঘ্নী—মহা-অস্ত্র বিশেষ। এই বাণ কর্ণ অর্জুনকে মারিবার জন্য রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্যোধনের অনুরোধে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। নির্ঘোষ—আওয়াজ। বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ। প্রচেতঃ—জলাধিপতি বরুণ। **কি সুন্দর …প্রচেতঃ**—নানা অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। নিয়তি প্রতিকূল, তাহা না হইলে দুর্ধর্ষ অজেয় সমুদ্র নরবানরের হাতে বাঁধা পড়িল কেন ? সেতুবদ্ধ সমুদ্রকে দেখিয়া রাবণ ধিক্কার দিতেছেন। প্রশংসা বা স্তুতিচ্ছলে ইহা তীব্র শ্লেষপূর্ণ নিন্দা। নিগড়—শৃঙ্খল। জাঙাল—বাঁধ। বীতংস—পাখি ধরার ফাঁদ। **কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে**—চারিদিকে নীলসমুদ্র বেষ্টিত স্বর্ণলঙ্কা যেন শ্যামলদেহ কৃষ্ণের বক্ষস্থলে শোভমান উজ্জল কৌস্তুভরত্ন। কৃষ্ণের বক্ষস্থিত কৌস্তুভরত্ন কৃষ্ণের নিকট আদরণীয়। অসীম সমুদ্রের বক্ষে শোভমান লঙ্কাপুরীও সমুদ্রের নিকট তেমনি আদৃত হওয়া স্বাভাবিক। ভালে—কপালে। কিঙ্কিণীর বোল—অলংকারসমূহের শব্দ। চিত্রাঙ্গদা—রাবণের মহিষী, বীরবাহুর জননী। পদ্মপর্ণ—পদ্মপাতা। শোকের ঝড় বহিল সভাতে!—সভাতল পূর্বে শোকমগ্ন ছিল, কিন্তু এখন পুত্রহারা মাতার আবির্ভাবে শোক উদ্বেল হইয়া উঠিল। সুর-সুন্দরী—বিদ্যুৎ। আসার—বৃষ্টিধারা। জীমূত-মন্দ্র—মেঘধ্বনি। কাঙ্গালিনী—চিত্রাঙ্গদার জীবনে একমাত্র সম্পদ ছিল তাহার পুত্র বীরবাহু। গ্রহদোষে…সুন্দরি ?—যে ভাগ্যবিড়ম্বিত, অদৃষ্টদোষে যে কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে নিন্দা করিয়া বা গঞ্জনা দিয়া লাভ কি ? নিদাঘ—গ্রীষ্মকাল। বরজ—পানের ক্ষেত। শিম্বুলশিম্বী—শিমূল ফুল। **যথা বনে …কালসমরে**—তুলা যেমন বায়ুতাড়িত হইয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া উড়িয়া অদৃশ্য হয়, তেমনই লঙ্কাপুরীর মধ্যে ইহার বীরগণ মৃত্যু-তাড়নায় রণক্ষেত্রে দেহপাত করিয়া একে একে অদৃশ্য হইতেছে। বীরপ্রসূনের—বীরপুত্রের, যে পুত্র বীরের মধ্যে কুসুমবৎ। প্রসূ—জননী। কাকোদর—সর্প।

৪০১-৬০০ ছত্র ঃ প্রহারকে—প্রহারকারীকে। কে, কেহ, লঙ্কাপুরে ?—রাবণ যে নিয়তির প্রতিকূলাচরণের কথা বলিয়াছেন, দৈবকেই সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, চিত্রাঙ্গদা এইখানে তাহা খণ্ডন করিতেছে। গ্রহদোষ বা বিধির বিধান এ কুলনাশের কারণ নয়, এ যুদ্ধ সীতা-

হরণেরই ফল। কর্ব্বুরবৃন্দ—রাক্ষসসমূহ। বারী—হস্তিশালা। বারণযূথ—হস্তিদল। মন্দুরা—অশ্বশালা। ব্রজ—সমুদয়। শিরস্ক—পাগড়ী। পিধান—আচ্ছাদন, আবরণ (এখানে তরবারির খাপ)। আয়সী—লৌহবর্ম। নিষাদী—মাহুত। বজ্রপাণি—ইন্দ্র। সাদী—ঘোড়ার সহিস। পরশু—কুঠার। কেতন—ধ্বজা, পতাকা। হয়ব্যূহ—অশ্বসমূহ। হেষিল—হ্রেষারব করিল। কবি প্রায় সর্বত্র 'হ্রেষা' স্থলে 'হেষা' ব্যবহার করিয়াছেন। (ঘোড়ার ডাকের নাম হ্রেষা)। কোদণ্ড—ধনু। বারুণী—বরুণের স্ত্রী। 'বরুণানীর' পরিবর্তে মধুসূদনের প্রয়োগ। বারীশ—জলাধিপতি বরুণ। আরাব—রব, ধ্বনি, আওয়াজ। জলেশ পাশী—পাশ-অস্ত্রধারী জলাধিপতি বরুণ। বায়ুকুল—উনপঞ্চাশ বায়ু। ঝড়াকারে—বিপুল সৈন্যসজ্জা করিয়া, প্রচণ্ড শক্তিতে। লাঘবিতে—লাঘব করিতে। **আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে,**—দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া সমুদ্রগর্ভে বাস করেন; সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী উত্থিতা হন ও পুনরায় বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যান। চটুলা—চঞ্চলা। রজঃকান্তি-ছটা-বিভ্রম—রজতবর্ণের দেহের শোভা; সফরী অর্থাৎ পুঁটীমাছের শরীর দেখিলে, বোধ হয়, বিধাতা তাহাকে রূপা দিয়া গড়িয়াছেন। বিভাবসু—সূর্য। ধনদ—কুবের। দীপিছে—দীপ্তি পাইতেছে। **খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে !**—কমলার রূপের প্রভায় স্বর্ণদ্বীপের আলোও ম্লান, পূর্ণচন্দ্রের আলোকে জোনাকীর দীপ্তি যেমন কমিয়া যায়। বিজয়া দশমী ...গৌড়গৃহে—বিজয়া-দশমীর দিন আসন্ন বিরহের কথা ভাবিয়া দুর্গা যেমন বিষণ্ণ বদনে থাকেন। গৌড়গৃহে—বাংলাদেশের পূজারীর গৃহে। উরসে—বক্ষস্থলে। রমার আশার বাস হরির উরসে—লক্ষ্মীর লোভনীয় স্থান বিষ্ণুবক্ষ; বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়াই লক্ষ্মী বাস করিতে চাহেন। স্নেহৌষধ গুণে—স্নেহরূপ ঔষধের জোরে। **যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-আঘাতে**—(যাদঃ পতি—সাগর; রোধঃ—তট; চল—চঞ্চল; ঊর্ম্মি—তরঙ্গ) নিয়ত চঞ্চল তরঙ্গের আঘাতে সাগরের কূল বা তট ধ্বসিয়া পড়িবার পূর্বে যেমন শিথিল হইতে থাকে, রাবণ তেমনি শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছেন। অতিকায়—রাবণের পুত্র। দুকূল-বসনা—শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিহিতা। কাঞ্চী মেখলা, কটিভূষণ। চক্রনেমি—চক্রের নেমি অর্থাৎ পরিধি। দন্তী—হাতী। দণ্ডধর—যম। ত্রিদিব-বিভব—স্বর্গের ঐশ্বর্য—স্বরীশ্বর—ইন্দ্র। প্রক্ষ্বেড়ন—লৌহধনুঃ।—বৈশ্বানর—অগ্নি। তুঙ্গতর—পর্বত-তুল্য। মহীরুহব্যূহ—ঘনসন্নিবিষ্ট বিশাল বৃক্ষরাজি।

৬০১-৭৮৫ ছত্র : প্রাক্তন—অদৃষ্ট। প্রাক্তনের...পুরে—রাবণের কৃত দুষ্কর্মের ফলে তাঁহার সবংশে বিনাশ, ইহাই ভবিতব্য লিপি। শিখণ্ডিনী—ময়ূরী। আখণ্ডল-ধনুঃ—ইন্দ্রের ধনু। মঞ্জু—সুন্দর। বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের প্রাসাদ। অলিন্দ—বারান্দা। বাসন্তানিল—বসন্তকালের বায়ু। নিষঙ্গ—তূণ। শিঞ্জিত—অলংকারধ্বনি। দক্ষ-বালা-দলে—তারাদলে। বিহারেন যথা দক্ষ-বালা-দলে লয়ে—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্র দক্ষের কন্যা ও চন্দ্রের স্ত্রী। যমুনে, ভানুসুতে—যমুনা সূর্যের কন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা—শুভ্রবসন পরিহিতা ও বার্ধক্য হেতু মুষ্টিতে লাঠি ধারণ করিয়া। মহাশোকী—অতিশয় শোকার্ত। রথীন্দ্রর্ষভ—রথীবর শ্রেষ্ঠ। হৈমবতীসুত—কার্তিকেয়। হৈমবতীসুত...মহাসুর—পার্বতীর পুত্র কুমার কার্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করিবার জন্য যেরূপ সজ্জিত হইয়াছিলেন সেইরূপ। কিরীটি—অর্জুন। আশুগতি—বায়ু। তরু-কুলেশ্বর—আম্রবৃক্ষ। ব্রততী—লতা। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা। কাঞ্চন-কঞ্চুক—সোনার সাঁজোয়া। কাল

সমরে—যে যুদ্ধে অসম্ভব সম্ভব হইতেছে ; অজেয় বীরগণ যে যুদ্ধে দেহপাত করিতেছে। ভাসে শিলা··· পুনঃ বাঁচে—শিলা জলে ভাসিতেছে, মৃত পুনরায় প্রাণ ফিরিয়া পাইতেছে অর্থাৎ যাহা অভাবনীয়, কল্পনাতীত তাহাই ঘটিতেছে। অম্বুরারি-রিপু—অম্বুরারি—ইন্দ্র যাঁহার শত্রু অর্থাৎ মেঘনাদ। মেঘবাহন—ইন্দ্র। বন্দিল—বন্দনা গাহিল। **নয়নে তব ···অশ্রুবিন্দু**—স্বদেশকে জননীরূপে কল্পনার সূত্রপাত বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। বন্দী—স্তুতিপাঠক। পাশুপত—শৈব-অস্ত্রবিশেষ। নৈকষেয়—নিকষাপুত্র রাবণ। আকাশ-দুহিতা—আকাশসম্ভূতা। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী।

দ্বিতীয় সর্গ

১-২০০ ছত্রে : সরসে—সরোবরে। সুচারু-তারা···শর্ব্বরী—সুন্দর নক্ষত্রশোভিতা রাত্রি। বিলাসী—সৌখিন। নানা ফুলের সুগন্ধ আহরণ ও বিতরণ করে বলিয়া মৃদুমন্দ বায়ু 'বিলাসী'। শশি-প্রিয়া—রাত্রি। ত্রিদশ আলয়—দেবতাদিগের বাসস্থান, স্বর্গ। পুলোম-নন্দিনী—পুলোমা নামক দৈত্যের কন্যা শচী। দেব-দানবের যুদ্ধে পুলোমাকে বধ করিয়া ইন্দ্র শচীকে বিবাহ করেন। বাদিত্র—বাজনা। শিঞ্জিতে—অলংকারধ্বনিতে। দেব-ওদন—দেবতার উপযুক্ত খাদ্য। (ওদন—অন্ন)। পুণ্ডরীকাক্ষ—বিষ্ণু। সুরনিধি—ইন্দ্র। তবুও···ছাড়িতে—রাবণ পাপপরায়ণ, পাপীর গৃহে লক্ষ্মীর বাস অসম্ভব কিন্তু যতদিন না কাল পূর্ণ হয় ততদিন রাবণকে ত্যাগ করিয়া আসিবার উপায় নাই। বৃত্রবিজয়ী—ইন্দ্র। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ—লঙ্কার এক পর্বত-গুহার নাম নিকুম্ভিলা। সেইস্থানে ইন্দ্রজিৎ অগ্নির প্রীত্যর্থে যজ্ঞ করিয়া দেবতার বর লাভ করিতেন। বৈনতেয়—বিনতানন্দন, গরুড়। বলজ্যেষ্ঠ—বলে সর্বাপেক্ষা প্রবল। পন্নগ-অশন—গরুড়। পন্নগ-অশনে ··তারে আমি—সর্পাহারী গরুড়কে সাপ যত না ভয় করে আমি মেঘনাদ হইতে তত ভীত হই। দম্ভোলি—বজ্র। সর্ব্বশুচি—অগ্নি। মেঘনাদের ইষ্টদেব। বারীন্দ্র-নন্দিনী—সমুদ্রের কন্যা। চন্দ্র-শেখর—চন্দ্র যাঁহার শিরের ভূষণ, মহাদেব। সতত কাঁদে···ভার—সর্বংসহা ধরিত্রী পর্যন্ত রাবণের পাপের ভারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। অনন্ত ক্লান্ত এবে—নাগরাজ বসুকিও এত পাপের ভার বহিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অর্থাৎ রাবণের মৃত্যুতে পৃথিবী পাপমুক্ত না হইলে আর রক্ষা নাই! বিরূপাক্ষ, ত্র্যম্বক—শিব। কোন্ পিতা···দূরে—মহাদেব রাবণের মঙ্গলের জন্য লক্ষ্মীকে লঙ্কায় রাখিয়াছিলেন ; ইহার ফলে লক্ষ্মী বিষ্ণুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ত্র্যম্বকে···কথা—যদি মহাদেবের দর্শন না পাওয়া যায় তবে দুর্গার নিকট বলিও, তিনি নারী, তিনি সহজেই এ কথা বুঝিতে পারিবেন। অনম্বর-পথে—আকাশপথে। মাতলি—ইন্দ্রের সারথি। রুচি—শোভা। বিকচ—প্রস্ফুটিত। **পরিমল-সুধা সহ ······কমল-গুণে**—স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেই পুরুষের আদর বাড়িয়া যায়, কারণ স্ত্রী হইল পুরুষের শোভা ও ঐশ্বর্য, অনুরূপভাবে সুগন্ধের জন্য পবনের ও পদ্মের জন্য মৃণালের আদর বাড়িয়া থাকে। বাসরে—বাসগৃহে, শয়নগৃহে। মানস-সকাশে—মানস সরোবরের নিকট। ভবের ভবন—মহাদেবের আলয়। পীত ধড়া—হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রখণ্ড। বিশদ চন্দনে—শ্বেত চন্দনে। **নির্ঝর-ঝরিত······সে বপু**—কৈলাসশিখরের নানাস্থানে সাদা ঝরণার জলরাশি গড়াইতেছে বলিয়া এক চন্দনচর্চিত দেহের সাদৃশ্য জাগিয়াছে। শ্যামবর্ণের শৃঙ্গধর যেন একখানি শ্যাম দেহ, আর সাদা ঝরণার জল যেন শ্বেতচন্দন। কবির নিসর্গ-সন্দর্শন লক্ষণীয়। আকুল বিগ্রহে—যুদ্ধে ভীত বা ব্যাকুল হইয়া।

পরন্তপ—শত্রুপীড়ক। বিশ্বধর শেষ—বিশ্বধারণকারী অনন্তনাগ। কুলিশ—বজ্র। অমূল—অমূল্য। হরে দুষ্ট—দুষ্ট রাবণ হরণ করিয়াছে। দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ—দাসী অর্থাৎ শচীর কলঙ্ক; দেবরাজ ইন্দ্রকে ইন্দ্রজিৎ রণে পরাভূত করে, ইহাই শচীর ক্ষোভ ও কলঙ্কের বিষয়।

২০১—৪০০ ছত্র ঃ মঞ্জুনাশিনী—সুন্দরী-কুল-গর্ব-হারিণী। বৃষধ্বজ—শিব। হ্রাসো—হ্রাস কর, লাঘব কর। স্তুতিলা—স্তুতি করিলেন। খড়ি পাতি—খড়ি দিয়া লিখিয়া, অঙ্ক কষিয়া। বারি-সংঘটিত-ঘটে—জলপূর্ণ ঘটে। বিকটশিখর—ভীষণ শৃঙ্গ। মহাদেব এই শৃঙ্গের উপর বসিয়া যোগসাধন করেন বলিয়া ইহা যোগাসন নামে বিখ্যাত। দ্বিরদ-গামিনী—গজগামিনী। তারাকারা—তারার মত সুন্দর। ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব। ভবেশভাবিনী—দুর্গা। ত্বিষাম্পতি—সূর্য। পিনাকী—পিনাক নামক ধনুকধারী অর্থাৎ শিব। লাক্ষারস—আলতা। রসান—স্বর্ণোজ্জ্বল-কারী প্রস্তর বা রসায়ন বিশেষ। স্মর-হর-প্রিয়া—দুর্গা। স্মর-প্রিয়া—রতি। বামদেব—মহাদেব। বিভাবসু—অগ্নি। প্রাণ নাশ-কারী…কৌশলে—সুচিকিৎসকের হাতে ব্যবহৃত হইলে তীব্র হলাহলও অনেক সময় প্রাণ রক্ষা করে। সুরাসুর বৃন্দ-যবে—সমুদ্রমন্থনের উল্লেখ। দিতিসুত—দৈত্য। মলম্বা—স্বর্ণপাত্র। অম্বর—বসন। **মলম্বা…ধরে** সোনার পাতায় মোড়া তামার যদি এত শোভা হয় অর্থাৎ স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া পুরুষ যদি এতটা মোহ সৃষ্টি করিতে পারে। **বিশুদ্ধ……মনোহর**—যথার্থ যে নারী তাহার মোহিনীবেশ কি অঘটন ঘটাইবে কে জানে! সুবর্ণ বরণ ঘন—স্বর্ণবর্ণ মেঘ। দ্বিরদ-রদ—হাতীর দাঁত। মেঘাবৃতা যেন উষা—স্বর্ণমেঘের আবরণে আবৃতা দেবী! **কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী**—অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মদন পশ্চাতে; মদন যেন কণ্টকময় মৃণাল, আর বিকশিত কমলের মত দেবী অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন। ভৃগুমান্—উচ্চ সানুদেশ-বিশিষ্ট। জল-কান্ত—সমুদ্র। কপর্দ্দী—জটাধারী, অর্থাৎ মহাদেব। তাপসী—তপস্বী। বিভূতি-ভূষিত—ভস্ম-শোভিত। শম্বর-অরি—শম্বর নামক দানবের নিহন্তা, অর্থাৎ কন্দর্প। শিঞ্জিনী—ধনুকের গুণ। সম্মোহন শরে—মদনের পঞ্চবানের মধ্যে অন্যতম অমোঘ বাণ। শিহরিলা—ভয় পাইলেন। চিত্রভানু—অগ্নি। কেশরি-কিশোর—সিংহ-শাবক।

কেশরি-কিশোর……কালানল তেজে—মেঘের গর্জনে এবং বিদ্যুদগ্নিতে ভীত হইয়া যেমন সিংহশাবক সিংহীর কোলে প্রবেশ করে, তেমনি শিবের ললাটস্থ অগ্নির গর্জনে ও তেজে ভীত হইয়া মদন ভগবতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় লইলেন।

৪০১—৬২৯ ছত্র ঃ শিলীমুখ—ভ্রমর। কুসুমেষু—(কুসুম—ফুল; ইষু—বাণ) ফুলময় বাণ যাহার অর্থাৎ মদন। বিদরে……কথা—নিজের কর্মফলে যে দুরদৃষ্ট বা প্রতিকূল নিয়তিকে রাবণ জাগাইয়া তুলিয়াছে, রাবণের ভাগ্যে যে দুঃখ-যন্ত্রণা লিখিত আছে তাহা মনে করিলে ভক্তবৎসল মহাদেবের হৃদয়ে দুঃখ হয়। প্রসূনাসার—পুষ্পবৃষ্টি। মোর কিরে—আমার দিব্য বা শপথ। **ছায়ার ….ডরায়**—রৌদ্রের তেজ যতই প্রখর হউক ছায়ায় বসিয়া থাকিলে রৌদ্রে ভয় থাকে না। দুর্গা যেখানে অভয় দিয়াছেন, সেখানে হরকোপানল যতই ভয়ংকর হউক না কেন, উহাতে আর ভয় কি? অকম্প চামর শিরে—অতি দ্রুত ধাবমান হইলে অশ্বের মস্তকের চামরশিখা স্থিরভাবে থাকে। (তুলনীয়—"নিষ্কম্প-চামর-শিখাঃ"—কালিদাস)। **সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত**—সূর্যের প্রখর কিরণমালা হইতে আহরণ করা দীপ্তিতে নির্মিত অর্থাৎ খুব উজ্জ্বল। সৌমিত্রি—

সুমিত্রার পুত্র, লক্ষ্মণ। কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী—কার্তিকেয়। বল্লভ—প্রিয়; এখানে পুত্র। সুনাসীর—ইন্দ্র। ফলক—ঢাল। দিবাকর-পরিধি যেমতি—সূর্যমণ্ডলের মত মণ্ডলাকার ঢাল হইতে জ্যোতিঃ বাহির হইত। পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার—পূর্বদিকের স্বর্ণদ্বার। **লঙ্কার পঙ্কজ-রবি**—লঙ্কারূপ কমলিনীর পক্ষে (মেঘনাদরূপ) সূর্য। লম্ফী—লম্ফ প্রদানকারী। **অন্তরিত পরাক্রমে**—গর্ভস্থ বায়ুকুলের প্রচণ্ড শক্তিতে। পর্বত যেন স্বীয় শক্তিতে বলবান বায়ুকুলকে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া তাহাদের অস্থিরতায় নিজেও নড়িতেছে। তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে—উচ্চ পর্বতের মত। মন্দ্র—গম্ভীর শব্দ। জীমূত—মেঘ। পাবক উগরি রাশি রাশি—প্রচুর বজ্রপাত করিয়া। বৃষ্টিল শিলা—শিলাবৃষ্টি হইল। আচম্বিতে—সহসা। সারসন—কোমরবন্ধ; সৌর-কিরীট—সূর্যসদৃশ উজ্জ্বল মুকুট। তরল সলিলে… রাজোময়—শুভ্র চন্দ্রকিরণ পুনরায় স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ায় প্রকৃতি আবার শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। আকাশে আবার চাঁদ উঠিয়াছে।

তৃতীয় সর্গ

১—২০০ ছত্র ঃ পীতধড়া পীতাম্বর—শ্রীকৃষ্ণ। (ধড়া শব্দটি সংস্কৃত ধটি হইতে আসিয়াছে) পীতধরা অর্থাৎ পীতবস্ত্র পরিহিত। বিবশা—বশশূন্য অর্থাৎ যাহার মন এত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, যে আর বশে থাকিতেছে না। মধুর—বসন্তের। মধুর বিরহে—বসন্তের অবসানে অর্থাৎ গ্রীষ্মে। শিহরি—স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় সতীর মনে এই আকস্মিক শিহরণ। ব্যাজ—বিলম্ব। বসন্তসখা—কোকিল। সীমন্তিনি—হে সীমন্তযুক্তে। সীমন্ত—সধবার চিহ্ন। সুরাসুর-শরে—দেব-দানবের অস্ত্রে। বিগ্রহ—যুদ্ধ। দাম—ফুলের মালা। কৌমুদী—জ্যোৎস্না। পাঁতি—শ্রেণী। কত যে শিশির নীরে—শিশিরবিন্দু যেমন পাপড়িতে পড়িয়া মুক্তার মত দেখায় তেমনি অঞ্চলস্থ ফুলের উপর প্রমীলার অশ্রুবিন্দু মুক্তার মত শোভা পাইতেছিল! মিহির—সূর্য। ভানু-প্রিয়ে—সূর্যমুখী ফুল। অস্তাচলে আচ্ছন্ন—দৃষ্টি বহির্ভূত। অবচয়ি—আহরণ করিয়া। মৃগরাজ—সিংহ। চমূ—সৈন্য। অলজ্ঘ্য-সাগর-সম ……দণ্ডধর যথা—লঙ্কার চারিদিকে রামচন্দ্রের অসংখ্য সৈন্য এমনভাবে বিস্তারিত হইয়া আছে যে, তাহা যেন দুস্তর সাগরের ন্যায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। রাক্ষসবংশের এই শত্রুগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত শমন-সদৃশ ভয়ংকর দেখাইতেছে। রুষিলা—বাসন্তীর ভীরুজনোচিত উক্তিতে বীরপত্নী প্রমীলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। বাসন্তীর নিকট এইরূপ কথা প্রমীলা আশা করে নাই। সেইজন্য "কি কহিলি, বাসন্তি" এই বলিয়া নিজের রোষ, বিস্ময় ও দৃঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ করিলেন। পরন্তপ—শত্রুদমনকারী। নারী-দেশে—প্রমীলার দেশে, যেখানে পুরুষ নাই—সকলেই নারী। দুন্দুভি—ঢক্কা, জয়ঢাক। যথা যবে……কৌতুকে—যেমন নারী-দেশে অর্জুনের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সে দেশের বীরাঙ্গনারা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আনন্দে যুদ্ধসাজ করিয়াছিল, প্রমীলাও সেইরূপ সাজিল। (প্রমীলার চরিত্রটি কবি কাশীরামদাসের মহাভারত হইতে লইয়াছিলেন, এ উপমা যেন, তাহারি ইঙ্গিত)। কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা—সুবর্ণময় বর্মের দীপ্তি। বোলী—বোল, শব্দ। বারী—হাতী বাঁধিবার জায়গা। শীর্ষক—শিরোভূষণ। দিবে—স্বর্গে।

কমলে কণ্টকময় যথা মৃণাল—প্রমীলার হাত হইল পদ্ম, আর হাতের শূলখানি যেন ঐ পদ্মের কণ্টকযুক্ত মৃণাল। দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ—যে বীরাঙ্গনা দানবনাশে সিদ্ধহস্তা সেই প্রমীলার পদ্মের ন্যায় চরণ দুখানি। কাদম্বিনী—মেঘমালা। নিষঙ্গ—তূণ। বর্ত্তুল—গোল। খরসান—তীক্ষ্ণ। বামী—ঘোটকী। বাড়বাগ্নি-শিখা—সমুদ্রগর্ভস্থ অগ্নিশিখা। দ্বিষত-শোণিত-নদে—শত্রুর রক্তে সৃষ্ট নদীতে। দ্বিষত · ডুবিতে—শত্রুর রক্তপাত করিয়া দেহ বিসর্জন দিতে।

২০১—৪০০ ছত্র ঃ পাবনি—পবনপুত্র, হনূমান। বিস্ময় মানিয়া—কুলবধূ কুলবালারা বীরবেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া হনূমান আশ্চর্য বোধ করিল। ভীমা—লঙ্কার পুরদেবতা ও লঙ্কার রক্ষয়িত্রী, উগ্রচণ্ডা লঙ্কার প্রবেশপথেই হনূমানকে বাধা দিয়াছিল। খর্পর—নর-কঙ্কাল। খণ্ডা—খড়্গ। **নৃমুণ্ড-মালিনী……আকৃতি**—প্রমীলার দূতীর নাম নৃমুণ্ডমালিনী, তাহার আকৃতি মুণ্ডমালাবিভূষিতা কালীর মতই ভয়ঙ্কর। গরুৎমতী—যাহার পক্ষ আছে। নৌকার পক্ষে 'পাল'। গরুৎমতী তরি—পালযুক্ত নৌকা। দড়ে রড়ে জড়—আতঙ্কে সৈন্যগণ তাড়াতাড়ি এবং এক জায়গায় ঠাসাঠাসি করিয়া দলবদ্ধ হইয়া আছে। চন্দ্রক-কলাপময়—চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় গোলাকার চিত্রাঙ্কিত ময়ূরপুচ্ছ-নির্মিত শিরোভূষণ। পীবর—স্থূল। রঞ্জিত রঞ্জনরাগে—রক্তচন্দনের রক্তে রক্তিম। দেবদত্ত অস্ত্রগুলি পূজা করা হইয়াছে। উহাদের গায়ে রক্তচন্দন লাগিয়া আছে। কুসুম-অঞ্জলি-আবৃত—পূজার ফুল দ্বারা আচ্ছন্ন। নিশীথে…হেথা?—প্রমীলার দূতীর আগমনে শিবিরের বহির্ভাগ এরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যে, রামচন্দ্রের সন্দেহ হইতেছে যে, মধ্যরাত্রিতে কি ঊষার আবির্ভাব হইল! পিনাক—শিবধনুঃ। কাম-রূপী তবাগ্রজ—তোমার বড় ভাই (রাবণ) নিজের ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারে! কুহক—ইন্দ্রজাল, মায়াবীর মায়া। চিত্রবাঘিনী—চিতাবাঘ। স্ববর্ণি বারিদপুঞ্জে—মেঘসমূহকে স্ববর্ণবর্ণান্বিত করিয়া। ঘোড়া দড়বড়ি—ঘোড়ার খুরের খর শব্দ। আস্কন্দিতে—অশ্বের ধীর গতিতে, দুলকী চালে। বামা-কুল-দলে—নারীগণ। কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া—কৃষ্ণবর্ণের অশ্বে আরূঢ়া। বামী-ঈশ্বরী—স্ত্রী-অশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

৪০১—৬১৩ ছত্র ঃ প্রপঞ্চ—মায়া। খগেন্দ্র—পক্ষীরাজ অর্থাৎ গরুড়। হর্য্যক্ষ—সিংহ, এখানে মেঘনাদ। দিগম্বরী যথা দিগম্বরে—কালী যেমন মহাদেবকে পদতলে শায়িত রাখেন। মদ-কল কাল হস্তী—সাক্ষাৎ শমন-তুল্য মত্ত হস্তী। **সিংহ সহ…মৃগ-পালে**—মেঘনাদ একেইত মহাধনুর্ধর, তাহার উপর প্রমীলার মত মহাশক্তিশালিনী বীরাঙ্গনার সহিত মিলিত হইয়া তিনি দুর্জয় হইয়া উঠিলেন। সিংহ ও সিংহিনীর এই করালগ্রাস হইতে আমাদের এই পশুকুলকে কে রক্ষা করিবে? রামচন্দ্রের এই উক্তি ভীতিব্যঞ্জক নহে, সতর্কতামূলক। নিস্তারিলে—"নিস্তারিল" সঙ্গত। বিষ-দন্ত তার মহাবলী ইন্দ্রজিৎ—বিষদাঁত আছে বলিয়াই কালসাপ মহাভয়ংকর। রাবণের দুর্ধর্ষতাও মূলতঃ ইন্দ্রজিতের জন্য। মরে পুত্র জনকের পাপে—রাবণের পাপে নির্দোষ ইন্দ্রজিতের মৃত্যু, ইহা নিয়তির বিধান। তারক-সূদন—কার্তিকেয়। কুন্ত—ভল্ল। কৌন্তিক—ভল্লধারী যোদ্ধা। নারাচ—লৌহনির্মিত বাণ। পিধান—কোষ, খাপ। শ্রোণিদেশে—নিতম্বে। হরি—সিংহ। প্রমীলার বীরবেশে লঙ্কায় প্রবেশ ও মেঘনাদের সহিত মিলন এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া এই সর্গের নাম "সমাগম"।

চতুর্থ সর্গ

১—২০০ ছত্র ঃ কবি-গুরু—বাল্মীকি। **রাজেন্দ্র-সঙ্গমে……তীর্থ-দরশনে**—দরিদ্র যেমন কোন ধনীকে আশ্রয় করিয়া তীর্থ দর্শনে যায়, তেমনি মধুসূদনও যশস্তীর্থে যাইবার জন্য যশের রাজা বাল্মীকির অনুগামী হইতে চাহেন। ভব-দম—এ ভব-মণ্ডলকে যিনি সর্বদা দমন করেন। ভর্তৃহরি—ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার। সূরী—বিদ্বান। ভবভূতি—উত্তর রামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীকণ্ঠ—যাঁহার কণ্ঠস্বর অর্থাৎ কাব্যগীতি অতি মধুর। ভারতে খ্যাত ইত্যাদি—রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাস, যিনি ভারতবর্ষে ভারতীর অর্থাৎ সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত। মুরারি-মুরলী—অনর্ঘরাঘব কাব্যের গ্রন্থকার যাঁহার রচনা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির ন্যায় মনোহর। কীর্ত্তিবাস—যাঁহাতে কীর্তি সর্বদা বসতি করে। কীর্ত্তিবাস—কবি কৃত্তিবাস, যিনি ভাষা-রামায়ণ রচনা করেন। রত্নাকর—রত্নের আকর অর্থাৎ আধার। স্বর্ণ-দীপ-মালিনী—স্বর্ণ দীপাবলী যাহার মালাস্বরূপ হইয়া জ্বলিতেছে রত্নহারা—রত্নময় হার যাহার। নায়কী—নায়িকা (মধুসূদনের প্রয়োগ)। সুরত—কামক্রীড়া। শীধু—মদ্য। রাঘব-বাঞ্ছা—সীতা। **খনির…মণি**—যে খনির গর্ভে সূর্যের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না, সে খনিগর্ভে সূর্যকান্তমণি যেরূপ আভাহীন। বিম্বাধরা—বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর যাঁহার। রমা—লক্ষ্মী। বীচি-রব—তরঙ্গশব্দ। এয়ো—সধবা। বরাঙ্গ-অলঙ্কার—শ্রেষ্ঠ অঙ্গের অলংকারগুলি। **সুবর্ণ দেউটি……দশদিশ**—তুলসীবৃক্ষের মূলে প্রদীপ দিলে যে শোভা হয়, সীতা দেবীর পায়ে সরমা প্রণাম করিলে সেই শোভা হইল। তুলসীর উপমায় এখানে সীতার পবিত্রতা এবং সোনার প্রদীপের উপমায় সরমার রূপ ও গুণের আলো ব্যক্ত হইয়াছে। তোষ—মিটাও। সেই সেতু—অলংকার নিক্ষেপরূপ সেতু অর্থাৎ আমার অলংকারসকল পথে দেখিয়া প্রভু আমার সন্ধান পাইয়াছেন। **পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি**—মধু অর্থাৎ বসন্তকাল যেন পঞ্চবটীবনের নিত্যসহচর; অর্থাৎ এ বনে চিরবসন্ত বিরাজমান। বৈতালিক—স্তুতিপাঠক। আশার সরসে রাজীব—আশারূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপ। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। প্রিয়ম্বদা—মিষ্টভাষিণী। কাদম্বা—কলহংসী। অরক্ষ-পুরে—রাক্ষসপুরে। কান্তার—দুর্গম পথ। কান্তার-কান্তি—দুর্গম পথের সৌন্দর্য। **সৌর-কর…পদ্মবনে**—পদ্মবনে সূর্যের কিরণসমূহ দেখিয়া ভাবিতাম যেন দেবকন্যারা সূর্যকিরণ-বেশে পদ্মবনে খেলা করিতেছেন।

২০১—৪০০ ছত্র ঃ পঞ্চতন্ত্র—বিবিধ শাস্ত্র। বনস্থলে তমোময়—অন্ধকারপূর্ণ বনে। পিইছেন—পান করিতেছেন। হেমাঙ্গি—হে স্বর্ণাঙ্গি। যথা যবে সরমার কোলে!—পতিবিরহশোক-স্বরূপ ব্যাধ অদৃশ্যভাবে মধুর গীতগায়িনী পক্ষিস্বরূপা জানকীকে শরাঘাতে ভূমে পাতিত করিল, অর্থাৎ পূর্বদুঃখের কথা বলিতে বলিতে সীতা শোকার্তা হইয়া মূর্ছা গেলেন। মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণা, সূর্যকিরণে জলভ্রম। বারণারি-গতি—সিংহের গতি-বিশিষ্ট। অবতংস—অলংকার। ভৃগুরাম-গুরু বলে—যিনি পরশুরামকে স্ববলে পরাজয় করিয়াছেন। নিমিষে—নিমেষে (মধুসূদনের প্রয়োগ)। কহিনু কুক্ষণে—কেন-না, আমি এরূপ ভর্ৎসনা না করিলে লক্ষ্মণ আমাকে কখনই ত্যাগ করিয়া যাইতেন না, এবং আমারও এ দুরবস্থা ঘটিত না। **সদাব্রত-ফলাহারী**—প্রকৃতির রাজ্যে যে ফলমূলের অন্নসত্র খোলা রহিয়াছে তাহাই আহার করে যাহারা। কমণ্ডলু—যোগীদের পাত্রবিশেষ। ফুলরাশি…বেশে—পঞ্চবটী আশ্রমের মৃগশিশু, হস্তিশিশু ইত্যাদি ফুলস্বরূপ। সদাব্রতফলাহারী জন্তুদলের মধ্যে রাবণ যেন

কালসাপের মত। প্রতারিত রোষ—রাগচ্ছল, অর্থাৎ কৃত্রিম রাগ। শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি—আপনার ক্রন্দন-ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিয়া দেবী ভাবিলেন যেন বনদেবী সীতার দুঃখে কাঁদিলেন। **হুতাশনে… তাহারে?**—যাহার কঠিন হৃদয়, সে পরাক্রমে যেরূপ শান্ত হয়, করুণ বাক্যে বা মিনতিতে সেরূপ হয় না। যেমন অতি কঠিন বস্তু লৌহ, অগ্নিসংযোগে গলিয়া থাকে, জল তাহার কি করিতে পারে? শরম—লজ্জা।

৪০১—৬৮৬ ছত্র : পুষ্পক—রাবণের রথ। বাজী-রাজি—অশ্বসমূহ। স্যন্দন—রথ। অস্ত্রীদল অপবাদ—অস্ত্রধারীদের কলঙ্ক। সে দেশের রাজা—বালি। ধীর ধর্ম্মসম বীর এক—বিভীষণ। কবন্ধ—মস্তকহীন দেহ। রক্ষোরথী—কুম্ভকর্ণ। ভৈরবে—ভয়ংকর কোলাহলে (মধুসূদনের প্রয়োগ)। লাঘব-গরব—লঘুগর্ব, হীনগর্ব। পরিষ্কারি—পরিষ্কার করিয়া। জিষ্ণু—জয়শীল। পৌলস্ত্য—পুলস্ত-নন্দন, রাবণ। নীলোর্ম্মিময়—নীলবর্ণ তরঙ্গ পরিপূর্ণ। এ পুরে বীরযোনি—বীরপুত্র-জন্মদায়িনী-স্বরূপ লঙ্কাপুরে, অর্থাৎ যেখানে বীর জন্মায়। মন্দারের দামে—পারিজাত পুষ্পের মালায়। বসুধা…মধুরে—বসন্তে পৃথিবী বহুবিধ পুষ্পরূপ ভূষণে ভূষিতা হইয়া রমণীর ন্যায় ঋতুরাজকে অভ্যর্থনা করেন। মহার্ঘ— মহামূল্য। সে বিজন বনে—জনশূন্য অশোকবনে।

পঞ্চম সর্গ

১—২০০ ছত্র : চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা—চিত্রলেখা-নাম্নী অপ্সরী, যাহাকে দেখিতে সুন্দর, বর্তমানে নিদ্রাবেশ ঘটায় পটে-আঁকা ছবির মত নিশ্চল হইয়া আছে। পৌলোমী—পুলোমার কন্যা, শচী। দাসীর সাধনে—দাসীর প্রার্থনায়। মহেষ্বাস—মহাধনুর্ধর। সরসে যেমতি ইত্যাদি—মৌন দেব-দম্পতি যেন মুদিত পদ্ম, আর অপ্সরাগণ যেন চন্দ্র-কিরণ-মালা। পার্ব্বণে—উৎসবে। মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি—পারিজাত ফুলের স্বর্ণ বর্ণ। আদিতেয়, পুরন্দর—ইন্দ্র। ভবানন্দময়ী—সংসারানন্দ-দায়িনী। আনায়—জাল। নমুচিসূদন—নমুচির বধকর্তা, ইন্দ্র। দেবেন্দ্রের…আসি—নিদ্রাদেবী আসিয়া ইন্দ্রের পদতলে প্রণত হইলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের ঘুম পাইতে লাগিল। আয়াসিতে—আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ দিতে। আয়সী—লৌহময় কবচ। বীতিহোত্র—অগ্নি।

২০১—৪০০ ছত্র : দীপিছে—দীপ্তি পাইতেছে। মহোরগ-ললাটে—মহাশক্তিধর সর্পের মস্তকে। রজোরেখা—রজতশুভ্র রেখা। রঘুজ-অজ-অঙ্গজ—রঘুর পুত্র অজ, তাঁহার পুত্র দশরথ। চন্দ্রচূড়—মহাদেব, যাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা বিদ্যমান। ধাই—ধাইয়া। রৌরবে—অগ্নিময় নরক বিশেষ, এস্থলে দাবানল। স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব—স্ত্রীলোকের কণ্ঠোদ্ভূত ধ্বনি অর্থাৎ মেয়েলি স্বর। অলঙ্কারে—অলঙ্কার দ্বারা শোভিত করে। কোলম্বক—বীণার অঙ্গ। ক্বণিছে—বাজিছে। রশনা—মেখলা। উরজ—উরোজ, স্তন। মহামায়ে—মহামায়াকে। সদ্যোজীবী—ক্ষণস্থায়ী। নিকষে—নিকষ অর্থে কষ্টিপাথর, মধুসূদন অসির আবরণ বা খাপ অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সরস্বতী—দৈববাণী।

৪০১—৬০৭ ছত্র : **ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম** ইত্যাদি—ভাগ্যরূপ বৃক্ষে সকলের তো উত্তম ফল ফলে না, কিন্তু মেঘনাদের ভাগ্যের তুলনা নাই, কেননা তিনি প্রমীলার ন্যায় অসাধারণ স্ত্রী-রত্ন লাভ

করিয়াছেন। শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে—শীতল মধুপূর্ণ ফুলদলকে ত্যাগ করিয়া। রোহিণী-গঞ্জনী —যাহার রূপের কাছে রূপসী বিদ্যাধরী রোহিণীও লজ্জা পায়। **তারা-কিরীটিনী-নিশি-সদৃশী** ইত্যাদি—রক্ষোবংশের রাণী মন্দোদরীকে কবি এখানে রাত্রির সহিত উপমিত করিয়াছেন। রাত্রি যেমন অসংখ্য তারার মুকুট পরিয়া শোভা পায়, তেমনি এই জননী মন্দোদরী যেন লঙ্কার অসংখ্য বীর পুত্রের গর্বে গর্বিতা। তবে রাত্রির যেমন শ্রেষ্ঠ গর্ব হইল চন্দ্র ও তাহার জ্যোৎস্না, তেমনি রাণী মন্দোদরীরও শ্রেষ্ঠ গর্ব, পুত্র মেঘনাদ ও পুত্রবধূ প্রমীলা। বিদাইব—বিদায় দিব। রাক্ষস-দলে—রাক্ষসদলের সঙ্গে। **বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী**—বহুলে অর্থাৎ অমাবস্যায় চন্দ্রের অভাবে নক্ষত্র- সমূহের কিরণেও বসুমতী উজ্জ্বল হন। কুসুম বিবৃত—কুসুমে-আবৃত। উজ্জ্বলতর মুকুতা—এস্থলে অশ্রুবিন্দু। আলোকাগার—চক্ষু। পয়োবহ—মেঘ। পর্শে—স্পর্শে।

ষষ্ঠ সর্গ

১—২০০ ছত্র ঃ প্রহরণ—অস্ত্র। নশ্বর—নাশক। চন্দ্রচূড়—মহাদেব। মহোরগ—মহাসর্প। বায়ুসখা—অগ্নি। শার্দ্দূলাক্রমে—ব্যাঘ্রের ন্যায় বিক্রমসহকারে। কৃতান্তদূত—যমদূতস্বরূপ রাবণ। রাক্ষস-গ্রাম—রাক্ষসসমূহ। আর্দ্রিল—ভিজাইল। বিরূপাক্ষ—ত্রিলোচন, মহাদেব। শৈলবালা—গিরিবালা, দুর্গা। অবহেল—অবহেলা কর। আর্য্য—মান্য। কলুষদ্বেষিণী—পাপদ্বেষকারিণী। ভাবী কর্ব্বূরাজ—ভবিষ্যৎ রক্ষোরাজ, অর্থাৎ রাবণের নিধনের পর যিনি রাক্ষসদিগের রাজা হইবেন। বিভীষণকে ইঙ্গিত করা হইতেছে। বাদিত্র—বাজনা। মোহে—মোহিত করে। কাদম্বিনীরূপী কবরী—মেঘমালার ন্যায় কেশগুচ্ছ। অবরোধ—অন্তঃপুর। বাহুবলেন্দ্র—বাহুবলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেশরী—কেশরী—'কেশরী' নামক যে বানরবীর সে শত্রুপক্ষের নিকট সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর। আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী——দৈববাণী। সংশয়িতে—সন্দেহ করিতে। অহি—সর্প। শিখী—ময়ূর। কেকারব—কেকাশব্দ, ময়ূরের ধ্বনির নাম কেকা। অজাগর—অজগর। নির্বীরিবে—বীরশূন্য করিবে। স্কন্দ—কার্তিকেয়। কেশর—সিংহের ঘাড়ের লোম। শৃঙ্গকুলনাদে—শিঙার আওয়াজে। বিভীষণ রণে—সংগ্রামে ভয়প্রদ।

২০১-৪০০ ছত্র ঃ ভুঞ্জাও—ভোগ করাও। মর্দ্দি—মর্দন অর্থাৎ নাশ করিয়া। দুর্ম্মদ—যাহাকে অতিকষ্টে নাশ করা যায়। দিবিন্দ্র—স্বর্গরাজ ইন্দ্র। দিবে—স্বর্গে। শব্দবাহক—আকাশ। মধুজীবী—যাহারা মধু পান করিয়া জীবনধারণ করে। হিমানীতে—শীতকালে। রমা—লক্ষ্মী। কেশববাসনা—নারায়ণের প্রিয়া। রঙ্গিনি—রঙ্গ, অর্থাৎ ছলনাময়ী; সম্বোধনে ই-কার। সম্বর—সম্বরণ অর্থাৎ স্তিমিত কর। নীলাম্বুসুতে—সমুদ্র-কন্যা, অর্থাৎ সমুদ্রোত্থিতা, সম্বোধনে। দম্ভী—অহংকারী। বিশ্বধ্যেয়া—বিশ্বারাধ্যা। অরিন্দম—শত্রুদমনকারী। শিশির-আসারে—শিশির বিন্দুতে। রম্ভাতনু-রাজি—কদলীবৃক্ষসমূহ। ত্বিষাম্পতি—সূর্য। বিভাবসু—অগ্নি। গুল্ম-আবরণে—ঝোপ-ঝাপের আড়ালে ঢাকা। সুযোগপ্রয়াসী—যে সুযোগের সন্ধান করে। অবগাহক—যে ব্যক্তি নদী বা পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নামিয়া স্নান করে। নক্র—কুমীর। আরাব—শব্দ। মাতঙ্গে নিষাদী—হস্তীর উপরে মাহুত। সাদীবৃন্দ—অশ্বারোহী সৈন্য দল। সর্ব্বভুকরূপী—অগ্নিসদৃশ তেজস্বী। বিরূপাক্ষ—এখানে একজন

রাক্ষসের নাম। প্রক্ষেড়ন—অস্ত্রবিশেষ। রিপুকুলকাল—রিপুকুলের কাল অর্থাৎ যমস্বরূপ। দেবলোভ—দেবতাদিগের লোভজনক অর্থাৎ যাহা দেখিয়া দেবতাদিগেরও লোভ জন্মে। মাৎসর্য্য—অন্যের সৌভাগ্যে দ্বেষ হিংসা; এখানে অহংকার মাত্র। তুষার—হিম, বরফ। মৃগাক্ষী-গঞ্জিনী—যাহার চোখের কাছে হরিণের চোখও লজ্জা পায়। আয়সী-আবৃত—বর্মাচ্ছাদিত। বাজীপাল—অশ্বপালক অর্থাৎ সহিস। প্রমদে—প্রমত্তভাবে। প্রগল্ভে—অহংকারে, নির্লজ্জভাবে।

৪০১—৭৪২ ছত্র ঃ প্রসাদিতে—প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ করিতে। রৌদ্র—ভয়ানক। হীনগতি—মন্দগতি। বঞ্চাইছ—বঞ্চনা করিছ। শৃঙ্গনাদিগ্রাম—শিঙাবাদকদল। রক্ষঃচমূ—রাক্ষসবাহিনী। বিদাও—বিদায় কর। উলঙ্গিলা—খাপ হইতে বাহির করিল। মহাহবে—মহাযুদ্ধে। জলদপ্রতিম স্বনে—মেঘগর্জনসদৃশ স্বরে। শাস্তিয়া—শাস্তি দিয়া। শুণ্ডধর—হস্তী। গঞ্জি গঞ্জনা করি অর্থাৎ তিরস্কার করি। সাধনা—প্রার্থনা, ইচ্ছা। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। বিধু—চন্দ্র। বিধি—ভগবান্। স্থানু—মহাদেব ভর্ৎস—ভর্ৎসনা কর। নিশীথ—অর্ধরাত্র। কোপি—কোপ করিয়া, রাগিয়া। পরঃ পরঃ—পর সর্বদাই পর। সন্ধানি—সন্ধান করিয়া। নিষ্কল—চন্দ্রপক্ষে কলারহিত; মেঘনাদপক্ষে তেজোহীন। বামেতর—বাম হইতে ইতর বা ভিন্ন অর্থাৎ দক্ষিণ। মূর্চ্ছিলা—মূর্চ্ছান্বিত হইল। পরুষ—কর্কশ। বারতা—বার্তা, সংবাদ। ত্রাণিবে—ত্রাণ করিবে, রক্ষা করিবে। অন্তিমে—মৃত্যুকালে। লোহ—রক্ত। শরদিন্দুনিভাননা—যাহার মুখখানি শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। কর্ব্বূরকুলগর্ব্ব—রাক্ষসবংশের গর্বস্থল। জগতনয়নানন্দ—জগতবাসী যাঁহাকে দেখিয়া আনন্দলাভ করে। শৃঙ্গনাদী—শিঙা-বাদক। অনীকিনী—সেনা। উগ্রচণ্ড—ভয়ংকর। বিলাপিলা—বিলাপ করিল, শোক করিল। শোকী—শোকার্ত। নিষাদ—ব্যাধ। আক্রমে—আক্রমণ করে। গতজীব—মৃত। কটক—সৈন্য।

সপ্তম সর্গ

১-২০০ ছত্র ঃ পদ্মযোনি—ব্রহ্মা। স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী—জলের পদ্ম ও স্থলপদ্ম উভয়েই যেন সূর্যের নায়িকা। স্বর্ণাভ স্থলপদ্মগুলি যেন জলপদ্মেরই ন্যায় সূর্যের প্রেম সমভাবে আকাঙ্ক্ষা করে। স্নানি—স্নান করিয়া। বেদনিল—বেদনাগ্রস্ত করিল। বামেতর—দক্ষিণ। নিবার—নিবারণ কর। জীবেশে—প্রাণেশ্বরকে। বীণাবাণী—সুমধুরভাষিণী; এখানে প্রমীলা। চন্দ্রচূড়ালয়ে—শিবালয়ে। আরাধেন—আরাধনা করেন। কাল—ভীষণ। সর্ব্বহর—সর্বনাশক। পদরাজীবে—পাদপদ্মে। নিরংশু—জ্যোতিহীন। প্রভঞ্জন-বলে—ঝড়ের বেগে। সন্দেশ-বহ—দূত। করপুটে—করযোড়ে। ভবে—সংসারে। বিরূপাক্ষচর—শিবদূত। বিউনিল—বাতাস করিল। বিউনি—পাখা। চেতনিলা—চেতনা সম্পাদন করিল। পুত্রহানী—পুত্রহন্তা। ধূম্রবর্ণ বারণ—ধোঁয়াটে রঙের হাতী। চামর—রাক্ষস বিশেষ। উদগ্র—একজন রক্ষঃ। বাস্কল—রাক্ষস বিশেষ। জীমূতবৃন্দ—মেঘকুল। পতাকীদল—পতাকাধারীরা। ভূধরব্রজ—পর্বতসমূহ।

২০১-৪০০ ছত্র ঃ লয়িতে—লয় করিতে। পাণ্ডুগণ্ডদেশরক্ষঃ—ভয়ে বিভীষণের গাল পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। স্বর্ণবর্ম্ম-আভা—স্বর্ণনির্মিত বর্মের জ্যোতি। রক্তাক্ষ—রক্তচক্ষু। দাক্ষিণাত্য—দাক্ষিণাপথের

অধিবাসী। দাক্ষিণ্য—দয়া। ঠাট—সৈন্য। কিন্নর—স্বর্গীয় গায়ক। জীবকুল-কুলক্ষণ—যে পতাকা জীবকুলের ধ্বংসের চিহ্ন। অনন্ত বসন্তানিল—চিরমলয়-মারুত। ইন্দিরা—লক্ষ্মী। প্রতিবিধানিতে—প্রতিবিধান করিতে। সমরিব—সমর করিব। চর্ম্ম—ঢাল। প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান করিতে। অবরোধ—অন্তঃপুর। দয়িতা—স্ত্রী। বামতম—অত্যন্ত বিরূপ। আলবাল—বৃক্ষের চতুর্দিকে জল রক্ষার্থে গোলাকার বাঁধ। তিতিয়া—ভিজিয়া। নয়ন-আসারে—চোখের জলে। নেতৃনিধি—নেতৃশ্রেষ্ঠ।

৪০১—৭৭৩ ছত্র ঃ তরাইলা—রক্ষা করিলে। দশনশিখরে—দন্তের অগ্রভাগে। খর্ব্বিলা ইত্যাদি—বামন অবতারে তুমি বলিরাজার গর্ব খর্ব করিলে। আয়াসে—কষ্ট দেয়। মদকল—মদমত্ত। প্রতিঘ-অন্ধ -রাগান্ধ। পরাগ—ধূলি। উর্ম্মিকূল—ঢেউসমূহ। চতুঃস্কন্ধরূপী—হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিক এই চতুরঙ্গে বা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া। নিধন—মারণ, নাশ। শৌরি—কৃষ্ণ। সহস্রাক্ষ—সহস্রচক্ষুঃ অর্থাৎ ইন্দ্র। কম্বু—শঙ্খ, শাঁখ। কলম্বকুল—বাণসমূহ। বীরর্ষভ—বীরশ্রেষ্ঠ। বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা। বালিবন্ধ—বাঁলির বাঁধ। গোষ্ঠবৃতি—গোয়ালের বেড়া। কাতরিয়া—কাতর করিয়া। স্নেহেন—স্নেহ করেন। কটক—সৈন্য। নিরস্তিলা—নিরস্ত করিলা। কুলিশী—ইন্দ্র (কুলিশ—বজ্র; কুলিশী—যিনি বজ্র ধারণ করেণ অর্থাৎ ইন্দ্র)। মাতলি—ইন্দ্রের সারথি। জীব—জীবিত থাক। পুত্রহা—পুত্রহন্তা, অর্থাৎ যে পুত্রকে মারে। অঞ্জনাপুত্র—হনুমান। অস্থিরিলা—অস্থির করিল। পরদার লোভে—পরদারালোভে, পরস্ত্রীলোভে। কলত্র—স্ত্রী। চাপ—ধনুক। সপন্নগ—সসর্প। তাণ্ডবি—নৃত্য করিয়া।

অষ্টম সর্গ

বিরাম-মন্দিরে—বিশ্রাম-গৃহে। তমোহা—অন্ধকারনাশক। দুর্ব্বার—যাহাকে দুঃখে নিবারণ করা যায়। বিলাপে—বিলাপ করে। উন্মীলি—উন্মীলন করিয়া অর্থাৎ চাহিয়া। অভাগিনী—সীতার বিশেষণ। রামের সীতাকে অভাগিনী বলিবার তাৎপর্য এই যে, সীতার জন্যই লক্ষ্মণের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সরম—সরম করিয়া থাক। এ প্রসূনে—লক্ষ্মণরূপ পুষ্পে। বিতর—দান কর। উৎসঙ্গ-প্রদেশ—কোল। সঘনে—ক্রমাগত। আক্ষেপিছে—আক্ষেপ করিতেছে। কৃতান্ত নগরে—যমপুরে। প্রেতদেশ—যমালয়। খমুখে—আকাশে। তনু—শরীর। পরিখা—গড়খাই, খাল। বৈতরণী—নরকের নদী। পয়ঃ—দুগ্ধ। পাবকরাশি—অগ্নিরাশি। ইষু—বাণ। সাঁতারিয়া—সাঁতার দিয়া। পীড়য়ে—পীড়া দেয়। পুলিনে—তীরে। তোরণ—ফটক। প্রমত্তত্ব—প্রমত্ততা। বিবাদিছে—ঝগড়া করিতেছে। জ্ঞানহর—জ্ঞাননাশক। বিসূচিকা—ওলাউঠা। শুভ্রজলরয়রূপে—শুভ্রজলবেগরূপে। অঙ্গগ্রহ—আকর্ষিণী, ধনুষ্টঙ্কার। প্রবাহিণী—নদী। সূতবেশে—সারথিবেশে। দাবদগ্ধ—দাবানলদগ্ধ। জীবে—জীবিত থাকে। আত্মকুল—প্রেতাত্মাকুল। দারা—স্ত্রী। শূন্যদেশভবা বাণী—দৈববাণী। সুবিধি—সুনিয়মে। বিচারী—বিচারক। আত্মহা—আত্মঘাতী। কলুষকুহকে—পাপের কুহকে। অবহেলে—অবহেলা করে। রণে—রণ করে, যুদ্ধ করে। আবরেন—ঢাকেন, [illegible] করেন। স্থানে স্থানে......যথা—পীড়িত ব্যক্তির হাসির সহিত সূর্য-কিরণের উপমা দিবার অর্থ এই যে, যেমন রোগীর হাসিতে কোন রস বা শক্তি নাই, সেইরূপ পাতার ভিতর দিয়া কিরণ সম্পাত করাতে আলো মাত্র আছে, কিন্তু তাহাতে

কোন তেজ নাই। তোষ—তুষ্ট কর। রসনাজনিত ধ্বনি—মানুষের কথা। বরাঙ্গ—সুন্দর। কুড়িছে—উপড়াইতেছে। অঞ্জন—কাজল। ঘৃণিতাম—ঘৃণা করিতাম। অনির্ব্বেয়—যাহাকে নির্বাপিত করা যায় না। সুসরসী—সুসরোবর। প্রদানেন—প্রদান করেন। কামধুক—স্বর্গ (কাম—ইচ্ছা, অভিলাষ; ধুক্—দোহনকর্তা, যেখানে ইচ্ছা পূর্ণ হয়)। বন্ধ্যা—ফলশূন্য, বাঁজা। দ্রবি—গলাইয়া। অশেষশরীরী—দীর্ঘদেহ-বিশিষ্ট। শেষ—অনন্ত নাগ, শেষ নামক সর্প। নরান্তক (রণে নরান্তক)—প্রথম নরান্তক একটি রাক্ষসের নাম; দ্বিতীয়—নরকুলের অন্তকারী, অর্থাৎ যম। অন্ত্যেষ্টি—ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া, শ্রাদ্ধাদি। বিমল বায়—নির্মল বেগে। বিনতানন্দনাত্মজ—গরুড়পুত্র অর্থাৎ জটায়ু। সুদক্ষিণা—দিলীপের স্ত্রী। নিদান—আদিকারণ, মূল। প্রখরি—বাড়াইয়া।

নবম সর্গ

প্রভাতিল—প্রভাত হইল। লক্ষি—লক্ষ্য করিয়া। গ্রাসিলে—গ্রাস করিলে। কুরঙ্গ—মৃগ পরিহরি—ত্যাগ করিয়া। সংক্রিয়া—সংকার। প্রহারে—প্রহার করে। হাহাকারে—হাহাকার করে। খরসান—তীক্ষ্ণ-শান দেওয়া। রোধিল—আটক করিল। সুবচনী—দেবীবিশেষ, সরমাপক্ষে সুসংবাদ-দায়িনী। স্বর্ণব্রততী—স্বর্ণলতা। কণে—শব্দে। কৃষ্ণ-হয়ে—কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে। উচ্ছ্বাসিছে—নিশ্বাস ছাড়িতেছে। বামাব্রজ—স্ত্রীসমূহ। গায়কী—গায়িকা। পেশল—কোমল। উরস—বক্ষঃস্থল। হানি—আঘাত করিল। প্রতিমাপঞ্জর—দুর্গাদি প্রতিমার ঠাট অর্থাৎ কাঠামো। শিবিকা—পাল্‌কি। চামরিণী—যাহারা চামর ঢুলায়। ভাতিত—দীপ্তি পাইত। উচ্চারয়ে—উচ্চারণ করে। কঞ্চুক—গাত্রাবরণ। হবির্ব্বহ—অগ্নি। হোত্রী—হোমকর্তা। অধিকারী—কর্মচারী। পূত—পবিত্র। পরাপর—আপন-পর। শিষ্টাচার—হে ভদ্র। জীবলীলাস্থলে—সংসারে। বেদী—বেদজ্ঞ। মহাযাত্রা—মরণযাত্রা। সান্ত্বনিব—সান্ত্বনা করিব। কি কয়ে—কি বলিয়া। লড়িল—নড়িল। ত্রিপথগা—গঙ্গা। সর্ব্বশুচি—অগ্নি। সুধামে—কৈলাসে। তনুদেশে—সর্বাঙ্গে। পুষ্পাসার—পুষ্পবৃষ্টি। পাটিকেল—ইট। বিসর্জ্জি—বিসর্জন করিয়া। প্রতিমা—দুর্গাদির প্রতিমূর্তি।

১২। উপসংহার

বাংলার নবজাগরণের প্রথম কবি, অমিত্রাক্ষরের স্রষ্টা শ্রীমধুসূদনই প্রথম পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার অনুকরণে নব্য বাংলাকাব্যের সৃষ্টি করেন। মধুসূদন অমিত উৎসাহে স্বহস্তে খাত কাটিয়া যে কাব্যধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা যে সেকালের নবপ্রবুদ্ধ বাঙালি-সন্তানকে কতখানি আশ্বস্ত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেকালের সেই সাহিত্যিক নৈরাশ্যের মধ্যে কি আশার সঞ্চার করিয়াছিল, সে কাহিনী আজ ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। যেদিন বাংলা সাহিত্যের শান্ত অরণ্য-ভূমিতে একসঙ্গে মেঘগর্জন ও সিংহনাদ ধ্বনিত হইল, বিদ্রোহী মধুসূদন পয়ারের চরণান্তিকে যতির শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া চরণান্তরে পদক্ষেপ করিয়া বাংলাদেশে বিষম বিপ্লব এবং চমকের সৃষ্টি করিলেন—সেইদিন বাংলা-কাব্যাকাশে স্পন্দ-শিহরণ জাগিল।

এই মধুসূদনকে জানিবার প্রয়োজন আছে। যেখানে "মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত কবি মধুসূদনের" ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যাইতেছে—"তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে, জন্ম যদি তব বঙ্গে"—আজ সেইদিকে একবার চাহিয়া—কবির শুধু নামধাম নয়—মৃতজনের পরিচয় নয়—তাঁহার অমর আত্মার অমৃতবাণী কান পাতিয়া প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। মধুসূদনের একমাত্র অমর কাব্যকীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য' কাব্যের নক্ষত্রলোকে শাশ্বত স্থান পাইয়াছে—তাঁহার কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এই একখানি কাব্যেই পাওয়া যায়। তাঁহার সমগ্র কবি-সত্তা এই কাব্যের নবসঙ্গীতময় ছন্দে ধরা দিয়াছে। যতদিন বাংলা-ভাষা থাকিবে ততদিন মেঘনাদবধ কাব্যের মহানির্ঘোষে বাঙালীকে মুগ্ধ ও সচকিত করিবে। তাই মাইকেলের অন্তরঙ্গ সুহৃদ, তাঁহার কাব্যের একজন অনুরাগী পাঠক ও সমালোচক, মনীষী রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন :

"স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বঙ্গভূমিকে "শ্যামা জন্মদে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণ রসের গাঢ়তা, উপমা-উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগনৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার 'মেঘনাদ' বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।...তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের "গ্যেটে" আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। গ্যেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মণ ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালাভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছেন।...আমরা যখনই মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করি, তখনই ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ অক্লান্ত অনুরাগের সহিত 'মেঘনাদ' পাঠ করিবে।"

রাজনারায়ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই ; "অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়িয়া সেই যে প্রথম আবির্ভূত হইল আধুনিক কাব্য 'রাজবদুন্নত ধ্বনিঃ'," পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা-কাব্যে' তাহারই সার্থক পরিণতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বুঝিলাম, মাইকেলের সৃজনী-প্রতিভা ও সৃষ্টি ব্যর্থ হয় নাই।

———

COVER PRINTED BY KARTICK ART PRESS, CAL-12